অর্থাৎ

মহাকবি ভবভূতির উত্তরচরিত, বীরচরিত এবং মালতী-
মাধব—এই তিনখানি কাব্যের সমালোচনা।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
পরীক্ষক ও 'লেকচরর', 'কালিদাস,' 'দত্তক-বিধি-বিচার,'
'কালিদাস ও ভবভূতি', 'পদ্য-পুষ্পাঞ্জলি'
প্রভৃতি-গ্রন্থকারক

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
প্রণীত।

কলিকাতা ৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী হইতে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৮।

মূল্য এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান

ম্যানেজার—

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী,

৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা.

কলেজ প্রেসে এম, সি, চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

অশেষ শ্রদ্ধাভাজন মাননীয় বিচারপতি

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী,

সি. এস. আই., এম. এ., ডি. এল., ডি. এস্. সি.,

এফ. আর. এ. এস., এফ. আর. এস. ই., প্রভৃতি—

মহোদয় করকমলেষু—

গুণের সাগর যিনি জ্ঞানের সাগর।
সদা পরহিতে রত যাঁহার অন্তর।
আশ্রিতের প্রিয় সখা, দীনের শরণ।
দরিদ্র ছাত্রের যিনি পিতার মতন।
দিবানিশি, বীণাপাণি বীণা করি' করে,
বিরাজিতা শান্তিময়ীরূপে যাঁ'র ঘরে।
উপেক্ষিত-বঙ্গভাষা-মলিন-বদন,
নিরখি' নীরবে যাঁ'র ঝরে দু'নয়ন।
ভারতীর বরপুত্র, ভারত-রতন।
'শিক্ষা-সমুন্নতি-ব্রতে দীক্ষিত'-জীবন।
সরল স্বভাব যাঁ'র বালকের প্রায়।
এই ক্ষুদ্র উপহার সেই মহাত্মায়॥

বিনীত

গ্রন্থকার।

সূচিকা।

অধ্যায়।	বিষয়।	পত্রাঙ্ক।

যে সমুদয় পুস্তকের সাহায্য লওয়া হইয়াছে, তাহার তালিকা।

ইংরাজি :—

১ Theatre of the Hindus. ... H. H. Wilson.
২ Bhababhuti and his place in Sanskrit Literature ... A. Barooah.
৩ History of Sanskrit Literature ... A. A. Macdonell.
৪ History of Sanskrit Literature ... Max Muller.
৫ Mirror of Composition ... Pramadadas Mitra
৬ Rajashekhara's Karpura Manjari . Harvard Oriental Series.
৭ Essay on Sanskrit and Prakrit Poetry ... Colebrooke.
৮ History of India ... Elphinstone.
৯ Subhasitavali ... P. Peterson.
১০ Kristodas Pal : a study ... N. N. Ghosh.
১১ Characters of Shakespear's Plays ... Hazlitt.

সংস্কৃত :—

১২ উত্তররামচরিত ... বিদ্যাসাগর।
১৩ উত্তরচরিত ... নাগপুর। (১৮৯৫)
১৪ উত্তরচরিত ... জীবানন্দ বিদ্যাসাগর।
১৫ বীরচরিত ... আনন্দরাম বড়ুয়া।
১৬ মালতীমাধব ... আর, জি, ভাণ্ডারকার।
১৭ মালতীমাধব ... রামকৃষ্ণ তেলাঙ্।
১৮ কাব্যপ্রকাশ ... মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন,।
১৯ কাব্যপ্রকাশ ... গবর্ণমেণ্ট সেণ্ট্রাল বুক্ ডিপো, বোম্বাই।
২০ সাহিত্যদর্পণ ... চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ।
২১ সেতুবন্ধ ... কাব্যমালা, বোম্বাই।

২২ আর্য্যাসপ্তশতী ... কাব্যমালা, বোম্বাই।

২৩ রাজতরঙ্গিণী ... পি, পিটারসন্।

২৪ বাতদূত ... মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন।

২৫ কুমারসম্ভব ... কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

২৬ রঘুবংশ ... সারদারঞ্জন রায়, বিদ্যাবিনোদ।

বাঙ্গালা :—

২৭ বঙ্গদর্শন ... ১২৮২ সাল।

২৮ বঙ্গদর্শন ... ১২৮৫ সাল।

২৯ বঙ্গদর্শন ... ১২৯০ সাল।

৩০ বিদ্যাপতি ... বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্।

৩১ বৈষ্ণব পদাবলী ... বসুমতী কার্য্যালয়।

৩২ সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র...বিদ্যাসাগর।

৩৩ ভবভূতি ... মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

৩৪ কালিদাস ও ভবভূতি ... রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

৩৫ কালিদাস ... রাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।

৩৬ বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী ... নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

৩৭ বিবিধ-প্রবন্ধ ... ভূদেবমুখোপাধ্যায়।

ভূমিকা।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, যখন মহাকবি কালিদাসের কাব্যাবলীর সমালোচনা করি, তখন মনে মনে, ভবভূতির কাব্যনিচয়ের সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছিল, এবং তদনুসারে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপিও প্রস্তুত করিয়াছিলাম, কিন্তু এতদিন প্রকাশ করিতে সাহসী হই নাই। ভারতবর্ষ এবং সংস্কৃত ভাষা যাঁহাদিগের দ্বারা গৌরবান্বিত, যাঁহাদিগের নাম করিয়া আমরা এখনও স্পর্দ্ধা করি, ভারতের সেই মহাকবিবৃন্দের কাব্যাবলীর আলোচনা যত অধিক হয়, ততই মঙ্গল। ঐ সমুদয় মহার্ঘ গ্রন্থের আলোচনাদ্বারা, অন্যের তৃপ্তিসাধন করিতে পারি-বা-না-পারি, নিজে অপরিসীম পরিতৃপ্ত হইয়া থাকি। সেই পরিতৃপ্তির লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই বলিয়াই, আমার মাতৃভাষায় এই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম। ভাবের কবি ভবভূতির কাব্যের যিনি সমালোচক হইবেন, তাঁহার হৃদয়ে ভাবের তরঙ্গ থাকা চাই, তাঁহাকে প্রেমিক হইতে হইবে। সুতরাং আমার ন্যায় নীরস এবং নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে সে সমালোচনার দুরাশা অন্যায়। এই কারণে, ক্ষমাশীল পাঠক-বর্গের নিকটে, আমি নিয়তই বিনয়াবনত হৃদয়ে ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

মহাকবি ভবভূতির আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্-গণের যে সকল মত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কতিপয় নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহাদ্বারা, ভবভূতির কাল কথঞ্চিৎ নির্ণীত হইতে পারে।

১। কান্যকুব্জের অধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর, প্রায় একশত বৎসর পর্য্যন্ত, উক্ত প্রদেশের আর কোনও বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। তার পর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে, যশোবর্ম্মদেব কনোজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এইরূপ নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিণীতে দেখি, ভবভূতি এই যশোবর্ম্মদেবের রাজ-সভার অলঙ্কার ছিলেন।[১] সুতরাং অষ্টম শতাব্দীর প্রথমাংশে যে ভবভূতি বিদ্যমান ছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

২। জেনারাল কানিংহামের নির্দ্দেশানুসারে বুঝা যায় যে, ললিতাদিত্য নামে এক নৃপতি, খৃঃ ৬৯৩ অব্দ হইতে খৃঃ ৭২৯ অব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করেন।[২] এই ললিতাদিত্য রাজা

১—রাজতরঙ্গিণী,—

কবিবাক্‌পতিরাজ-শ্রী-ভবভূত্যাদিসেবিতঃ।
জিতো যযৌ যশোবর্ম্মা তদ্গুণস্তুতিবন্দিতাম্॥ ৪র্থ তরঙ্গ, ১৪৪॥

২—রাজতরঙ্গিণী,—

রাজা শ্রী-ললিতাদিত্যঃ সার্ব্বভৌমস্ততোঽভবৎ। ৪র্থ তরঙ্গ,১২৬॥

* * * *

জম্বুদ্বীপ-দ্বিপেন্দ্রস্য যেনাতন্যত মণ্ডলম্। ৪র্থ তরঙ্গ, ১২৭।

যশোবর্ম্মদেবকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন।[১] সুতরাং যশোবর্ম্মদেব ললিতাদিত্যের সমসাময়িক। ইহার দ্বারাও ভবভূতিকে অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভভাগের লোক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

৩। কাশ্মীরের ইতিহাসে জানা যায় যে, যশোবর্ম্মদেবের রাজসভায়, বাক্‌পতিরাজ নামে, ভবভূতির ন্যায় আরও একজন কবি ছিলেন। যশোবর্ম্মদেব নিজেও একজন সুকবি ছিলেন। তাঁহার প্রণীত 'রামাভ্যুদয়' নামক নাটক হইতে, 'ধ্বন্যালোক-লোচন' গ্রন্থে যে দুই একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্দারাই, তিনি যে একজন কল্পনাকুশল লেখক ছিলেন, ইহা স্পষ্টতঃ অনুমান করা যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাক্তার বুলার, প্রাকৃত ভাষায় লিখিত 'গৌড়বহো' নামে একখানি কাব্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই প্রাকৃত কাব্যের রচয়িতা, পূর্ব্বোক্ত বাক্‌পতিরাজ। রাজা যশোবর্ম্মদেবের অত্যদ্ভুত বিক্রমাবলী ও গৌড়বিজয়ের অবলম্বনে এই কাব্য বিরচিত। ইহাতে কবি, স্বীয় পরিচয় প্রদান-কালে, বলিয়াছেন যে, তিনি ভবভূতির শিষ্য ছিলেন এবং ভবভূতির দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে,

---

১—রাজতরঙ্গিণী,—

যশোবর্ম্মাদিবাহিন্যাঃ ক্ষণাৎ কুর্ব্বন্ বিশোষণম্।
নৃপতি র্ললিতাদিত্যঃ প্রলয়াদিত্যতাং যযৌ॥ ৪র্থ তরঙ্গ, ১৩৪।
যশোবর্ম্মাণমুল্লঙ্ঘ্য হিমাদ্রিমিব জাহ্নবী।
সুখেন প্রাবিশৎ তস্য বাহিনী পূর্ব্ব-সাগরম্॥ ঐ—১৪৬।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত যশোবর্ম্মদেবের রাজত্বকাল। সুতরাং তাঁহার অন্যতম সভাপণ্ডিত বাক্‌পতিরাজের কালও যে ঐরূপ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এবং তাহা হইলেই, বাক্‌পতির গুরু ভবভূতি যে ঐ সময়েই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহাও নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, উপরি-ধৃত প্রমাণাবলীর সাহায্যে, এই টুকু স্থির হইতে পারে যে, খৃঃ সপ্তম-শতাব্দীর শেষ হইতে অষ্টম শতাব্দীর প্রথমাংশের মধ্যে ভবভূতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ভবভূতি পঞ্চম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[১] ঐতিহাসিক-গণের মতাবলী উপরে বিবৃত হইল। কিন্তু ভবভূতির কাব্যত্রয়ের মধ্যে এমন কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না, যাহার দ্বারা ঐ সকল মত আরও দৃঢ়ীভূত হইতে পারে। বরং, তিনি যে মধ্য-ভারতের (Central India) সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন, ইহার প্রমাণ তদীয় কাব্যে প্রচুর পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। কাশ্মীরাদির কোনও বিশেষ কথা তাঁহার মুখে আমরা শুনিতে পাই না।

ভবভূতি আত্মপরিচয় প্রদানকালে, 'শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছন' এই বিশেষণে আপনাকে বিশেষিত করিয়াছেন, তথাপি কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহার প্রকৃত নাম, বোধহয়, শ্রীকণ্ঠ। কারণ, ভবভূতির কাব্যের ও ভাগবতের বিজ্ঞ টীকাকার, রামানুজ-মতাবলম্বী,

১—Bhababhuti and his place in Sanskrit Literature. P. 22.

দক্ষিণদেশীয় পণ্ডিত বীররাঘব, এবং গোবর্দ্ধনের 'আর্য্যাসপ্তশতীর' টীকাকার অনন্তপণ্ডিত লিখিয়াছেন যে,—ভবভূতির পিতৃকৃত নাম শ্রীকণ্ঠ, তবে

'সাম্বা পুনাতু ভবভূতি-পবিত্র-মূর্ত্তিঃ'

এবং

'তপস্বী কাং গতোঽবস্থাং ইতি স্মেরাননাবিব।
গিরিজায়াঃ স্তনৌ বন্দে ভবভূতি-সিতাননৌ ॥

এই সকল স্বরচিত শ্লোকে, 'ভবভূতি' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া, শ্রীকণ্ঠের নাম 'ভবভূতি' হইয়াছিল। ভবভূতির পিতার নাম ছিল—'নীলকণ্ঠ।' যদি ভবভূতি আর ঊর্দ্ধতন দুই এক পুরুষের পরিচয় দিতেন, তবে হয়ত, আরও দুই একটি 'কণ্ঠ' বাহির হইত। পূর্ব্বপুরুষের নামের অনুরূপ নাম প্রায়শই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং নীলকণ্ঠের পুত্রের প্রকৃত নাম যে শ্রীকণ্ঠ হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? আত্মকৃত কবিতায় প্রযুক্ত কোনও বিশিষ্ট শব্দের অনুসারে যে প্রাচীনকালে কবির নামকরণ হইত, তাহার প্রমাণ আরও আছে। মেঘদূতের পূর্ব্বমেঘের ১৪শ কবিতার ব্যাখ্যায়, মল্লিনাথ নিচুল-নামক কবির পরিচয়প্রসঙ্গে নিম্নস্থ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ—

"সংসর্গতো দোষ-গুণা ভবন্তীত্যেতন্মৃষা যেন জলাশয়েঽপি।
স্থিত্বানুকূলং নিচুল-শ্চলন্তমাত্মানমারক্ষতি সিন্ধুবেগাৎ ॥
ইত্যেতচ্ছ্লোকনির্ম্মাণাৎ তস্য কবের্নিচুল-সংজ্ঞেতি ॥"

অর্থাৎ এই শ্লোকে নিচুলশব্দ প্রয়োগ করায়, ইহার কবির নাম পর্য্যন্ত 'নিচুল' হইয়াছিল। সুতরাং শ্রীকণ্ঠের নাম যে 'ভবভূতি' হইবে, ইহাতে বৈচিত্র্য কি?

ভবভূতির প্রণীত তিনখানি নাটকের মধ্যে উত্তরচরিতই সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। সেই কারণে, উত্তরচরিতের সমালোচনা একটু বিস্তৃত হইয়াছে। বীরচরিত বা মালতীমাধবে যে সমুদয় উত্তম উত্তম কবিতা বা ভাব আছে, তাহার অধিকাংশই, এক-ভাবে-না-এক্-ভাবে, উত্তরচরিতে পুনঃ প্রযুক্ত হইয়াছে। অনেকস্থলে, শ্লোকগুলি পর্য্যন্ত অবিকলভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং উত্তরচরিতের বিস্তৃত সমালোচনার পর, বীরচরিত বা মালতীমাধবের কবিত্ব-সমালোচনার আর পৃথক্ প্রয়োজন হয়ই না। এইজন্য, আমি, ঐ দুই গ্রন্থের কথা অতি সংক্ষেপে সমাপ্ত করিয়াছি। অবশ্য সুকবিকৃত যে কোন কাব্যের প্রতিপঙ্‌ক্তি লইয়া অনেক কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমানক্ষেত্রে আমি তাহা সমীচীন মনে করি নাই।

এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে, প্রাচীন সংস্কৃত-কাব্য সম্বন্ধে, সাধারণভাবে যে কয়টি কথা বলিয়াছি, তাহার সমস্তই মৎকৃত 'কালিদাস' গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়ে ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। সংস্কৃত-কাব্য সম্বন্ধে আমার যে ধারণা, তাহা যখন একবার লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তখন, অন্যত্র, প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, আমাকে বাধ্য হইয়া তাহার পুনরুল্লেখ করিতে হইবে। এক্ষেত্রেও তাহাই করিতে হইয়াছে।

আমি অকপটহৃদয়ে পুনরায় বলিতেছি যে, মহাকবি ভবভূতির ভাবপ্রধান কাব্যাবলীর সমালোচনা করিতে যাইয়া পণ্ডিত-সমাজে আমি যে উপহাসাস্পদ হইব, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই ;—ইহা জানিয়াও, মাতৃভাষার অর্চ্চনার মানসে আমি এই দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি দোষ হইয়া থাকে, পণ্ডিত-মণ্ডলী মার্জ্জনা করিবেন।

মুদ্রাযন্ত্রের প্রকৃতিসিদ্ধ ও অনুচিত নৈপুণ্যে এবং আমার প্রুফ সংশোধনে অযোগ্যতায়, গ্রন্থে অনেকগুলি বর্ণাশুদ্ধি থাকিয়া গিয়াছে। ইহার নিমিত্তও আমি ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। পরিশেষে, আবার, পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট আমার কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা—

অযুক্তমস্মিন্ যদি কিঞ্চিদুক্তং
অজ্ঞানতো বা মতিবিভ্রমাদ্বা।
ঔদার্য্য-কারুণ্য-বিশুদ্ধ-ধীভিঃ
মনীষিভিস্তৎ পরিশোধনীয়ম্॥

কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ।
আষাঢ়—১৩১৮।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ দেবশর্ম্মা।

—'অভিরূপ' অর্থাৎ বিশেষজ্ঞের সম্মুখে, দিব্য, স্বপ্ন ও মনেরও অগোচর অনির্বচনীয় চিত্র অঙ্কিত করিয়া ধরিয়াছেন। ভাবুক সামাজিকগণ যখন, সেই স্বর্গীয় চিত্র দেখিতে দেখিতে, তাহার হৃদয়প্লাবী ভাবরসে নিমগ্ন হইতে থাকেন, মর্ত্তে থাকিয়াও স্বর্গের সুখ অনুভব করিতে থাকেন, আপনার হৃদয়ের ভাবে আপনিই বিস্মিত, স্তম্ভিত ও বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন, সেই সময়ে, তাহাদিগের সেই সমাধিমগ্ন চিত্তে, অজ্ঞাতসারে, পবিত্রতার নির্ম্মল ছায়া, পুণ্যের বিমল প্রভা, ঊষার অমৃতবর্ষিণী আলোকমালার ন্যায়, নিশীথকালে চিন্তাশীলের হৃদয়ে চন্দ্রিকাহাসিনী প্রকৃতির দিব্য-দ্যুতির ন্যায়, গ্রীষ্মের দিবাবসানে শ্রমক্লান্ত পথিকের নয়নে নীরব কাননবীথিকার শ্যামলচ্ছবির ন্যায়, হাস্যময়ী মূর্ত্তিতে উদিত হয়। তখন দর্শকের জটিল সংসারক্লিষ্ট সেই হৃদয়, এক অপার্থিব ভাবে বিভোর হইয়া পড়ে। সে হৃদয় হইতে পূর্ব্ব সংস্কার দূরীভূত হয়। ঐ সমুদয় নির্ম্মল ও সুন্দর চিত্রাবলীর সংসর্গে সে হৃদয়ও তখন ধীরে ধীরে নির্ম্মল ও সুন্দর হইতে থাকে। সমুদ্রের এক প্রান্তে চন্দ্রমার উদয়মাত্রেই যেমন, বিশাল জলধিবক্ষ ঝটিতি হাসিয়া উঠে, উদ্বেল হইয়া উঠে, বিমল চন্দ্রিকার হাসিতে হাসি মিশাইয়া, উন্মাদিনী তরঙ্গমালা যেমন, আপনা ভুলিয়া কত-ই-না নৃত্য করিতে থাকে, সেইরূপ, সেই সংস্কৃত চিত্রাবলীর পরিদর্শনকালে, দর্শকগণের চিত্ত আপনার ভাবে, আপনিই হাসিতে থাকে, আপনিই নৃত্য করিতে থাকে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া যায়; সমস্ত সংসার হইতে,

আপনাকে পৃথক্ করিয়া লইয়া, সেই চিত্রের ভাবে অণুপ্রাণিত করিয়া লয়। সে চিত্ত তখন আপনাকে তদ্ভাব-ভাবিত করিয়া তুলে। তখন সে হৃদয় হইতে যাহা কিছু অসুন্দর, যাহা কিছু নীচ, যাহা কিছু সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র—তাহার চিন্তা পর্য্যন্তও তিরোহিত হয়। সদ্ভাবে মনঃপ্রাণ পুলকিত হয়। তুমি ইচ্ছা কর বা না কর, মজিতে চাও বা না চাও, বাসন্তী প্রকৃতির মধুর কান্তি, তাহার স্বকীয় লাবণ্যে তোমাকে যেমন বিমুগ্ধ করিয়া তুলিবেই তুলিবে, তুমি যতই অন্যমনস্ক থাক না কেন, যতই বিরক্তচিত্ত হও না কেন, বন-বিলাসিনী পিকবধূর অমৃতনিস্যন্দিনী স্বরলহরী তোমার হৃদয়ে, তোমার অতীতজীবনের কত কথা, কত ছবি, কত ঘটনা যেমন স্মারিত করিয়া দিবেই দিবে, নীরব নিশীথসময়ে সাগর-গামিনী উল্লাসিনী তটিনীর জ্যোৎস্নাময়ী তরঙ্গিনী মূর্ত্তি ও স্বপ্নময়ী, আবেশময়ী, সুধাময়ী প্রাণের কথা কুল কুল ধ্বনি—এই উভয়ে, তোমার সংসারতাপ-দগ্ধ, বিশ্বের নানাবিধ বৈষম্য-বিড়ম্বিত হৃদয়ে যেমন অপার্থিব আনন্দধারা বর্ষণ করিবেই করিবে, তোমাকে মর্ত্ত হইতে অনেক উর্দ্ধে, অনেক উচ্চে তুলিয়া লইবে, আত্মবিস্মৃত করিবে, তদ্রূপ, তোমার মন যতই নীরস হউক না কেন, যতই খিন্ন হউক না কেন, তুমি ভালবাস বা না বাস, সত্কবিকৃত আলেখ্যমালা একবার ক্ষণকালের জন্য, তোমার হৃদয়ের এককোণে অতি সামান্য একটু স্থান, তিলপরিমিত স্থান পাইলেই, তোমার সমগ্র হৃদয়টাকে আপনার করিয়া লইবে। তোমার অজ্ঞাতসারে,

তোমাকে ভুলাইয়া ফেলিবে। সরস্বতীর সে ইন্দ্রজালের হস্ত হইতে আর তোমার পরিত্রাণের আশা থাকিবে না। এক বিন্দু আতরের সম্পর্কে যেমন ভূরিপ্রমাণ পদার্থ সুরভি হয়, এক বিন্দু কর্পূরে, যেমন কলস কলস জল সুবাসিত হয়, তদ্রূপ, সত্‌কবিতার সেই সামান্য সম্পর্কেও তোমার অতবড় হৃদয়টা, ক্ষণমধ্যেই সদ্ভাবময় হইয়া উঠিবে, সদ্‌গুণার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ হইবে। কস্তূরী-হরিণীর বিন্দুপরিমিত কস্তূরিকার সম্পর্কে যেমন অতিবড় নীরস পাষাণও সৌরভে পর্ব্বতবক্ষ আমোদিত করে, তদ্রূপ, তোমার চিত্ত যতই নীরস হউক না কেন, সত্‌-কবিতার শুভ্র আলোকে, তাহা আলোকিত ও অমৃত-নির্ঝরে তাহা সুশীতল ও সুস্নিগ্ধ হইবে। তবে, তুমি যদি একান্ত হতভাগ্য হও, তাহা হইলে, বিষয়ীর মনে শ্মশানবৈরাগ্যের ন্যায়, তোমার পঙ্কিল হৃদয়ে, সে অমৃতশীকরবৃষ্টি হয়তঃ তত ফলোপ-ধায়িকা হইবে না। নতুবা, যদি তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হয়, যদি হৃদয়ে তরঙ্গ থাকে, যদি তুমি প্রকৃতই নিষ্ঠুর ব্যাধের মত নিষ্করুণ বা পাষাণের মত কঠিন না হও, তাহা হইলে, তোমার যে বীণা বহুদিন,—হয়ত কত দিন নীরব রহিয়াছে, তাহাতে কত-ই না কলঙ্ক পড়িয়াছে, তার ছিঁড়িয়াছে,—সেই বীণা, এক সময়ে যাহাতে কত রাগ আলাপ করিতে, কত সুরের সাধনা করিতে, তোমার প্রাণের সেই চিরবাঞ্ছিত বীণা, আবার আপনিই বাজিতে চাহিবে। সত্‌কবিকৃত কবিতার এমনই মোহিনী শক্তি! এমনই উন্মাদকতা। তাই বলিতেছিলাম

যে, সত্কবিকৃত চিত্রাবলীর পরিদর্শনে, হৃদয় নির্ম্মল হয়, সুশীতল হয়, বহির্ভাবনাবিমুক্ত হইয়া, এক অনির্ব্বচনীয় অন্তর্মুখীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আপনার মধ্যে আপনি ডুবিতে থাকে। নির্ম্মল আদর্শতলে, কোন পদার্থের প্রতিকৃতি যেমন সুপরিস্ফুটরূপে প্রতিবিম্বিত হয়, শরতের নির্ম্মল তটিনীর নির্ম্মলতম বক্ষে, যেমন শারদী চন্দ্রিকার মধুময়ী ছবি, সুপরিচ্ছন্নভাবে প্রতিভাসিত হয়, তদ্রূপ, তখন, দর্শকগণের নির্ম্মল এবং বহির্ভাবনাবিমুক্ত হৃদয়-মুকুরে কাব্য-বর্ণিত পূতচরিত ব্যক্তিবর্গের সাধুত্বের ও নির্ম্মলত্বের প্রতিকৃতি অতি স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে। তখন তাঁহাদের মতি-গতি-প্রবৃত্তিও সর্ব্বাংশে সাধু হইয়া উঠে। তখন তাঁহারা, রামাদির ন্যায় ত্রিজগদ্বন্দ্য চরিত্র-সম্পন্ন হইতে বাসনা করেন, বৃত্র-শিশুপালাদির ন্যায় হইতে চাহেন না। তাই প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন,—সত্-কাব্য যশস্কর, অর্থকর, ব্যবহারজ্ঞানপ্রদ ও অমঙ্গলহর। সত্কবিতা সাধ্বী বনিতার ন্যায় অশেষ শান্তিদায়িনী ও পরমহিতোপদেশিনী। যাঁহারা পরিণত-বুদ্ধি-সম্পন্ন, তাঁহাদের সম্বন্ধেত কথাই নাই, যাঁহারা একান্ত সুকুমারমতি, তাঁহারাও, সত্কাব্যের আলোচনায়, কবিনির্ম্মিত আদর্শচরিত্রের আলোচনায় অশেষ শুভফল প্রাপ্ত হয়েন।

পাঠকগণ নির্ম্মল আনন্দ-লাভের জন্য কাব্যপাঠ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, সত্য, কিন্তু সত্-কবিতার করুণাময়ী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বকীয় দিব্য-প্রভায়, পাঠকদিগকেও নির্ম্মল করিয়া

তুলেন। পাঠকের অজ্ঞাতসারে, তদীয় হৃদয়ের উপর, এই প্রকার আধিপত্য-বিস্তারে, ভারতীয় মহাকবিগণ সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন; অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এই প্রকারে, নিজের অলৌকিক কবিতালোকে ও প্রতিভাপ্রভায় পাঠকের অন্তঃকরণ আলোকিত ও বশীভূত করিতে যে সমুদয় মহাকবিগণ সমর্থ হইয়াছেন, তন্মধ্যে বাল্মীকি, ব্যাস ও কালিদাসের পর মহাকবি ভবভূতির নামনির্দ্দেশই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। সুতরাং তাঁহারই কথা আমাদের আপাততঃ আলোচ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভবভূতি।

"ভবভূতি ভারতবর্ষের এক অতি প্রাচীন কবি। কবিত্ব-শক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাসের অব্যবহিত পরেই, ভবভূতির নাম নির্দ্দেশ হওয়া উচিত[১]।"

"ভবভূতির সবিশেষ প্রশংসনীয় কতিপয় গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার গ্রন্থে অর্থের যেরূপ ঔদার্য্য ও গাম্ভীর্য্য আছে, অন্যান্য কবির গ্রন্থে প্রায় সেরূপ লক্ষিত হয় না। ভবভূতি ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য কবির কাব্যে গিরি, নদী, অরণ্য প্রভৃতির প্রকৃত রূপ-বর্ণনা নিতান্ত বিরল। অন্যান্য কবিরা

১—সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব

অনাবশ্যক স্থলেও, আদিরস অবতীর্ণ করিয়াছেন ; কিন্তু, ভবভূতি সে দোষে দূষিত নহেন। তিনি, অনাবশ্যক স্থলে, স্বীয় রচনাকে কদাচ আদিরসে কলুষিত করেন নাই ; আবশ্যক স্থলেও, আদিরস বর্ণনাকালে, সবিশেষ সাবধান হইয়াছেন[১]।"

যে কোনও সহৃদয়, মনস্বী, যদি নিবিষ্ট-মনে, একবার মহাকবি ভবভূতিকে দেখেন, তাঁহার পীযূষরস-বর্ষিণী বীণার ঝঙ্কারে কর্ণপাত করেন, তবে তাঁহাকেই উপরি-বিবৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। বস্তুতঃ কালিদাসের পর, যদি কাহাকেও মহাকবির দুর্লভ কিরীট পরাইতে হয়, তবে এক মাত্র ভবভূতিই তিনি।

মহাকবি কালিদাস, ভারতের স্পর্দ্ধার স্থল উজ্জয়িনীর রাজ-সভায় বিদ্যমান ছিলেন,—এই কিংবদন্তী ব্যতীত, তাঁহার সম্বন্ধে অন্য কোন বিশেষ পরিচয় পাইবার কোনরূপ সুযোগ নাই। বর্ত্তমান সময়ে, পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ, যদিও, কালিদাসের উৎপত্তিকাল সম্বন্ধে নানাপ্রকার সিদ্ধান্ত করিতেছেন, সত্য, কিন্তু কালিদাস সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ মত। এপর্য্যন্ত সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে, কালিদাসের কাল নির্ণীত হয় নাই। সুতরাং কালিদাস যে, ভারতের কোন্ বরেণ্য কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষ গৌরবিত করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিতভাবে দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করা বড়ই দুঃসাহসের

১—বিদ্যাসাগর।

কায্য। কিন্তু ভবভূতি সম্বন্ধে সেইরূপ হতাশ হইবার কোনই কারণ নাই। কেননা, মহাকবি ভবভূতি, তদীয় অনর্ঘ গ্রন্থাবলীতে স্পষ্টরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"অস্তি দক্ষিণাপথে পদ্মপুরং নাম নগরং। তত্র কেচিৎ তৈত্তিরীয়িণঃ কাশ্যপাশ্চরণগুরব, পংক্তিপাবনাঃ পঞ্চাগ্নয়ো ধৃতব্রতাঃ সোমপীথিনো ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তি। তদামুষ্যায়ণস্য তত্রভবতো বাজপেয়যাজিনো মহাকবেঃ পঞ্চমঃ সুগৃহীতনাম্নো ভট্ট-গোপালস্য পৌত্র, পবিত্র-কীর্ত্তিনীলকণ্ঠস্যাত্মসম্ভবঃ শ্রীকণ্ঠ-পদ লাঞ্ছনো ভবভূতির্নাম জাতূকর্ণী পুত্রঃ কবিঃ।"

ভবভূতির এই উক্তিতেই দেখিতে পাইতেছি যে, তিনি স্বয়ং, তাহার উদ্ধতন তিন পুরুষের পরিচয়, বংশের পরিচয়, ব্যবসায়ের পরিচয়,—এ সমস্তই অতি বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি যে কেবল তৎসময়ের প্রখ্যাত পণ্ডিতের বংশে জন্মিয়াছিলেন এবং স্বয়ংও একজন অতি প্রখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন,—মাত্র ইহাই নহে। তিনি মহাকবির বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কল্পনার লীলাতরঙ্গে যে বংশীয়গণের হৃদয় নিয়ত তরঙ্গিত, বাগ্‌দেবীর পূত পাদোদকে যে বংশ ধন্য ও ভারতে বরেণ্য, ভবভূতির উৎপত্তি সেই বংশে। তিনি নিজেও একজন মহাকবি ছিলেন। যাগযজ্ঞাদি তাঁহাদের গৃহে

১—বীরচরিত (বড়ুয়া) পৃঃ ৪

নিত্যক্রিয়া ছিল। যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার তাঁহারা 'চরণ-গুরু' (authority) ছিলেন। তাঁহারা 'পংক্তিপাবন' ছিলেন। 'পংক্তিপাবন' শব্দটী যদি-চ তত বৃহত্ নহে, কিন্তু ইহার অর্থ অতি বৃহত্, অতি গভীর। মহর্ষি মনু, স্বয়ং 'পংক্তিপাবন' শব্দের যে লক্ষণ করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে বুঝিতে পারি যে, ভবভূতি কত বড়, কত সম্মানিত ও কিরূপ পবিত্র বংশে জন্ম-লাভ করিয়াছিলেন। আভিজাত্যের সম্মান বড় সম্মান। ইহার তুলনা নাই। যাহার আভিজাত্য-মর্য্যাদাজ্ঞান আছে, তিনি কখন দুষ্প্রবৃত্তির বশীভূত হইতে পারেন না। বিপথগামী অশ্বকে যেমন, অশ্বচালক বল্‌গাকর্ষণে প্রত্যাবৃত্ত করে, আভিজাত্য-চিন্তাও তদ্রূপ চিন্তাশীল মানবকে সত্পথ স্খলন হইতে নিবৃত্ত করে। পিতৃ পিতামহের পবিত্র চরিতানুধ্যানে অধস্তনদিগের চিত্ত প্রশস্ত হয়, উদার হয়, প্রসন্ন হয়। ভবভূতির তাহাই হইয়াছিল। অতবড় বংশে জন্মগ্রহণ করিলে, তাহার মনোবৃত্তি যে কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা আমরা ভবভূতির কাব্যাবলীর প্রতিপত্রে প্রতিচ্ছত্রে উপলব্ধি করিতে পারি। মাত্র যে সমুন্নত বংশে জন্ম, মহাকবির কুলে জন্ম,—তাহাই নহে, তিনি নিজেও একজন মহাকবি ছিলেন, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ছিলেন। কবিত্ব নৈসর্গিক। ইহা জগদীশ্বরের অনুগ্রহ-দান। আর পাণ্ডিত্য কৃত্রিম, ইহা পুরুষ-কার সাধ্য। যে স্থলে পাণ্ডিত্য আছে, তথায় যে কবিত্ব থাকিবেই, এমন কোন নির্দ্ধারণা নাই, পরন্তু যেখানে কবিত্ব আছে, তথায় পাণ্ডিত্য থাকিতে পারে,

থাকিয়া থাকেও। ভবভূতিতে এ দুইই ছিল। তাঁহার হৃদয়াকাশ যুগপত্ জ্ঞানের মধ্যাহ্ন-সূর্য্যে যেমন উদ্ভাসিত, কবিত্বের বিমল চন্দ্রিকায় তেমনই নিয়ত পরিস্নাত। কবির হৃদয় জগতের প্রচলিত নিয়মের অধীন নহে। জগতের অনুশাসনে শাসিত নহে। তাই ভবভূতির হৃদয়গগনে একদা চন্দ্রসূর্য্যের সমবায় দেখিতে পাই। যখন তাঁহার জ্ঞানের বিষয় চিন্তা করি, তখন দেখি, বেদ, উপনিষদ্, সাঙ্খ্য, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের ছায়াতেই তদীয় কাব্যাবলী অলঙ্কৃত। তাঁহার মালতী মাধবের ৫ম অঙ্কে এবং বীরচরিতের তৃতীয় অঙ্কে অনেক দার্শনিক কথা আছে। উত্তর চরিতের দুই তিন স্থলে বেদান্তদর্শনের বিবর্ত্তবাদের ছায়াপাত হইয়াছে। মহর্ষি ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্র যে তাঁহার কিরূপ আলোচিত ছিল, বাত্স্যায়নের কামসূত্রের ন্যায় গ্রন্থাদিতেও যে তাঁহার কিরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল, তাহা তদীয় 'সান্দ্রানন্দ ক্ষুভিভ হৃদয়' প্রভৃতি শ্লোক পড়িলেই উপলব্ধি করা যায়। আবার যখন তাঁহার কবিত্বের কথা চিন্তা করি, তখন দেখি—তাহা অনুপম, তেমন কবিত্ব, তেমন পরদুঃখকাতরতা, তেমন আত্মবিস্মৃতিপূর্ব্বক পরের কাতরতায়, পরের বেদনায় প্রাণ ঢালিয়া দেওয়া—বুঝি আর ছিলনা, আর হয় নাই, হইবে না। বিপদে, শোকে ক্রন্দন কে না করে, কিন্তু করুণহৃদয় ভবভূতি যেরূপ কান্দিয়াছেন, এবং আমাদিগকেও কান্দাইয়াছেন, সেরূপ আর হয় না। পাঠক! একবার বনদেবতা বাসন্তীর সহিত সীতা-বিরহিত

রামচন্দ্রের আলাপ শ্রবণ করুন, একবার পালিত-তনয়া সীতার শোকে, জীবন্মুক্ত জনকের সেই "হা হা পুত্রি" প্রভৃতি হৃদয়-ভেদী বিলাপ শ্রবণ করুন, একবার সীতা-পতি রামচন্দ্রের সেই—

হা হা দেবি ! স্ফুটতি হৃদয়ং স্রংসতে দেহবন্ধঃ
শূন্যং মন্যে জগদবিরতজ্বালমন্তর্জ্বলামি।
সীদন্নন্ধে তমসি বিধুরো মজ্জতীবান্তরাত্মা
বিষ্বঙ্মোহঃ স্থগয়তি কথং মন্দভাগ্যঃ করোমি ?[১]—

প্রভৃতি কারুণ্যৈকময়ী পাষাণভেদিনী উক্তির প্রতি কর্ণপাত করুন। জানকী-শোক-কাতরা বাষ্প-পীড়িত-নয়না বন-দেবতা বাসন্তীর মুখে সেই—

ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।
ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরনুরুধ্য মুগ্ধাং
তামেব—শান্তমথবা কিমিহোত্তরেণ ?[২]

১—হা দেবি ! আমার হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ এবং শরীরগ্রন্থি শিথিল হইতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার দেখিতেছি, প্রাণের মধ্যে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। আমার অন্তরাত্মা যেন, অবলম্বন হারাইয়া ক্রমে গাঢ় অন্ধকারে ডুবিতেছে, চৈতন্য লোপ পাইতেছে, হায় এ হতভাগ্যের এখন উপায় কি ?

২—তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয় স্বরূপ, তুমি আমার নয়নের চিরানন্দদায়িনী কৌমুদী, তুমি আমার শরীরের অমৃতলেপ-সদৃশী—এইরূপ শত শত প্রিয়বাক্যে যে সরলার চিত্ত বিমুগ্ধ করিয়াছিলে, তাহাকেই কি না ত্যাগ—ছি ছি, আর প্রয়োজন নাই।

প্রভৃতি বজ্রেরও হৃদয়-বিদারিণী শোক-গাথা শ্রবণ করুন,—বুঝিবেন, ভবভূতির হৃদয় কি উপাদানে গঠিত ছিল। বিধাতা বুঝি, শারদী জ্যোত্স্নার নির্য্যাস অপেক্ষাও কোমলতর পদার্থে ভবভূতির দয়াপ্রবণ হৃদয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সমবেদনা-শূন্য সংসারে শান্তির প্রস্রবণ প্রবাহিত করিবার জন্যই বুঝি, পরদুঃখ-কাতরতার প্রতিমূর্ত্তি করিয়া ভবভূতিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ভবভূতি পণ্ডিত ছিলেন, ভবভূতি কবি ছিলেন, কিন্তু তিনি পাণ্ডিত্য অপেক্ষা কবিত্বের গৌরব করিতে ভাল বাসিতেন। তাই তিনি পণ্ডিত-কুল-গুরু বৃহস্পতির পরিবর্ত্তে কবি-কুল-গুরু বাল্মীকির পাদবন্দনা করিয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি আত্ম-পরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গে 'বশ্যবাচঃ কবেঃ কাব্যং' বলিয়া, স্পর্দ্ধার সহিত সামাজিকগণের মন আকর্ষণ করিয়াছেন। বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্ প্রভৃতি সকলের ভাষাতেই, তিনি তাঁহার প্রিয় কাব্যগুলির কোন-না-কোন অংশ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকের পত্র-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বেদ হইতে কাদম্বরী পর্য্যন্ত মনে পড়ে। তাঁহার গাঁথিবার এমনই কৌশল যে, 'আসল' হইতেও তাঁহার 'নকল' সুন্দর হইয়াছে। তিনি যে 'বশ্যবাচঃ কবেঃ কাব্যং' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, 'কুতোহ্যবচনীয়তা' বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন, তাহা সার্থক হইয়াছে। তাঁহার 'শ্রীকণ্ঠ'-নাম অন্বর্থ হইয়াছে। তিনি গুরুর প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান ছিলেন. কোথাও গুরুদেবের নামোল্লেখ করেন

নাই। 'জ্ঞান-নিধি' এই বিশেষণ দিয়া গুরুকে প্রণাম করিয়াছেন। ভবভূতি, ভারতের অতি স্পর্দ্ধার পাত্র, প্রসিদ্ধ কুমারিল ভট্টের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁহার প্রিয় 'পদ্মাবতী' এখনও বিদ্যমান আছে। বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে 'পারা' ও 'সিন্ধু' নামক দুইটী নদীর সঙ্গমস্থলে ঐ নগর অবস্থিত।

একেত দক্ষিণাপথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার জন্ম, পূর্ব্ব পুরুষগণের অনেকেই মহাকবি, মহাপণ্ডিত, তাহার উপর আবার তিনি নিজেও একজন সর্ব্বলোকবিদিত সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, দুর্লভ কবিত্বরত্নে অলঙ্কৃত। তাহাতে আবার, তিনি কনোজের স্বাধীন নরপতির প্রধান সভাসদ্,—প্রধান রাজ-কবি ছিলেন। কোন দিকেই তাঁহার কোনপ্রকার ত্রুটি ছিল না। যে যে অবস্থায় পড়িলে মানুষের মনোবৃত্তি উচ্চ হয়, উদার হয়, মানুষ দেবতা হয়, ভবভূতির অদৃষ্টে সে সমস্তই সংঘটিত হইয়াছিল। নীচ চিন্তা—নীচ কল্পনা, তাঁহার অন্তঃকরণে কখন উন্মেষলাভও করে নাই। তিনি যাহা কিছু ভাবিতেন, যাহা কিছু দেখিতেন, সে সমস্তই উচ্চ, সমস্তই উদার, পবিত্র। তাই তদীয় কাব্যাবলীর কোথাও আমরা কোনপ্রকার তরল বা অপবিত্র ভাব দেখিতে পাই না। অলঙ্কারের আপাতরম্য আবরণে, তিনি তাঁহার স্বভাবসুন্দর কাব্যাবলী আবৃত করিতেন না। বৃথা-শব্দ বা অপ্রচলিত-শব্দ প্রয়োগে, তিনি কবিতার মর্য্যাদা হানি করিতেন না।

তাঁহার কাব্যে উপমা-প্রয়োগ অতি অল্প। কেন না, তিনি জানিতেন যে, কালিদাসের ভারতবর্ষে উপমা দিতে যাওয়া

ধৃষ্টতামাত্র। বর্ণনীয় বস্তুগুলি, ভবভূতির লেখনীর মুখে পড়িয়া, তাহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ শোভার অধিক শোভা ধারণ করিত। কালিদাসের ন্যায়, তন্ন তন্ন করিয়া বাছিয়া, সুন্দর ছবিগুলি একত্র সঙ্কলন করিবার রোগ ভবভূতির ছিল না। কেন না, যাহা অসুন্দর, তাহাকে সুন্দর করিয়া তুলিবার ক্ষমতা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। অসুন্দর বস্তুর উপর কালিদাসের এমনই বিতৃষ্ণা ছিল যে, তাঁহার সমস্ত গ্রন্থমধ্যে কোথাও পাপের বর্ণনা বা কোন বীভত্স রসের অবতারণা নাই। কিন্তু মহাকবি ভবভূতি সেরূপ নহেন। তিনি যাহা, বর্ণনীয় বস্তুর প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন, সুন্দর হউক, অসুন্দর হউক, তাহাই বর্ণনা করিতেন। দুইচারিটি প্রকৃতোপযোগী শব্দে, চকিতের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড, সম্পূর্ণ পবিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়া, একটি আদর্শ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া, সামাজিকদিগের হৃদয় পবিত্র ও উদার করিতে যত্ন পাইতেন। আদর্শচরিত্র দেখাইয়া লোক-শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার নিজের সবেদন উক্তিতেই বুঝিতে পারি যে, তদীয় জীবদ্দশায়, তাঁহার সে মহত্ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় নাই।

তাঁহার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হউক আর না-ই হউক, সংস্কৃত-সাহিত্য-জগতে তাঁহার স্থান যে অতি উচ্চে, এবিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিস্ফুট বর্ণনায় এবং কল্পনার কমনীয়তায় তিনি অপ্রতিরথ ছিলেন। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে—হিতোপদেশের সরল ভাষা হইতে নৈষধচরিতের শ্লেষ-বহুল

সুখ-শ্রুতি শব্দ-বিন্যাস পর্য্যন্ত, শঙ্করাচার্য্যের সার্থক তাত্পর্য্যপূর্ণ ভাবগম্ভীর শব্দাবলী হইতে বেদ-বেদান্ত উপনিষদাদির অর্থ-বহুল দৃঢ়সংস্কারবিধায়ক চিন্তাপূর্ণ পদসমূহ পর্য্যন্ত, কালিদাসের স্বপ্নময়ী কবিতা-লহরী হইতে, কাদম্বরীর অলঙ্কার-পরিশোভিতা বৈচিত্র্যময়ী প্রতিকৃতি পর্য্যন্ত যাহার আলোচনাই কর না কেন—যাহাকেই চাও না কেন,—ভবভূতির লেখনীমুখে, সে সমস্তই দেখিতে পাইবে। ভবভূতি যে নিজেই নিজকে 'বশ্যবাক্' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে কথা সার্থক হইয়াছে। ভাষা যথার্থই দাসীর ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তন করিয়াছে। তাঁহার সমসাময়িক মনস্বি-বৃন্দ যে, তাঁহাকে 'শ্রীকণ্ঠ' নামক উপাধিমণ্ডনে বিমণ্ডিত করিয়াছিলেন, তাহা অতীব সুসমঞ্জস হইয়াছিল। বাগ্-দেবতা যথার্থই তাঁহার কণ্ঠে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অন্যথা, জনহীন নিবিড় অটবীশ্রেণীর, ইতস্ততঃ বিস্রস্ত উপলরাশির, উদ্ভ্রান্তভাবজনিকা বিস্ময়-করী পর্ব্বতমালার অমন সুন্দর বর্ণন এবং কানন-চারিণী করি-বধূর নির্জ্জন-নৃত্য, তাহার মস্তকে আবার প্রেম-বিহ্বল করিরাজের মৃণালদলরূপী আতপত্র ধারণ প্রভৃতির অমন সুন্দর অঙ্কন, প্রকৃতির অমন মনোমোহন আলেখ্য-চিত্রণ কদাচ সম্ভবপর নহে। অতি সামান্য পদার্থ হইতেও তিনি যেন সৌন্দর্য্য আকর্ষণ করিয়া প্রকাশিত করিতে পারিতেন। জীবজগতের যথাযথচিত্রণে, প্রাণীর মনে কখন কোন্ ভাবের উদয় হয়, কখন জীব সংসারের কোন্ মন্ত্রে মুগ্ধ হয়, কোন্ ইন্দ্রজালে অন্ধ হয়, মানুষের মনের অবস্থা, শোকে হউক, প্রেমে হউক, আশায়

হউক, নৈরাশ্যে হউক—কখন কিরূপ হয়, মানুষের স্বচ্ছ-হৃদয়-দর্পণে কখন কোন্ ছবি কিভাবে প্রতিফলিত হয়, সেই প্রতিফলিত ছবির আবার কোন্ অঙ্গে কখন কোন্ ভাবের পরিব্যঞ্জিকা রেখাবলীর উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা তিনি যে ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন, তেমনটি আর দেখি না। তাঁহার বর্ণিত উন্মাদ—উন্মাদের চরম, তাঁহার বর্ণিত শোকদুঃখ—শোকদুঃখের চরম, তাঁহাব বর্ণিত মিলন—মিলনের চরম। মানুষের—অথবা কেবল মানুষ কেন, পশুপক্ষি-কীটপতঙ্গের পর্য্যন্ত হৃদয়ের ভাব, উচ্ছ্বাস এবং আবেগ তিনি যে ভাবে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পর আর কেহ তেমনটি পারেন নাই।

কিন্তু মহাকবি কালিদাসের ন্যায়, ভবভূতি আপনাকে চিন্তা-প্রবাহে ভাসাইয়া দিয়া ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন ক্ষেত্রে লইয়া যাইতে পারিতেন না। পূর্ব্বচিন্তিত বিষয়টিকে একবারে বিস্মৃত হইয়া, নূতন চিন্তায় অভিভূত হইতে পারিতেন না। তাঁহার হৃদয়ে যদি দুঃখের শোকের বা সমবেদনার করুণ বাঁশরী একবার বাজিয়া উঠিত, তবে সেই বাঁশরী-ঝঙ্কার আর সহজে নিবৃত্ত হইত না। তাঁহার প্রতিকথায়, তারপর হইতে, দুঃখের সেই করুণ ক্রন্দন শুনা যাইত। কালিদাস যেমন স্বভাবের অদ্বিতীয় কবি, ভবভূতিও তদ্রূপ ভাবের অদ্বিতীয় কবি। বঙ্কিম চন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন, 'মধুরে কালিদাস, উৎকটে ভবভূতি।' যখন বসুন্ধরা, শরতের নির্ম্মল শশাঙ্কের শুভ্র হাস্যে হাসি মিশাইয়া, আনন্দ-বিহ্বলা মূর্ত্তিতে জগদ্বাসীর মনোরঞ্জন করেন,

তখন আমরা, তথায় কালিদাসকে দেখিতে পাই, যখন, নির্ম্মল শারদচন্দ্রমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া, প্রবাহিণী কুল কুল সঙ্গীতে দশদিক্ মাতাইয়া, তরঙ্গভরে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া যায়, তখন তথায় আমরা কালিদাসকে দেখিতে পাই। দিবাবসানে, যখন, শুভ্রমূর্ত্তি বকপংক্তি আকাশগাত্রে কুসুমের মালায় তোরণ সাজাইয়া খেলিয়া বেড়ায়, তখন তথায় আমরা কালিদাসকে দেখিতে পাই। কিন্তু ভবভূতির বিচরণভূমি সম্পূর্ণ পৃথক। তবে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-চিন্তায় তিনিও কম দক্ষ নহেন। তিনি দক্ষতর; কালিদাস দক্ষতম। কালিদাসে আর তাঁহাতে প্রভেদ এই,—কালিদাস যে স্থানে মানুষের মনের আবেগ মাত্র ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন, ভবভূতি তথায় শক্তিপূর্ণ ভাষায় তাহা বিবৃত করিয়াছেন। কালিদাস যে স্থলে, নয়নাপাঙ্গে এক বিন্দু অশ্রু উদ্ভূত করিয়া, কোথাও বা নয়ন জলভরাক্রান্তবৎ করিয়া পাত্রের গভীর হৃদয়-বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন, ভাবের কবি ভবভূতি তথায়, তদীয় নায়ককে তারস্বরে কাঁদাইতে কাঁদাইতে ছিন্নতরুর ন্যায় ভূতলসাৎ করিয়াছেন, এবং তাহার কান্নায় চেতনাচেতননির্ব্বিশেষে অপর সকলকেও কাঁদাইয়াছেন। কালিদাসের রস যে স্থলে ব্যঙ্গ্য, ভবভূতির রস তথায় বাচ্য। কালিদাসের গ্রন্থ পাঠে যত মধুর, অভিনয়ে তদপেক্ষা মধুরতর, আবার ভবভূতির কাব্য অভিনয়ে যত সুন্দর, নির্জ্জনে একাকী বসিয়া তন্ময় হইয়া পাঠ করিলে, তাহা ততোধিক সুন্দরতর। ভবভূতির দৃশ্যকাব্য শ্রব্য-ভাবাপন্ন। তাঁহার ভাষার এমনই গাম্ভীর্য্য, এমনই

ভাবপ্রবণতা যে, তাহা যত পাঠ করিবে, তোমার হৃদয়ে, ভাবের ততই নিত্য নূতন তরঙ্গ উত্থিত হইবে। তোমার চিত্তের উচ্ছৃঙ্খলতা দূর হইবে। তোমাকে স্থির ধীর গম্ভীর করিয়া তুলিবে। ভগবানের অনুগ্রহে, যদি তোমার হৃদয়ে, প্রেম, দয়া, প্রীতি, স্নেহ, আত্মোৎসর্গ, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদের কোন একটিরও অঙ্কুর উদ্গত হইয়া থাকে, তবে, ভবভূতির কবিতারূপিণী স্নিগ্ধশীতল-পীযূষবৃষ্টিতে, তাহা অচিরেই সংবর্দ্ধিত হইবে। তুমি যদি দানব হও, তবুও তোমাকে মানব করিয়া তুলিবে। "ভবভূতির সময়ে ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বিদর্ভের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, ভারতের তদানীন্তন বৌদ্ধপ্রধান পল্লীসমূহের, তথা রাজসংসারের প্রকৃত চিত্র কি প্রকার ছিল, তাহার অতিবিশদ বিবরণ, তদীয় মালতীমাধবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের কতিপয় অমীমাংসিত ভূগোল-তত্ত্বের মীমাংসার পক্ষে, ভবভূতির মালতীমাধব এক প্রধান সহায়। মনে হয়, সে দিন আর দূরবর্ত্তী নহে, যে দিন, সেক্ষপীয়র অথবা বেকন, এডিসন অথবা জন্‌সন্‌কে শিক্ষিত বাঙ্গালী যে চক্ষে দেখেন, ভবভূতি তাঁহাদের ততোধিক দৃষ্টি-আকর্ষণে সমর্থ হইবেন[১]।"

ভবভূতির স্বর্গারোহণের পর হইতে, ভারতবর্ষের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহাতে, তাঁহার নাম, তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য, তাঁহার কাব্য,

---

১—বঙ্গদর্শন।

প্রায় সমস্তই লোপ পাইয়াছিল। তাহার পর—অনেক আপদ্, অনেক উৎপাত, অনেক ঝঞ্ঝাবাতের পরে, ইংরাজরাজত্বে, ইতস্ততঃ বিদ্যাচর্চ্চার বৃদ্ধিতে, কাব্য আলোচনায়, কলাশিক্ষায় ও উচ্চ আদর্শদর্শনের লিপ্সায়, আমাদের ভবভূতিকে আদর করিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে ও উপযুক্ত সময়ও আসিয়াছে। আমাদের নিকটে, সংস্কৃত শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের নিকটে ভবভূতির প্রতি সম্মান বা আদর প্রদর্শন, আত্মীয় কুটুম্বের প্রতি আদর প্রদর্শনের ন্যায়। ভট্টকুমারিল স্বামী, তাঁহার প্রিয় শিষ্য গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ ভবভূতিকে যে পথে পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন, এই সুদীর্ঘ-কাল যাবৎ ভারতবর্ষ সেই একই পথে চলিতেছে। সেই বেদে অচলা ভক্তি, সেই যাগ-যজ্ঞের ফলে অটল বিশ্বাস, সেই দেবতাব্রাহ্মণের সেবায় অনুরাগ, অদ্যাবধি ভারতে তেমনই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাহাই যদি হইল, তবে কুমারিলের প্রথম এবং প্রধান শিষ্য ভবভূতি আমাদের সমাজের শীর্ষস্থানীয়, আমাদের পরম ভক্তিভাজন, আদর্শপুরুষ।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণের আদর্শ হইতে গেলে যে সমুদয় গুণ থাকা আবশ্যক, সে সমস্ত গুণই ভবভূতির প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাঁহার রচনাতে, চরিত্রের ও হৃদয়ের গাম্ভীর্য্যে, উদারতায় এবং প্রশস্ততায়, তাঁহাকে আমাদের পরমপূজনীয় করিয়া তুলিয়াছে। সকল সময়ে সকল অবস্থায়, সকল প্রকার মানবের প্রতিই তাঁহার দয়া অসীম। কিন্তু সে দয়ার মধ্যেও অন্যায়ের প্রতি, পাপের প্রতি তাঁহার ভ্রুকুটীর ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। তাই

বলিতেছিলাম, ভবভূতি আমাদের আদর্শ—অনুকরণীয়। তিনি আমাদের জন্য, তাঁহার সকল সামর্থ্য ব্যয় করিয়া, অতি সুন্দর, পৃথিবীর মধ্যে সুন্দর আদর্শ পুরুষ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। যতদিন সংস্কৃত সাহিত্য থাকিবে, মানবহৃদয়ে চিন্তা-শক্তি থাকিবে, ততদিন তাঁহার রাম ও তাঁহার সীতার প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া, কোন্ মনস্বীর নয়ন অশ্রুসিক্ত না হইবে? তাঁহার কবিতায় আমরা ভারতবাসী মাত্রেই পূত, আপ্যায়িত এবং কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।

মহাকবি ভবভূতি সরস্বতীর উপাসক ছিলেন, লক্ষ্মীর সেবক ছিলেন না। তাই তিনি সরস্বতীর বরপুত্র,—তাঁহার উপাস্যদেবতার প্রিয়পুত্র—কালিদাসকে বড় ভাল বাসিতেন। অথবা কেবল কালিদাস কেন? যাঁহারা সারস্বত সাম্রাজ্যের অধিপতি, তিনি তাঁহাদিগের সেবা করিতেই ভাল বাসিতেন। তাই তিনি সারস্বত রাজ্যের প্রথম ও প্রধান সম্রাট্ বাল্মীকিকে সর্ব্বাগ্রে প্রণাম করিয়াছেন, যাঁহার রামায়ণই হইল ভবভূতির সর্ব্বস্ব। সেই জন্যই ভবভূতি, কোন স্থানে এমন কোন প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন নাই, যাহাতে বাল্মীকির সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে। তিনি বিলক্ষণরূপে বুঝিয়াছিলেন যে, বাল্মীকির সহিত প্রতিযোগিতা-প্রয়াস অন্য কোন কবির পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তাই বাল্মীকির আবিষ্কৃত পথের পথিক হইলেও ভবভূতির পাথেয় একেবারে বিভিন্ন এবং বর্ণনার কৌশল অন্য প্রকার ছিল। বাল্মীকির বিরচিত মানবের আদর্শে তিনিও মানবমূর্ত্তি গঠন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে

মানবের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি তাঁহার নিজের কল্পনা-প্রসূত নূতন কারুকার্য্যে চিত্রিত। সে মানবের হৃদয় অন্য উপাদানে গঠিত, সে মানবের জীবন অন্য পথে পরিচালিত। বাল্মীকির সহিত সমকক্ষতা করিবার প্রয়াস তাঁহার আদৌ ছিল না। বাল্মীকির রামায়ণ 'শ্রব্য কাব্য'। ভবভূতির রামচরিত 'দৃশ্য কাব্য'। এই প্রথমেই ভবভূতির গন্তব্য পথের ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। ভবভূতিই সর্ব্বপ্রথমে রামায়ণের ঘটনাবলী নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করেন। তাঁহার পূর্ব্বে, আর কেহ যে রামচরিতাবলম্বনে নাটক রচনা করিয়াছিলেন, এমন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। তবে ভবভূতির পরে, তাঁহার যশঃসৌরভে বিমুগ্ধ হইয়া, অনেকে অনেক নাটক রচনা দ্বারা রাম-সীতার পবিত্র চরিত চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপিও করিতেছেন। তাই বলিতেছিলাম, বাল্মীকি ভবভূতির প্রধান উপাস্য ছিলেন। তার পরই কালিদাস। যদিও ভবভূতি তদীয় গ্রন্থের কোন স্থলে কালিদাসের নাম করেন নাই, বটে, কিন্তু নয়ন-সংযোগ করিয়া পড়িলে, স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার রচনার ছত্রে ছত্রে, তিনি কালিদাসের গুণপণা, কালিদাসের মধুরতা অনুভব করিতেছেন, এবং অন্যকেও আস্বাদ লইবার অবসর করিয়া দিতেছেন। তাঁহার যে সমুদয় বিচিত্র, মনোহর, অনুপম সৃষ্টি-চাতুর্য্য দেখিয়া, তাঁহাকে পূজা করিতে প্রবৃত্তি হয়, সে সমস্ত সৃষ্টিরই নিদান কালিদাসের অপার্থিব কাব্যসমূহে সরস্বতীর প্রবাহের ন্যায়, লোকালোক পর্ব্বতের ন্যায়, প্রকাশিত ও

অপ্রকাশিত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। কালিদাসের ভাব, কালিদাসের ছবি, কালিদাসের সৃষ্টি—এ সমস্তই যেন এক একখানি সোনার প্রতিমা। সেই স্বর্ণপ্রতিমাগুলি শিল্পি-চূড়ামণি ভবভূতির প্রস্তুত নানাবিধ হীরক-মুক্তাখচিত ডাকের গহনায় এমনই সুন্দর সাজিয়াছে যে, দেখিলে অবাক্ হইতে হয়, স্তম্ভিত হইতে হয়। ভাষায় তাহার বর্ণনা করা যায় না। সে প্রতিমা-পুঞ্জ যখন দেখি, তখন বুঝিতে পারি না যে, কে বড়—কালিদাস না ভবভূতি? কে অধিক প্রেমিক—কালিদাস না ভবভূতি? কালিদাস যদি ভবভূতির এই রচনানৈপুণ্য দেখিতেন, তাহা হইলে, তাঁহাকেও এই প্রশ্নের মীমাংসায় হয়ত একটু সমস্যায় পড়িতে হইত।

কালিদাস ও ভবভূতি—উভয়েই সংস্কৃত কাব্যে সুপরিচিত, সংস্কৃত ভাষার স্থিরপ্রকাশ চন্দ্রমা। ইঁহারা দুই জনেই সুকবি, সুপণ্ডিত, সুরসিক, ভাবুককুল-চূড়ামণি। ইঁহারা দুই জনেই বাণীর বরপুত্র, কবিতারাজ্যের রাজ-রাজেশ্বর। ভগবান্ ইঁহা-দিগকে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দিয়াছিলেন, অনন্ত সামর্থ্য দিয়া-ছিলেন, আর জগতে অমরত্বলাভের দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া-ছিলেন। তাই, ইঁহাদের নাম, ইঁহাদের কথা, ভারতের মনস্বি-হৃদয়ে প্রতিনিয়তই আলোচিত হইতেছে। যতদিন চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে, ততদিন হইবেও।

এই দুই জনের কেহই সকল-লোক-মোহনের জন্য কাব্য লিখেন নাই। মাত্র শিক্ষিত সামাজিকদিগের জন্য, কবিতা-

রসাস্বাদিগণের জন্য লিখিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই নিজের নিজের সম্পদে, নিজের নিজের কৌশলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিত্রকর। দুই জনেরই চিত্র করিবার উপকরণ এক, রঙ্গ এক, কেবল চিত্রের কৌশল পৃথক্। ইঁহাদের একজন—কালিদাস কেবল সৌন্দর্য্য মাত্র দেখেন, আর কোন দিকেই লক্ষ্য নাই। যদি অধিক হইয়া পড়ে—এই আশঙ্কায় অতি গভীর ভাবও অতি অল্প কথায় প্রকাশ করেন। বড় বড় ঘটনাও খুব সঙ্ক্ষেপে প্রকাশ করেন। যাহা দশটি শব্দে বলিলেও বৈচিত্র্যের হানি হয় না, তাহা দুইটি শব্দে বলিয়া ফেলেন। একি কম নিপুণতা! সমগ্র হিমালয় ১৭টী শ্লোকে, বিরাট্ সমুদ্র ১৫ শ্লোকে, ঋতুরাজ বসন্ত ১৬ শ্লোকে, পত্নীবিয়োগের আর্ত্তনাদ ১৮ শ্লোকে, পতিবিয়োগের বিলাপ ৩৩ শ্লোকে, রাজ-বাড়ীর বরযাত্রীর সেই বিপুল শোভাযাত্রা ৮ শ্লোকে বর্ণনা পূর্ব্বক মনোজ্ঞ করিয়া তুলা অসাধারণ ক্ষমতার কথা। এ পর্য্যন্ত সেইরূপ কল্পনা-চাতুর্য্য এবং রচনা-মাধুর্য্য আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই। বোধ হয়, আর পারিবেনও না। বাছিয়া বাছিয়া, খুঁজিয়া খুঁজিয়া, লোকের মনের মত পদার্থ-নির্ব্বাচনে অমন দক্ষ শিল্পী আর হইবে না। এ সমস্তই সত্য। কিন্তু একটি কথা আছে। মানুষের মন যখন উন্মাদ-গ্রস্ত হয়, প্রেমে হউক, শোকে হউক, স্নেহে হউক, মানুষ যখন যথার্থই পাগল হইয়া উঠে, তখন অত ভাবিলে চিন্তিলে, অত নিয়মবদ্ধ হইলে, সাধারণের তাহাতে আশা মিটিবে কেন? যখন হৃদয়ের কবাট

উন্মুক্ত হইবে, তখন ভাষার চরণ শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিলে চলিবে কেন? তাই ঐ প্রকার স্থলে, ভাষার মাত্রা অল্পাধিক বৰ্দ্ধিত হইলে, তত দোষ হয় না। বরং তাহাতে সৌন্দর্য্যের বিকাশ আরও অধিকতরই হইয়া থাকে। তাই ভাবুকপ্রবর ভবভূতি, ঐ প্রকার স্থলে প্রয়োজনমতে, ভাষার শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন। সেই জন্যই, তাঁহার বাঁশরীর ঝঙ্কারে লোকের মন অধিকতর বিমুগ্ধ হইয়াছে। কালিদাস নিজে থাকিলে হয়ত বলিতেন যে, 'ভায়া হে, মাত্রা চড়াইলে?'—কিন্তু ভবভূতি ভাবিলেন যে, ইহাতে সৌন্দর্য্যের হানি না হইয়া, বরং বৃদ্ধিই হইবে। তাই ঐ সকল স্থলে, ভবভূতি, তাঁহার বিশ্বস্ত কল্পনার স্বৈরগমনে কোন প্রকার বাধা প্রদান করেন নাই।

ভবভূতি ও কালিদাসে আরও একটু প্রভেদ আছে। কালিদাস যখন কবি, তখন ভারতবর্ষ এক অদ্বিতীয় রাজার অধীন, এক ছত্রের তলে শান্তির অঞ্চলে সুপ্ত। তখন সমগ্র ভারতের সকল বিষয়ের হর্ত্তা কর্ত্তা একজন রাজা। তাই কালিদাসের কবিতার বিষয় ভারতব্যাপী। রঘুর দিগ্বিজয় ও ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-সভা প্রভৃতি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সে সময়ে বিদ্যাচর্চ্চার খরস্রোত ভারতের সর্ব্বত্র প্রবাহিত। তখন ভারতে সুরসিক, সুপণ্ডিত সামাজিক অনেক। তখন বিদ্যার গৌরবে, শিল্পের গৌরবে, কলার গৌরবে ভারত জগতের শীর্ষস্থানীয়। ওরূপ সময়ে, ভারতের ওপ্রকার স্পর্দ্ধার দিনে, কোন দিকে কোন রকম অতিবৃদ্ধি করিলেই যে, তজ্জন্য রসজ্ঞ-সমাজে

উপহাসাস্পদ হইতে হইবে, এই নিগূঢ় তত্ত্ব কবিকুল-রবি কালিদাস উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই কারণেই, কোনস্থানে তিনি অযথা বিদ্যাপ্রকাশ করিতে যান নাই। কোথাও অনাবশ্যক কথা বলিয়া গ্রন্থের কলেবর ভারাক্রান্ত করেন নাই। সর্ব্বত্রই সংযত-হস্তে ও সংযত-চিত্তে তূলিকা-পরিচালনা করিয়াছেন। কালিদাসের সময়ে হিন্দুদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি, তাই তাঁহার তদানীন্তন কল্পনাও সর্ব্বব্যাপিনী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও ওজস্বিনী।

আর ভবভূতির সময়ে ভারত-সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ভারতের সে চরম উন্নতির তপন অস্তাচলোন্মুখ হইয়াছে। পূর্ব্বে, উন্নতির দিনে, যে শিক্ষা, দীক্ষা, কল্পনা সমগ্র ভারতবর্ষে একাধিপত্য করিতেছিল, এইক্ষণে সেই সমগ্র-ভারত-ব্যাপিনী বিদ্যা, সমগ্র-ভারত-ব্যাপিনী কল্পনা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডিত রাজ্য-সমূহে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে। তাই কালিদাসের ন্যায় ভবভূতির প্রতিভায় সমগ্র ভারতের প্রতিকৃতি প্রতিবিম্বিত হয় নাই। কালিদাসের প্রতিভার বিকাশস্থল ছিল সমগ্রভারত, আর ভবভূতির প্রতিভা ক্ষুদ্র বিদর্ভের মধ্যেই আবদ্ধ। তাহার বহির্দ্দেশে সে প্রতিভাবিকাশের অবসর ঘটে নাই। তবুও, ভবভূতির শুভাদৃষ্ট বশতঃ, বিদর্ভে অনেক পণ্ডিত উৎপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইলেও, ভূয়োদর্শনের বিপুল শক্তিসম্পাদে বিদর্ভ তত সম্পন্ন ছিল না। এই জন্যই পণ্ডিত-বহুল বিদর্ভের সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা সুদৃঢ়ভাবে সংস্থাপনের

উদ্দেশে, ভবভূতিকে অনেক দীর্ঘ-দীর্ঘ-শব্দ-সম্বন্ধ সমাস-যুক্ত-পদের বিন্যাস করিতে হইয়াছে। তৎসময়ের বৈদর্ভী রীতির অনুসরণে, অনেকস্থলে রসাববোধের ব্যাঘাত করিতে হইয়াছে। যদি ভবভূতি মাত্র বিদর্ভের কবি না হইয়া, কালিদাসের ন্যায় 'ভারতের কবি' হইতেন, তাহা হইলে, হয়ত, তাঁহার কবিত্ব-চন্দ্রমায় আমরা ঐ সকল কলঙ্ক দেখিতাম না। ভবভূতির সময়ে বিদর্ভে পণ্ডিতের অভাব না থাকিলেও কবিতারসোন্মত্ত-প্রাণের অভাব ছিল। তখন সামাজিকদিগের বিলক্ষণ অভিমান ছিল, কিন্তু অভিমানোচিত পদার্থ ছিল না। সেই কত পূর্ব্বের অভিমানে বর্ত্তমান নবদ্বীপের ন্যায়, তৎসময়ের সামাজিকদিগের মনে একটা বিষম গর্ব্ব ছিল, কিন্তু হৃদয়ের প্রকৃত বিকাশ ছিল না। সেই সময়ের পাণ্ডিতমণ্ডলী, অত পূর্ব্বেও, সর্ব্বনাশকরী গতানুগতিকতার কবল হইতে পরিত্রাণ পান নাই। তাই কালিদাসের ন্যায়, ভবভূতির ভাগ্যে, উৎকৃষ্ট, প্রেমিক সামাজিক জুঠিয়া উঠে নাই। ভবভূতি বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি অসময়ে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেটি পূর্ণ বিকাশের সময় নহে। তাই তিনি 'মহাবীর চরিত' লিখিয়া, সামাজিক-গণের ঈর্ষাকলুষিত কটাক্ষ-সম্পাতে বিষম ব্যথিত হইয়া 'মালতী-মাধবের' সময়ে, গভীর ক্ষোভে, হৃদয়ের মর্ম্মস্থলের ব্রণের বেদনায় অধীর হইয়া বাষ্পপীড়িতকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।

উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমান-ধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী[১] ॥

ইহা তাঁহার অহঙ্কার বা স্পর্দ্ধার উক্তি নহে, ইহা তাঁহার ভাব-গম্ভীর অন্তঃকরণের গভীর দুঃখের আর্ত্তনাদ। আমি নিজে যে অমৃতে, যে অপার্থিব রসে বিমুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত হইয়াছি, সেই অমৃত, আমি যাহাদিগকে ভালবাসি, আমার সেই প্রিয় স্বদেশবাসী-দিগকে আস্বাদন করাইতে গেলাম, আর তাহারা কিনা মুখ ফিরাইয়া বসিল—ইহাতে দুঃখ না হয় কার? বিশেষতঃ ভবভূতি, যাঁহার হৃদয়ে প্রেম ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না। তাই ভবভূতি ব্যথা পাইয়া ঐ খেদ করিয়াছিলেন, গভীর মনো-বেদনায় ঐ কথা বলিয়াছিলেন, স্পর্দ্ধা করেন নাই।

আজ কাল গ্রাহকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে, ব্যবসায়ী সংবাদ পত্রের পরিচালকগণ যেমন নানাবিধ প্রলোভন-জনক উপহারের বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন, তদ্রূপ, বুঝিবার শক্তি-রহিত, চঞ্চল সামাজিকদিগের মন আকৃষ্ট করিবার জন্য, কবিবর ভবভূতিকেও 'যদ্বেদাধ্যয়ন'—বলিয়া, প্রলোভন দেখাইতে হইয়া-ছিল। হায়! তাঁহার 'অস্থানে পততামতীবমহতামেতাদৃশী দুর্গতির'

১—যাঁহারা আমার এই সকল প্রবন্ধের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, জানি না, তাঁহাদের অবজ্ঞার কারণ কি, (তবে আমি বলিতে পারি যে,) তাঁহাদের জন্য আমার এই উদ্যম নহে। কাল যখন অনন্ত এবং পৃথিবীও বিপুল, তখন আমার প্রবন্ধের প্রকৃত রসগ্রাহী সহৃদয় মহাত্মা, হয় কোথাও আছেন, না হয় কালে জন্মিবেন।

চরম হইয়াছিল! তাঁহার কাব্যে নূতন ব্যাপার, নূতন পদার্থ, নূতন নূতন ভাব তত অধিক না হইলেও তাঁহার কল্পনার গঠন প্রণালী দেখিলে, তাঁহার উদার-রমণীয় ভাববিন্যাসের সুকৌশল দেখিলে, তাঁহাকে অলৌকিক শক্তিশালী বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কাব্য যত পড়ি, তত আরও পড়িবার বাসনা জন্মে। তাঁহার কাব্য যখনই হাতে লই, তখনই আত্মহারা হই, শ্রদ্ধা এবং ভক্তিতে, তাঁহার উদ্দেশে মস্তক আপনিই নত হইয়া আইসে। তাঁহার রাম, তাঁহার সীতা, তাঁহার বাসন্তী, তাঁহার তমসা—সকলই দিব্য, সকলই অনুপম। ঐ সমুদয় চিত্র ত জীবনে কতবার দেখিলাম, কতবার উহার সৌন্দর্য্যানুভূতির প্রয়াস করিলাম, কৈ—মনের ত আশা মিটিল না। নয়নের ত তৃপ্তি হইল না। যত দেখি, উঁহাদের সৌন্দর্য্য যেন আরও বর্দ্ধিত হয়। আরও দেখিবার জন্য প্রাণ উন্মত্ত হয়। ঐ সকল অক্ষয় আলেখ্যে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার কাব্য—

দেখিলে জুড়ায় আখি,
ভাবিলে অন্তর সুখী,
নিখিল জগৎ করে সুখময় ধাম,
সুধাধারা ঢালে কাণে,
প্রাণে প্রাণ দিয়া টানে,
কি যেন মোহিনী মাখা'—অনুপম ঠাম।

তৃতীয় অধ্যায়।

উত্তর চরিত।

মহাকবি ভবভূতি, বীর-চরিত, মালতী-মাধব ও উত্তর-চরিত, এই তিনখানি নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু সুবিখ্যাত সংগ্রহকার শার্ঙ্গধর, তৎ-কৃত পদ্ধতি-নামক-গ্রন্থে, ভবভূতির রচিত বলিয়া যে একটি শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা, এবং ভবভূতির ও ভাগবতের বিজ্ঞ টীকাকার দাক্ষিণাত্য-বাসী পণ্ডিত বীররাঘব এবং গোবর্দ্ধনের আর্য্যা সপ্তশতীর টীকাকার অনন্ত পণ্ডিত, ভবভূতির প্রকৃত নাম যে শ্রীকণ্ঠ ছিল, এই মত প্রতিপন্ন করিবার কালে, তদ্বিরচিত যে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা—আলোচনা করিলে মনে হয়, আমাদের মহাকবি হয়ত আরও দুই একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে অদ্যাপিও তৎতদ্ গ্রন্থের কোনরূপ নামগন্ধ পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, তৎকৃত নাটকত্রয়ের মধ্যে, উত্তর-রাম-চরিতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অথবা কেবল ভবভূতির কেন,—করুণরসে উত্তর-চরিত যাবতীয় সংস্কৃত নাটকেরই যে শিরোদেশবর্ত্তী, ইহা অবিসংবাদে বলা যাইতে পারে। সুতরাং আপাততঃ তদীয় উত্তর-চরিতের আলোচনাই কর্ত্তব্য। পরে, প্রসঙ্গতঃ, অন্য নাটকদ্বয়েরও পর্য্যালোচনা করা যাইবে।

'উত্তর-চরিত রামের রাজ্যাভিষেকের উত্তরকালীন বৃত্তান্ত অবলম্বন-পূর্ব্বক রচিত। রাম-চরিতের এই অংশ বাল্মীকি-

রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে নিবদ্ধ আছে। কিন্তু, উত্তর-চরিতে, অশ্বমেধীয় অশ্ব-নিরোধ উপলক্ষে, অশ্বরক্ষক রামসৈন্যের সহিত লবের যে যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে, রামায়ণে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। এই বৃত্তান্ত পদ্ম-পুরাণ-পাতালখণ্ড-রামাশ্বমেধপ্রকরণ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। উত্তর-চরিত করুণরসাশ্রিত নাটক। এই নাটক কারুণ্য, মাধুর্য্য ও অর্থগাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। রচনা মধুর ও প্রগাঢ়। করুণরস-বিষয়ে, ভবভূতির উত্তর-চরিত সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য। এই নাটকের পাঠকালে, অনেক স্থলে, মোহিত হইতে ও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে হয়[১]।'

ভবভূতি একমাত্র রামচন্দ্রের চরিত্র উপজীব্য করিয়া বীর-রচিত ও উত্তর-চরিত—এই দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন কেন? এক মহাভারতের কৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করিয়া, কবিবর নবীনচন্দ্র যেমন রৈবতক কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস—এই কাব্যত্রয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ভবভূতির সেই প্রকার করিবার উদ্দেশ্য কি? ইহাই আমাদের প্রথমতঃ আলোচ্য।

রামায়ণের প্রথম ছয় কাণ্ডের বৃত্তান্ত অবলম্বনে, বীর-চরিত প্রণীত, আর উত্তরকাণ্ডের ঘটনাবলীর আশ্রয়ে উত্তর-চরিত বিরচিত। সহজ কথায় বলিতে গেলে, 'বীরচিত' উত্তর-চরিতের ভূমিকা। কিন্তু তাহা হইলেও উক্ত কাব্যদ্বয়ের পরস্পরে প্রভেদ

১—বিদ্যাসাগর

বিস্তর। বীর-চরিত, অপরিপক্ক লেখনীর মুখ-বিনিঃসৃত, আর উত্তর-চরিত পরিপক্ক হস্তের অনবদ্য আলেখ্য। বীরচরিত ভবভূতির কবিত্ব-বিকাশের প্রথম অরুণ রেখা, আর উত্তর-চরিত তদীয় উদার হৃদয়ের, ভূয়োদর্শী হৃদয়ের অবাধকল্পনাতরঙ্গে আনর্ত্তিত অম্লান শতদল।

বীরচরিতে, তিনি রামচন্দ্রকে যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, রামায়ণের রামও সেই ভাবে চিত্রিত। অথবা সেই ভাবে কেন, ততোধিক ভাব-গরিমায় বাল্মীকির রাম সম্পন্ন। সুতরাং বাল্মীকির চিত্রের সহিত তুলনায় সমালোচিত হইবার অবসর ঘটিয়াছে। আদি কবি বাল্মীকির চিত্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিদর্ভের নবীন কবির চিত্র যে কতদূর সমর্থ, ইহা ভবভূতি, প্রথম সময়ে, হয়তঃ তত অনুধাবন করেন নাই। জীবনের প্রথম অভ্যুদয়ের সময়ে, হৃদয়ে কত উচ্চাভিলাষ জন্মে, কত আশার ঐন্দ্রজালিক আলোকে, ভবিষ্যৎকে দীপ্তিময় করিয়া প্রদর্শন করে, বিশ্বকুহকিনী আশা, মানবহৃদয়ে কত 'নূতন করিয়া গড়িতে চায়।' জীবনের সেই ভাস্বর পূর্ব্বাহ্লে, মানুষ আপনার সামর্থ্যের পরিমাণ করিতে চায় না, বা বোধ হয় পারেও না। বিশেষতঃ যাঁহারা বিশ্বপতির অপার অনুগ্রহের পাত্র, অলৌকিক কল্পনা-সৌরভে বিধাতা যাঁহাদিগের জীবনের প্রারম্ভভাগ সুরভিত করিয়াছেন, তাঁহাদের ত আর কথাই নাই। তাঁহাদের আত্ম-শক্তির উদ্যম এত প্রবল, কল্পনার প্রগল্‌ভতা এত অধিক যে, বিশ্বের কোন কার্য্যই তাঁহাদের সমক্ষে দুষ্কর

বলিয়া অনুমিত হয় না। এবম্ভূত সময়ে মহাকবি ভবভূতি বীরচরিত লিখিয়াছিলেন, রত্নাকরের রত্নরাশির সম্মুখে আপনার কতিপয় পরিমিত মণিমাণিক্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাই, বীরচরিত নানাবিধ গুণসম্পন্ন হইয়াও বাল্মীকির রামায়ণরসনিমগ্ন ভারতবর্ষে, আশানুরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। বয়োবৃদ্ধির সহিত, ভবভূতি এ রহস্য বিশেষ ভাবে বুঝিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বীরচরিতের রামচন্দ্র যে উপাদানে গঠিত, সহস্রকল্পে উত্তম হইলেও তাহাকে সর্ব্বোত্তম আদর্শ বলা যাইতে পারে না। বীরচরিতের রামের চরণস্পর্শে শতসহস্র শিলাখণ্ড মানুষী হইলেও, সে রাম মানব, দেবতা নহেন। রত্নাকরের নানারত্নবিমণ্ডিত জানকীর পতি যে রাম, তিনি মানুষ নহেন, মানুষবেশী দেবতা। সুতরাং আদর্শ নরনারীর চিত্র প্রদর্শন করিতে হইলে, বীরচরিতের রামজানকীতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে, বাল্মীকি যে পথে যাত্রা করিয়াছেন, সেই পথের সমান্তরালে গমন করিলে আশানুযায়িনী প্রতিপত্তির সম্ভাবনা অতি অল্প। বাল্মীকির সংগৃহীত পাথেয় সম্বল করিয়া ভিন্নপথে প্রস্থান করিতে হইবে। অন্যথা সিদ্ধি সুদূরপরাহত। এইজন্যই তিনি উত্তর-চরিতের প্রারম্ভেই বাল্মীকিকে প্রণাম করিয়া দূরে সরিয়া গিয়াছেন। কবিগুরুর সহিত প্রতিযোগিতায় যান্ নাই। বীরচরিত-বিরচনের পরই তাঁহার এই উদ্বোধ হইয়াছিল। তিনি অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন

ছিলেন। দুর্লভ কবিযশঃ-কিরীট তাঁহার পক্ষে একান্ত সুলভ ছিল। তিনি একেবারে অন্যপথে—নূতন পথে যাত্রা করিলেন। বোধ হয়, সংস্কৃত নাটকবিষয়ে, ভবভূতির পূর্ব্বে এক কালিদাস ব্যতীত, আর কেহ তাদৃশ পথের পথিক হয়েন নাই। তিনি পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বিবরণ দূরে রাখিয়া, বাল্মীকিকে দূরে রাখিয়া, মালতীমাধবের সূত্রপাত করিলেন। বাল্মীকির মধ্যাহ্ন সূর্য্যবৎ ভাস্বর রামচরিতের নিকট ভবভূতির বীরচরিতের খদ্যোত-মূর্ত্তি রাম, সামাজিকদিগের নয়নে তত্দূর প্রভাময়রূপে অনুমিত না হওয়ায়, ভবভূতিকে কথঞ্চিৎ অপ্রতিভও হইতে হইয়াছিল। বীরচরিতের অনেক স্থলে কবিত্বের নানাবিধ লীলাতরঙ্গ পরিদৃষ্ট হইলেও, কালিদাসের কবিত্ব-প্লাবিত ভারতে সে তরঙ্গমালা ক্ষুদ্র বীচিমালায় পরিণত হইয়াছিল। ভবভূতি ইচ্ছা করিলেই, নাটক না লিখিয়া, বীরচরিতের বৃত্তান্তে একখানি সুন্দর কবিতা-গ্রন্থ অবাধে লিখিতে পারিতেন, কিন্তু আদি কবি বাল্মীকির ছন্দোবদ্ধ রামায়ণের সম্মুখে, পুনরায় ছন্দোবন্ধে রামচরিত-বর্ণনের প্রয়াস, কবিবর বোধ হয় সমীচীন মনে করেন নাই। তাই,ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থ লিখিবার বাসনা হৃদয়ে সংযত রাখিয়া, নাটকাকারে রামচরিত-বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যত চেষ্টাই করুন না কেন, তাঁহার প্রণীত বীরচরিত প্রভৃতি নামতঃ দৃশ্যকাব্য হইলেও, বস্তুতঃ শ্রব্য-কাব্যবৎ প্রতিভাত হয়। তাই আবার বলি, ভবভূতির নাটকাবলীর অভিনয় দর্শন অপেক্ষা, পাঠে অধিকতর আনন্দ, অধিকতর প্রীতি জন্মে।

বীরচরিতের পর, তিনি, মালতীমাধব প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহার উত্তর-চরিত, বীরচরিতের অব্যবহিত পরবর্ত্তী, মালতীমাধব তাঁহার তৃতীয় গ্রন্থ। তাঁহাদের এই কথা, তত বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু, যাঁহার মানসোদ্যানে উত্তর-চরিতের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, অমল প্রসূন প্রস্ফুটিত হইয়াছে, যিনি একবার উত্তর-চরিতের অনুপম আলেখ্য চিত্রিত করিয়া, আত্মশক্তির, তথা স্বীয় অবাধ—কল্পনার অপূর্ব্ব প্রসার প্রদর্শন করিয়াছেন,—তিনি, তাদৃশী কল্পনার অধীশ্বর হইয়াও যে, মালতীমাধব বিরচন করিবেন, ইহা বুঝিতে পারি না। যদি মালতীমাধব কবিত্ব-সম্পদে উত্তর-চরিত অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইত, তবে ইহা স্বীকার করিতে কোনই আপত্তি ছিল না। কিন্তু, সহৃদয় পাঠক, অতি সহজেই বুঝিবেন যে, মালতীমাধব তৎপরবর্ত্তী অন্যান্য কবিগণের অনেক নাটক হইতে সর্ব্বতোভাবে উত্তম হইলেও, উত্তর-চরিত অপেক্ষা কোন অংশেই শ্রেয়ান্ নহে। মনে হয়, ভবভূতি কর্ত্তৃক প্রথমে বীরচরিত, পরে মালতীমাধব, তার পর উত্তর-চরিত বিরচিত। যখন তিনি দেখিলেন যে, বীরচরিতের ন্যায়, মালতীমাধবেও তদীয় নিষ্করুণ সামাজিকবৃন্দের মন গলিল না, তখন অক্লান্ত-প্রতিভ মহাকবি আবার সেই পরিত্যক্ত বর্ত্মে যাত্রা করিলেন।

সৎকাব্য প্রণয়ন দ্বারা সমাজশিক্ষা ও লোকশিক্ষা দেওয়াই প্রাচীন কবিগণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সেই সাধু উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা যাঁহারা কাব্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহারাই

অমর হইয়াছেন। কি পূর্ব্বে, কি অধুনা, ঐ সাধু উদ্দেশ্যে উদাসীন থাকিয়া, মাত্র আত্মতৃপ্তির জন্য বা আপনার কবিত্ব-কণ্ডূয়ন কথঞ্চিৎ উপশমিত করিবার জন্য, যাঁহারা কল্পনার আনন্দ-কাননে, সাহিত্যের মনোহর মন্দিরে, ধর্ম্মের নামে ভণ্ড সন্ন্যাসীর ন্যায়, কবিত্বের ছলে ব্যভিচার করেন, তাঁহাদের সেই সকল সদুদ্দেশ্যবিহীন গ্রন্থ, কর্ণধারবিহীন তরণীর ন্যায়, অচিরেই লোকনয়নের অতীত হয়, কালসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল গর্ভে ঝটিতি নিমগ্ন হয়। যাহার উদ্দেশ্য সাধু, তাহাই স্থায়ী; যাহা তাহার বিপরীত, তাহা ক্ষণভঙ্গুর। দক্ষ অশ্বারোহী যেমন, বিপথগামী অশ্বকে, বল্গা-কর্ষণে, নিমেষমধ্যে অভিপ্রেত মার্গে পরিচালিত করে, তদ্রূপ, মহাকবি ভবভূতিও, তাঁহার বৈদ্যুতিক-শক্তি-সম্পন্নবৎ অবাধ কল্পনাকে, আপনার লোকহিতৈষণার অনু-চারিণী করিয়া লইলেন। সমাজশিক্ষার অনুকূল করিয়া, জগতে সর্ব্বোত্তম আদর্শপুরুষ সৃষ্টি করিলেন। রত্নাকরের রত্নভাণ্ডারে তিনি যখন ভ্রমণ করেন, তখন যে রত্নের অপ্রতিম প্রভায়, তাঁহাকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল, যৌবনে একবার যে অনাবিদ্ধ রত্নকে, তদীয় কল্পনারূপী সুতীক্ষ্ণ শানযন্ত্রের সাহায্যেও মনের মত করিয়া উল্লিখিত করিতে পারেন নাই, সেই অনর্ঘ রত্নকে আবার নানাবিধ কারুকার্য্যে সজ্জীকৃত করিতে বসিলেন। তিনি এতদিন পরে, বুঝিতে পারিলেন যে, এইবার সময় আসিয়াছে। রাম-চরিত অনুবর্ণিত করিবার প্রকৃত অবসর আসিয়াছে। যাহা যৌবনে থাকে, তাহা প্রৌঢ়কালে থাকিতে পারে। কিন্তু, মানব প্রৌঢ়কালে

যে সম্পদে সম্পন্ন হয়, যৌবনে তাহার সম্ভাবনা কোথায় ? তাই, প্রৌঢ় কবি ভবভূতি বুঝিলেন যে, যৌবনে যাহা সুচারু করিতে পারিয়াছি, প্রৌঢ়ে তাহা নিশ্চয়ই সুচারুতম করিতে পারিব। তাই তিনি যৌবনের বীর-চরিতে উপেক্ষা করিয়া প্রৌঢ়বয়সে উত্তর চরিত প্রণয়ন করিলেন। সংসারে, অনেক আঘাত পাইয়া, অনেক বিড়ম্বিত হইয়া, অনলে অনেক পরীক্ষা দিয়া, তবে মানুষ হইতে হয়। একপদে মানবত্ব জন্মে না, জন্মিতে পারেও না। বীরচরিত এবং মালতীমাধবের সময়ে ভবভূতিকে অনেক প্রকার লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। সেই সমুদয় লাঞ্ছনাতেই, তিনি উত্তর চরিত লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাঁহারা প্রকৃত পুরুষ, বাধা বিপত্তি তাঁহাদিগকে পুরুষশ্রেষ্ঠ করিয়া তুলে। আর যাঁহারা পুরুষ হইয়াও অবলাধর্ম্মাক্রান্ত, বাধা বিপত্তি প্রাপ্ত হইলে, তাঁহারা বিচ্ছিন্ন কুহেলিকার ন্যায় কোথায় মিলাইয়া যান। পুরুষশ্রেষ্ঠ ভবভূতি, কবিত্ব-কাননে ভ্রমণ করিতে যাইয়া, যেমন যেমন বাধা পাইতে লাগিলেন, তাঁহার শক্তি, তাঁহার উদ্যম, তেমন তেমনই শতগুণ বাড়িতে লাগিল। পাশ্চাত্য কবি স্যর ওয়ালটার স্কট্ যেমন, প্রথমতঃ নানাবিধ পদ্যময় প্রবন্ধ বিরচন করিয়া, তাহাতে আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই—ভাবিয়াই, তৎক্ষণাৎ নবীন উদ্যমে, লেখনী চালনা পূর্ব্বক, সুন্দর সুন্দর গদ্য কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, (সে সমুদয় গদ্য-কাব্য, অদ্যাপিও, পাশ্চাত্য সাহিত্য মণ্ডপে স্বর্ণসিংহাসনের ন্যায় শোভা পাইতেছে,) তদ্রূপ, ভবভূতিও বীরচরিতের উদ্যমে যেমন

স্বদেশবাসিগণ কর্ত্তৃক বাধিত হইলেন, অমনি, বীরচরিত অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কাব্য মালতীমাধব প্রণয়ন করিলেন। আবার মালতীমাধবের উদ্যমে প্রতিহত হইবামাত্রই উৎকৃষ্টতম উত্তর-চরিত নির্ম্মাণ করিয়া, তিনি স্বয়ং অবিনশ্বর, আকল্পস্থায়ী, অনন্যসুলভ যশোরত্নে বিমণ্ডিত হইলেন এবং তাঁহার জননী ভারতভূমিকেও চিরদীপ্তিময়ী কীর্ত্তিমেখলায় অলঙ্কৃত করিলেন।

তাঁহার উত্তর-চরিতে চিত্রিত জনস্থানের আলেখ্যমালায় যখন দৃষ্টিপাত করি, তাঁহার ত্বরিতচরণা কল্পনার সঙ্গে যখন, চিত্রকুঞ্জবান্ দণ্ডকারণ্যের প্রতিবীথিকায় বিচরণ করি, মতঙ্গা-শ্রমের সম্মুখীন হই, এবং সেই নয়নতর্পণ পম্পাসরোবর-তীরে সিদ্ধশবরী শ্রমণার দিকে চাহিয়া থাকি, যখন, তাঁহার বন-বিলাসিনী কল্পনা, আমাদিগকে, কুলকুল-ভাষিণী মন্থরগামিনী কালিন্দী তটিনীর স্বপ্নময় তটে লইয়া গিয়া, স্নিগ্ধশ্যামল বটবৃক্ষের প্রচ্ছায়শীতল অঞ্চলে বসাইয়া, ধীরে ধীরে 'ঘুম পাড়াইয়া' দেয়, আবার নিদ্রাভঙ্গের পর কুসুমসুরভি মাল্যবান্ পর্ব্বতের, সেই নীলস্নিগ্ধ, নবজলদ-মালাবিমণ্ডিত, চিরনূতন শিখরশ্রেণীর শান্ত মূর্ত্তি নয়নের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া, হৃদয়ে নিদ্রাজনিত জড়তার পরিবর্ত্তে এক নূতন জড়তার আনয়ন করে,—তাঁহার কৃত প্রকৃতির প্রাঞ্জল বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে, যখন স্বভাবের ভাবে আপন ভাব মিশাইয়া দিই, তাঁহার চিত্রিত, অন্য চিত্রকরের অননুকরণীয়, গিরি-নদী-বন-উপবন-প্রস্রবণের ছবি দেখিতে দেখিতে যখন, প্রাণ মর্ত্তভূমি ছাড়িয়া, এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব আনন্দ-

ময় রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকে, তখন নিজেই নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাই। কবিসৃষ্টির ইহা চরম উৎকর্ষ। পাঠককে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে, যে কবি কল্পনার মোহন মন্ত্রে, লোক হইতে লোকান্তরে লইয়া যাইতে পারেন, স্বীয় সঙ্কল্পিত পথে পরিচালিত করিতে পারেন, সেই কবিই যথার্থ সৃষ্টিকর্ত্তা। বিধাতার সৃষ্টি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কবির সৃষ্টি অতীন্দ্রিয়। বিধাতার সৃষ্টি যতই প্রকাণ্ড হউক না কেন, তাহার সীমা বা ইয়ত্তা কল্পনা করা যাইতে পারে, কিন্তু কবিসৃষ্টির সীমা নাই, কবিসৃষ্টির ইয়ত্তা নাই।

মহাকবি ভবভূতি, রামের বাল্য এবং যৌবনের কিয়দংশের ঘটনাবলীর অবলম্বনে বীররচিত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাই সেই বর্ণিত অংশ পরিত্যাগ করিয়া, এইক্ষণে, রামজীবনের উত্তর ভাগ লইয়া এই 'উত্তর-চরিত' প্রস্তুত করিলেন। তবে, বীরচরিতের 'বীর' রামচন্দ্রকে, উত্তর-চরিতে, ধীর, শমগুণ-প্রধান, শান্তোজ্জ্বল মূর্ত্তিসম্পন্ন করিবার জন্য, আত্মত্যাগের অনুপম আদর্শ করিবার জন্য, সহিষ্ণুতার অপ্রতিম আধার করিবার জন্য, মহাকবিকে অনেক প্রয়াস করিতে হইয়াছে। আদিকবি বাল্মীকির রামকে উত্তরচরিতের কবি স্বকীয় অনুপম শিল্পচাতুর্য্যপূর্ণ, সর্ব্বজনমনোমোহন, নবীন ভূষণে বিভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার আত্মসত্তায় অগাধ বিশ্বাস ছিল, বাগ্‌দেবী যে যথার্থই তাঁহার কণ্ঠবিলাসিনী, ইহা তিনি সিদ্ধপুরুষের ন্যায় জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার পাথেয় অনন্ত ছিল, তাই তিনি, সাহস পূর্ব্বক মহর্ষিক্ষুণ্ণ পথ পরিহার করিয়া, নূতন পথে যাত্রা করিতে

পারিয়াছেন। অন্য কেহ এরূপ করিলে, তাঁহাকে হয় দুঃসাহসী না হয় হঠকারী বলিতাম।

চতুর্থ অধ্যায়।

চিত্রদর্শনের আবশ্যকতা।

মহাকবি ভবভূতি, রত্নাকরের অক্ষয় রত্ন রামায়ণের রামের আদর্শে বীরচরিতের রাম নির্ম্মাণ করিয়াছেন। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি অনুপম কাব্যনিচয় সর্ব্বলোকমোহনের জন্য প্রণীত, এবং সমাজগঠন ও সমাজশিক্ষার অনুকূল করিয়া নির্ম্মিত। কোন নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নিমিত্ত ঐ সকল মনোহর গ্রন্থ রচিত হয় নাই। ঋষিগণ লোকহিতার্থে মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া, লোকের তথা সমাজের শিক্ষার নিমিত্ত বিরাট্ মূর্ত্তিসমূহ সৃষ্টি করিতেন, অমন পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তির সৃষ্টিবিধান অন্যের পক্ষে,—অনার্য ব্যক্তির পক্ষে—অসম্ভব। ঋষিগণের রজোমুক্ত হৃদয়ে যাহা লোকহিতানুকূল বলিয়া বোধ হইত, তাহাই তাঁহারা প্রচারিত করিতেন। পরের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাদিগকে ব্যথিত হৃদয়ে গ্রন্থবিরচন করিতে হইত না। তাই ঋষিদিগের কাহাকেও কালিদাস বা ভবভূতির ন্যায়, "আপরিতোষাদ্ বিদুষাং" কিংবা "যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং'—বলিয়া সামাজিকের

হৃদয়াকর্ষণ করিতে হয় নাই। তাঁহাদের প্রণীত কাব্য পাঠ্য, গেয়, এবং শ্রব্য ছিল, অভিনেয় বা দৃশ্য ছিল না। সুতরাং ঐ সকল ঋষিরচনাতে যে সমুদয় চরিত্র যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সমগ্র ভারতবর্ষের নানাবিধ ভিন্নরুচি লোক এবং সমাজশিক্ষার জন্য, ঐ সকল গ্রন্থে যে সকল চিত্র যে ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, কোন নির্দ্দিষ্ট দেশের নির্দ্দিষ্ট সমাজের জন্য প্রণীত কাব্যে, ঐ সকল চিত্র সেই ভাবে অঙ্কিত হইলে, তাহাতে রসবিকাশের আনুকূল্য হইবে কেন? যাহা বিশাল ভারতের জন্য নির্ম্মিত, তাহা, এবং যাহা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কোন দেশ-বিশেষের জন্য নির্ম্মিত, তাহা—এই উভয়ের রূপ বা ধর্ম্ম একই প্রকারের হইলে চলিবে কেন?—তুমি যখন সরযূর তীরে বসিবে, বিগতসম্পৎ সরযূর ধূসরকান্তি নিরীক্ষণ করিবে, তখন তোমার মনে যে ভাবের উদয় হইবে, তটশালিনী সুন্দর যমুনার তীরে সে ভাব তোমার হৃদয়ে উদিত হইবে কেন? সেই শ্যামের বাঁশরীর রবে যমুনার জল যে উজান বহিত, সেই যে ব্রজবালিকাগণ নীল সলিলা কালিন্দীর বীচিবিক্ষোভিত হৃদয়ে তাহাদের গৌর দেহ; হেমকমলবৎ ভাসাইয়া দিত,—এ সমুদয় অতীত চিত্র, সরযূ-সৈকতাসীন তোমার হৃদয়ে জাগরূক হয় কি? সরযূর তীরে উপস্থিত হওয়া মাত্রেই, তোমার স্মৃতিপথে সেই রাম, সেই সীতা, সেই অযোধ্যা প্রভৃতির চিন্তা উদিত হয়, তোমার চিন্তাস্তিমিত হৃদয়ে আনন্দের পরিবর্ত্তে কেমন একটা অবসাদ উপস্থিত হয়। সেই প্রকার রামের কথা মনে পড়িলেই, সেই সঙ্গে

আদিকবি বাল্মীকির সেই নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের জীবনের ঘটনালহরী মানসমুকুরে আসিয়া উদিত হয়। রামায়ণের প্রভাবে, রামায়ণের মাধুর্য্যে, ভারতবর্ষের কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, সকলেই মোহিত। সুতরাং, রামনামে, তাঁহাদের হৃদয়ে, মহর্ষি-গঠিত সেই রামমূর্ত্তি, প্রভাত-গগনে ঊষার হাসির ন্যায় ভাসিতে থাকে। এই বাল্মীকির রামের আদর্শে, ভবভূতির বীরচরিতের রাম গঠিত। বিশাল ভারতের, বিজ্ঞাবিজ্ঞনির্ব্বিশেষে অনন্ত জনবাহিনীর মনস্তুষ্টির জন্য বাল্মীকি যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, ক্ষুদ্র বিদর্ভের কতিপয় অভিমানী সামাজিকের জন্য, সেই চিত্রের অনুকরণে, ভবভূতি বীরচরিতের রাম নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সুতরাং তাহাতে তৃপ্তি জন্মিবে কেন ? বিশেষতঃ, রামের বাল্য-জীবনের ঘটনা হইতে ক্রমে রাবণবধ পূর্ব্বক অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত বীরচরিতে বর্ণিত, আর জানকীকে উদ্ধার করিয়া, অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিবার পরের ঘটনাবলী লইয়া উত্তর-চরিত বিরচিত। সুতরাং উত্তর-চরিতের দর্শকদিগকে, প্রতিপদেই রামের বাল্য-জীবনের ঘটনাবলী মনে রাখিতে হইবে, অথবা রাখিতে হইবে বলি কেন ? বর্ষীয়ান্ রামের চরিতদর্শনকালে, নবীন রামের চরিতাবলী আপনিই আসিয়া মনে উদিত হইবে। সুতরাং সেই বীরচরিতের রামের কথা, নিয়তই তাঁহাদের মনে পড়িবে। কবির সেই অপরিপক্ক তূলিকা চিত্রিত, বীরচরিতের রাম আসিয়া, পরিপক্ককরের চিত্রিত উত্তর-চরিতের রামের পার্শ্বে উপস্থিত হইবেন। সেই ঈষদসম্পূর্ণ তরুণ রামমূর্ত্তি, সর্ব্বাঙ্গ-

সুন্দর প্রবীণ রামমূর্ত্তির সম্মুখে প্রতিভাসিত হইবে,—ইহা নিপুণ-চূড়ামণি ভবভূতির অভিপ্রেত নহে। যে আদর্শ হইবে, তাহাতে কোন প্রকার দোষ মার্জ্জনীয় নহে। বীরচরিতের রামের কোন কোন স্থানে উৎকর্ষের অভাব ঘটিয়াছে। তাই, সে রামকে কবি, দর্শকদিগকে দেখিতে দিতে চান্ না। উত্তর-চরিতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রামচরিতের ত্রিসীমাতেও বীরচরিতের রামকে আনিতে চান্ না। তিনি এমন নিখুঁত রাম দেখাইবেন, যাহা রামায়ণে নাই, যাহা পৃথিবীতে নাই, যাহা কেহ কখন কল্পনার চক্ষেও দেখিতে পায় না। এই জন্যই কবিতা-রাজ্যের বিশ্বকর্ম্মা ভবভূতি, উত্তর-চরিতের প্রথম অঙ্কেই, উত্তরকাণ্ডের ঘটনাবলী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার পূর্ব্বেই, সামাজিকদিগকে চিত্রদর্শনচ্ছলে, রামের সেই শৈশবের মধুর 'মাতৃভিশ্চিন্ত্যমান' অবস্থা হইতে উত্তর জীবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত, চকিতে দেখাইয়া দিলেন। বীরচরিতে রামসীতার জীবনের যে যে অংশ বর্ণিত হইয়াছে, সেই সেই অংশ চিত্রদর্শনে পুনঃ প্রদর্শিত করিলেন। বীরচরিতের রামসীতার মূর্ত্তির যেখানে যে টুকু অসম্পূর্ণতা ছিল, এই চিত্রদর্শনের চিত্রিত রামসীতার সংস্কৃত মূর্ত্তিতে তাহা সংশোধন করিয়া লইলেন। পরন্তু তদপেক্ষা সহস্র-গুণ সৌভাগ্য-সম্পদে রামসীতার বাল্যজীবন সুসম্পন্ন করিলেন। রামসীতা সম্বন্ধে সামাজিকদিগের মনে পাষাণের রেখার ন্যায় একটি রেখা অঙ্কিত করিয়া দিলেন। চিত্রদর্শনের এই সুন্দর রামসীতার বাল্য কিশোর এবং যৌবনের সুন্দরতম চিত্র

দেখিতে দেখিতে, দর্শকগণ বীরচরিতের সেই রামসীতাকে ভুলিয়া গেলেন। এই ভাবে কবি, বীরচরিতের রামের সহিত উত্তর-চরিতের রামের যে যে অংশে বৈষম্য অপরিহার্য্য হইত, তাহার প্রতিপ্রসব করিলেন। বীরচরিতের পার্থিব রামকে চিত্রদর্শনের অপার্থিব রামের দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিলেন। কি অসাধারণ চাতুর্য্য! কি অনুপম নৈপুণ্য! মহাকবি ভবভূতির এই অসীম ক্ষমতার বিষয় যখন চিন্তা করি, তখন মল্লিনাথের সুরে বলিতে ইচ্ছা করে "বয়ঞ্চ কৃতিনস্তৎ-সূক্তিসংসেবনাৎ"—

"রামসীতার অলৌকিক, অসীম, প্রগাঢ় প্রণয় বর্ণন করাও" চিত্রদর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য। "এই প্রণয়ের স্বরূপ অনুভব করিতে না পারিলে, সীতা-নির্ব্বাসন যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। সীতার নির্ব্বাসন সামান্য স্ত্রী-বিয়োগ নহে। স্ত্রী-বিসর্জ্জনমাত্রই ক্লেশকর, মর্ম্মভেদী। যে কেহ আপন স্ত্রীকে বিসর্জ্জন করে, তাহারই হৃদয়োদ্ভেদ হয়। যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবনসুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসার-সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, বার্দ্ধক্যে যে জীবনের একমাত্র অবলম্বন,—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে যে দাসী, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্য্যে যে মন্ত্রী, ক্রীড়ায় যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্ম্মে যে গুরু;—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা, স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ঔষধ, অর্জ্জনে যে

লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশঃ, বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা, ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আর যে ভালবাসে, পত্নীবিসর্জ্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা! আবার যে রামের ন্যায় ভালবাসে। যে পত্নীর স্পর্শমাত্রে অস্থিরচিত্ত," তন্দ্রালস, তাদৃশ পত্নীময় জীবিত ব্যক্তির পক্ষে, পত্নীবিসর্জ্জনে "কি কষ্ট, কি সর্ব্বনাশ, কি জীবন-সর্ব্বস্ব-ধ্বংসাধিক যন্ত্রণা! তৃতীয়াঙ্কে সেই যন্ত্রণার উপযুক্ত চিত্র প্রণয়নের উদ্যোগেই প্রথমাঙ্কে কবি এই প্রণয় চিত্রিত করিয়াছেন। এই প্রণয় সর্ব্বপ্রফুল্লকর মধ্যাহ্ন সূর্য্য,—সেই বিরহ যন্ত্রণা ইহার ভাবী করাল কাদম্বিনী, যদি সে মেঘের কালিমা অনুভব করিতে চাও, তবে আগে এই সূর্য্যের প্রখরতা দেখ। যদি সেই অনন্তবিস্তৃত অন্ধকারময় দুঃখসাগরের ভীষণ স্বরূপ অনুভব করিতে চাও, তবে এই সুন্দর উপকূল —প্রাসাদশ্রেণী-সমুজ্জ্বল, ফলপুষ্পপরিশোভিত বৃক্ষবাটিকা-পরিমণ্ডিত, এই সর্ব্বসুখময় উপকূল দেখ। এই উপকূলেশ্বরী সীতাকে, রামচন্দ্র নিদ্রিতাবস্থায় ঐ অতলস্পর্শী অন্ধকার-সাগরে ডুবাইলেন[১]।"

মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশে অতি সংক্ষেপে চিত্রিত একখানি আলেখ্যের পরিবর্দ্ধিত-সংস্করণ-নির্ম্মাণও, চিত্রদর্শনের বোধ হয় আর একটি উদ্দেশ্য।

১—বঙ্গদর্শন

কালিদাস, রঘুবংশের চতুর্দ্দশ সর্গের পঞ্চবিংশ শ্লোকে বলিয়াছেন—

তয়োর্যথা-প্রার্থিতমিন্দ্রিয়ার্থান্
আসেদুষোঃ সদ্মসু চিত্রবৎসু।
প্রাপ্তানি দুঃখান্যপি দণ্ডকেষু
সংচিন্ত্যমানানি সুখান্যভূবন্॥

অর্থাৎ রামসীতার প্রাসাদে তাঁহাদের অতীত জীবনের নানারূপ সুন্দর সুন্দর ছবি খাটানো ছিল। তাঁহারা সেই সকল ছবি দেখিয়া নানাবিধ সুখভোগ করিতেছিলেন। তাঁহারা দণ্ডকারণ্যে যে সকল দুঃখ পাইয়াছিলেন, আজ সুখের দিনে,—মিলনের দিনে, দুইজনে একপ্রাণ হইয়া, সেই সকল ভাবিতেছেন, আর অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন।

কবিতারূপিণী চিত্রশালিকার অমর ভাস্কর, সৌন্দর্য্যের কবি কালিদাসের এই উদার রমণীয় চিত্রে, ভাবের কবি ভবভূতি একান্ত বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই চিত্রে কালিদাস যে গভীর ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই ভাবরসে ভবভূতি একেবারে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। এই চিত্র দর্শন করিতে করিতে, ভাবুক ভব-ভূতি বুঝিয়াছিলেন যে, সাধারণকে এইরূপ অনুপম চিত্রের প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞাত করিতে হইলে, উহা আরও একটু প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক। অত সংক্ষেপে অমন সুন্দর ভাব প্রকাশ করিলে, হয়ত, তাহা নিপুণ রসজ্ঞ পাঠকের প্রীতিজনক হইতে পারে, কিন্তু সাধারণের তাহাতে তাদৃশী তৃপ্তি জন্মিবে না। তিনি আরও

বুঝিয়াছিলেন যে, কেবল সামান্য একটু ছবি দেখায়, বা ইচ্ছামত অবসরক্রমে কদাচিৎ দণ্ডকারণ্যের তৎতদ্ ঘটনাবলীর একটু চিন্তা করায় পূর্ণ রসাভিব্যক্তি হইবে না। আমি এমন আলেখ্য অঙ্কন করিব, যাহাতে দণ্ডকারণ্যের সমস্ত বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে চিত্রিত থাকিবে। কালিদাস, যে দণ্ডকের কথা, রামসীতাকে অবসরক্রমে, মাত্র একটু ভাবাইয়া সুখী করিয়াছেন, আমি সেই দণ্ডকের কথা, সেই দণ্ডকের ঘটনাবলী—রামসীতার সেই নির্জ্জন বনবাসের ঘটনা-লহরী আলেখ্যে অঙ্কিত করিয়া, রামসীতার সুখ-দুঃখের একমাত্র অবলম্বন, দণ্ডকের প্রধান সহায়, সেই লক্ষ্মণকে দিয়া, সেই আলেখ্য, রামসীতাকে দেখাইব। দেখি, কালিদাসের রামসীতা অধিক সুখী হয়েন, না আমার রামসীতা অধিক সুখী হয়েন। তাই চিত্রকর ভবভূতি, চিত্রসমূহের সহিত দণ্ড-কারণ্যের ঘটনাবলীর একটা ধারাবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া জগৎ মুগ্ধ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে,—জীবনের প্রাতঃকালে রামসীতা দণ্ডকারণ্যে যে অসহ্য দুঃখভোগ করিয়াছেন, সেই সীতাহরণ, সেই পরস্পরের বিরহ, 'পাতি পাতি' অন্বেষণ, সেই লঙ্কা-সমর, তারপর—তারপর, সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিপরীক্ষা,—দুঃখের দিনের সেই সব চিত্রাবলী,—আজ সুখের দিনে, রাম আজ অযোধ্যার রাজরাজেশ্বর, সীতা রাজরাজেশ্বরী, তাই এই সুখের দিনে, সেই সব দুঃখের দিনের চিত্রাবলী দুইজনে এক হইয়া দেখিতেছেন। সেই পুরাতন বেদনার ব্যাপার যতই দুইজনে এক-প্রাণ হইয়া ভাবিতেছেন, ততই উভয়ের মনে অতুল আনন্দের উদয়

হইতেছে। দুঃখের দিনের সেই ছবি, পরস্পরের জন্য পরস্পরের সেই আকুলতার ছবি দেখিয়া, এতদিন যাহা অনুভব করিয়া লইতেন, আজ তাহা চিত্রে দেখিয়া, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শতমুখ অনুরাগ সহস্রমুখ হইতেছে। দুইজনের হৃদয়ই দুইজনের ভাবে ডুবিয়া যাইতেছে। সীতাবিরহে মাল্যবান্ দর্শনে রামের সেই—

> বৎসৈতস্মাদ্ বিরম বিরমাতঃপরং ন ক্ষমোঽস্মি!
>
> প্রত্যাবৃত্তঃ পুনরপি স মে জানকী-বিপ্রযোগঃ ॥[১]

প্রভৃতি অসহ্য যাতনাময়ী উক্তি,—

রামসীতার জীবনের সুখের দিনের সাক্ষী প্রস্রবণ গিরি দর্শনে

সেই—

> "স্মরসি সুতনু! তস্মিন্ পর্ব্বতে লক্ষ্মণেন
>
> প্রতিবিহিত-সপর্য্যা-স্বস্থয়োস্তান্যহানি?
>
> স্মরসি সরসতীরাং তত্র গোদাবরীং বা
>
> স্মরসি চ তদুপান্তেষ্বাবয়োর্বর্ত্তনানি?"[২]

১—বৎস! তুমি ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না, মাল্যবানের উল্লেখে, আমার জানকীর বিরহ বুঝি আবার ফিরিয়া আসিল, মনে হইতেছে।

২—"প্রিয়ে! তোমার স্মরণ হয়, এইস্থানে কেমন সুখে ছিলাম। আমরা কুটীরে থাকিতাম; লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া আহারোপযোগী ফলমূল প্রভৃতির আহরণ করিতেন; গোদাবরী তীরে মৃদুমন্দ গমনে ভ্রমণ করিয়া আমরা

সেই—

অলস-লুলিত-মুগ্ধান্যধ্ব-সঞ্জাত-খেদাৎ
অশিথিল-পরিরম্ভৈর্দত্তসংবাহনানি,
পরিমৃদিত-মৃণালী–দুর্ব্বলান্যঙ্গকানি
ত্বমুরসি মম কৃত্বা যত্র নিদ্রামবাপ্তা ॥[১]

সেই—

কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিযোগাৎ
অবিরলিত-কপোলং জল্পতোরক্রমেণ।
অশিথিল-পরিরম্ভব্যাপৃতৈকৈক-দোষ্ণো
রবিদিত-গত-যামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ ॥[২]

সেই—

"বাষ্পান্তঃ-পরিপতনোদ্গমান্তরালে"[৩]—প্রফুল্ল কুবলয়-দর্শন ;—

প্রাহ্নে ও অপরাহ্নে শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের সেবন করিতাম। হায়, তেমন অবস্থায় থাকিয়াও কেমন সুখে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।" বিদ্যাসাগর।

১—বন্ধুরবর্ত্মে নিয়ত-পরিভ্রমণ-জনিত-খেদে, তোমার মনোহর শরীরযষ্টি একান্ত ক্লান্ত ও মুহুর্মুহু কম্পিত হইতেছিল, আমি নানা উপায়ে, ক্লান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, পরিশেষে সীতে! তুমি অতিশয় কাতর হইয়া, পরিমৃদিত মৃণালীর ন্যায় তোমার দুর্ব্বল দেহলতিকা আমার বক্ষে স্থাপন পূর্ব্বক, নিদ্রা গিয়াছিলে।

২—আমরা, পরস্পর প্রগাঢ়ভাবে, পরস্পরের দেহ আশ্রয় করিয়া থাকিতাম, তুমি স্বপ্নাবিষ্টার ন্যায়, গদ্‌গদকণ্ঠে ধীরে ধীরে কত-কি-কথা বলিতে, দেখিতে দেখিতে চক্ষের উপর রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত।

৩—"এক ধারা নির্গত ও অপর ধারা উদ্গত হইবার মধ্যে"। বিদ্যাসাগর।

সেই—

'অয়মুদ্‌গৃহীত-কমনীয়-কঙ্কনঃ

স্তব মূর্ত্তিমানিব মহোৎসবঃ করঃ ॥'[১]

—প্রভৃতি ঘটনাশ্রেণী একে একে, ধীরে ধীরে, রাম গর্ভ-ভরালসা সীতাকে, এক এক খানি চিত্র ধরিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন। সীতা বুঝিতেছেন, বুঝিয়া বুঝিয়া মজিতেছেন, রামের দিকে,—যিনি তাঁহার জন্য অত যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন, সেই প্রিয়ঙ্কর প্রিয়তমের দিকে এক এক বার চাহিতেছেন, আর নীরবে, মনে মনে নিজেকে ধন্য ভাবিতেছেন, নিজের নারী-জীবন সার্থক মনে করিতেছেন, সেই ধনুর্ভঙ্গ পণের শতমুখে প্রশংসা করিতেছেন। কি সুন্দর চিত্র! চিত্রকরাচার্য্য কালিদাসের একখানি ক্ষুদ্র আলেখ্যের যেন একটি সুরম্য পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ হইল। চিত্রদর্শনের বীজটি মাত্র কালিদাসের, আর সেই বীজে যে অনুপম পারিজাত তরু নির্ম্মিত হইল, তাহার পত্র-পুষ্প-পল্লব-প্রভৃতি সমস্তই ভবভূতির।

১—তোমার এই বিবাহকালীন কমনীয় কঙ্কন-শোভিত মূর্ত্তিমান্ মহোৎসবের ন্যায় করপল্লব।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রস্তাবনা।

উত্তর-চরিতের প্রস্তাবনার চমৎকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, তৎপরবর্ত্তী চিত্রদর্শনের অনুপম সৌন্দর্য্য বুঝিবার পক্ষে এবং ভবভূতিকেও উত্তমরূপে চিনিবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং প্রস্তাবনা সম্বন্ধে কতিপয় কথা বলা আবশ্যক।

সংস্কৃতে যত নাটক আছে, তাহার প্রত্যেক খানিরই প্রারম্ভ-বাক্যে দেখি, কবি, কোন বিশিষ্ট দেবদেবীকে প্রণাম করিয়া, প্রতিপাদ্য প্রবন্ধের সূচনা করিয়াছেন। কবি-কুলোত্তম কালিদাস, তাঁহার সমস্ত নাটকেরই প্রারম্ভকালে, দেবাদিদেব চন্দ্রশেখরকে প্রণামচ্ছলে স্তুতি করিয়াছেন। যাহাতে অভীপ্সিত প্রবন্ধের সমাপ্তি বিষয়ে কোনরূপ বাধাবিপত্তি না জন্মে, তজ্জন্য, বিপদ্-ভঞ্জন চির-মঙ্গলময় জগদীশ্বরের পাদ-বন্দনাপূর্ব্বক, কবিগণ, স্বকীয় গ্রন্থের সূচনা করিয়া থাকেন। ইহাই চিরাচরিত প্রথা। মহাকবি ভবভূতি, তদীয় প্রধান গ্রন্থ উত্তরচরিতের প্রারম্ভ-কালে, এই পুরাতনী প্রথার ভঙ্গ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম রচিত কাব্য বীরচরিতে এবং তৎপরবর্ত্তী কাব্য মালতীমাধবে, তিনি প্রাচীন রীতির অনুবর্ত্তন করিয়া, যদিও যথাক্রমে পরব্রহ্ম এবং মহাদেবকে স্তুতি করিয়াছেন, কিন্তু উত্তরচরিতে, কবিবর, দেবতাবন্দন পরি-

হার-পূর্ব্বক, বাল্মীকির চরণবন্দনা করিয়াছেন। কমলদলবাসিনী বীণাপাণি যাঁহার কণ্ঠে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, যাঁহাকে রামচরিত কীর্ত্তনের জন্য, অনুরোধ করিয়া বরপ্রদান করিয়াছিলেন, ভূতভবিষ্যৎ জ্ঞাত হইবার জন্য "প্রাতিভ চক্ষুঃ" দান করিয়াছিলেন, নিরপরাধ ক্রৌঞ্চমিথুনের সুখের স্বপ্ন, যখন নির্দ্দয় নিষাদ স্বহস্তে ভাঙ্গিতেছিল, তদ্দর্শনে, যাহাঁর অমৃতনিস্যন্দিনী ভাষা—"মা নিষাদ"—বলিয়া কান্দিয়া উঠিয়া,—সংস্কৃতে প্রথম ছন্দোবদ্ধ কবিতার প্রচার করিয়াছিল, এবং সেই জন্যই যিনি জগতে "আদিকবি" আখ্যালাভ করিয়াছিলেন,—পুণ্যশ্লোক রামসীতার চরিতানু-কীর্ত্তনের দ্বারা যিনি, সংস্কৃত ভাষাকে, জগতে, আকল্প বরণীয় করিয়া গিয়াছেন, মহাকবি ভবভূতি, প্রারম্ভকালে, সর্ব্বাগ্রে, সেই আদিকবি বাল্মীকিকে প্রণাম করিয়া, তাঁহারই চরণে, অমরত্বদায়িনী বাগ্দেবতাকে লাভ করিবার জন্য কৃতাঞ্জলি-পুটে প্রার্থনা করিয়াছেন। কবিগণ সরস্বতীর সেবক; তাঁহারা আমরণ দাঁরিদ্র্যের প্রবল নিপীড়নে নিষ্পেষিত হইয়াও, তাঁহাদের চিরশান্তিময়ী বাগ্বাদিনীর পরিবর্ত্তে, সম্পদ্বিধায়িনী চঞ্চলা কমলার কৃপা ভিক্ষা করেন না। পিপাসায় প্রাণ গতপ্রায় হইলেও যেমন, চাতক, জলদজল ব্যতিরেকে, অন্য জল পান করিতে চায় না,—তদ্রূপ, বাণীর সেবকগণও দারিদ্র্যানলে দগ্ধীভূত হইলেও,—সরস্বতীর চরণ-কমল পরিত্যাগ করিতে কদাচ বাসনা করেন না। মহাকবি ভবভূতিও তাই অন্য কোনরূপ

উদ্যেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া, অপর কোনও দেবতার পাদপূজা করেন নাই। তিনি রামায়ণের রামের প্রকৃষ্টমূর্ত্তি অঙ্কন করিতে যাইয়া, রামায়ণের কবি বাল্মীকিকেই অর্চ্চনা করিয়াছেন, এবং তাঁহারই নিকটে,—যে সরস্বতীর অনুকম্পায় দস্যু রত্নাকর কবিরত্নাকর, যথার্থই অনন্ত রত্নের আকব, যে সরস্বতীর করুণায় বাল্মীকি কবিগুরু ও মৃত্যুঞ্জয়, বাল্মীকির নিকটে, তাঁহার সেই চিরপ্রিয় সরস্বতীকে একটি বারের জন্য ভিক্ষা চাহিয়াছেন। ভবভূতি প্রাণান্ত করিয়া বীরচরিত ও মালতী-মাধব প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু বিদর্ভের অভিমানি সমাজে, ঐ ঐ কাব্য আদৃত হয় নাই, তাই, এবার,—যাঁহাকে আদর করিয়া রত্নাকর 'কবিগুরু' হইয়াছেন,—আদিকবির সেই আদরিণী ভাষাকে চাহিতেছেন। বাসনা—আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। আর একবার, বীরচরিতে যে বাসনা ফলবতী হয় নাই, সেই বাসনা পূর্ণ করিতে প্রয়াস করিবেন।

আর এক কথা,—কবিগুরু বাল্মীকির অনুসরণ করিয়া বীরচরিত লিখিয়া, ভবভূতি, আপনাকে বাল্মীকির সহিত তুলনা করিবার অবসর দিয়াছিলেন, প্রবীণ বয়সে, ভবভূতি বুঝিয়াছিলেন যে, না,—এ প্রণালী সমীচীন নহে। অমর রত্নাকরের সহিত, কোনও মর কবির তুলিত হইতে যাওয়া বিড়ম্বনার বিষয়। তাই এবার প্রথমেই, তিনি, বাল্মীকিকে প্রণাম করিয়া দূরে সরিয়া যাইয়া, নিজের মনের মতন করিয়া, নূতন সজ্জায়,—স্বকীয় অক্লান্ত সমুজ্জ্বল প্রতিভার নূতন

আলোকে, বাল্মীকির রাম সীতাকে বিভূষিত করিলেন। দর্শক-বৃন্দ, যখন ভবভূতির এই চিরনূতন রামসীতার কমনীয় মূর্ত্তি দর্শন করিলেন,—তখন, তাঁহারা অবাক্ হইলেন, উদ্ভ্রান্ত হইলেন। অতৃপ্ত নয়নে—কবির এই মনোমোহন চিত্র দেখিতে লাগিলেন।

ভবভূতির দুইটি বিশেষণ এই স্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি 'শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছন', অপরটি 'পদবাক্য প্রমাণতত্ত্বজ্ঞ'। ভবভূতির লোকাতিশায়িনী কবিত্বশক্তি দর্শন করিয়া, তাহার সমসাময়িক মনস্বিবৃন্দ মনে করিতেন, বুঝি বাগ্‌দেবী নিয়ত ইঁহার কণ্ঠবিলাসিনী, তাই, তাঁহারা ইহাকে 'শ্রীকণ্ঠ' এই সার্থক বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছিলেন। শব্দবিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কোথায়, কোন্ প্রক্রমে, কিরূপ শব্দ ভাবাববোধের সম্পূর্ণ অনুকূল,—তাহা নির্ণয় করিতে তিনি বৃহস্পতি ছিলেন। তাই দেখিতে পাই, তাঁহার উত্তর-চরিতে ব্যবহৃত এক একটী শব্দ, যেন শত শত তজ্জাতীয় শব্দের সমষ্টি। কালিদাস ব্যতীত, অন্যান্য কবিরা যে সকল ভাব প্রকাশ করিতে, হয়ত শব্দরাশির—আলোড়ন করিয়াছেন, ভাবের কবি ভবভূতি, সেই সকল ভাব, এমন একটি শব্দের দ্বারা এমন ভাবে ফুটাইয়াছেন, যে, দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বশবর্ত্তিনী সাধ্বী কামিনীর ন্যায় বীণাপানি যেন তাঁহার অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। যখন যে দিকে ইচ্ছা, কবি চলিয়াছেন,—আর সরস্বতী যেন মুগ্ধার ন্যায়, ছায়ার ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অবিচারিত চিত্তে সেই দিক ধরিয়া যাইতেছেন।

তাঁহার হৃদয় ভাবের আকর ছিল, ভাবের জন্য তাঁহাকে কখনও ভাবিতে হয় নাই। আর ভাষাত তাঁহার সহচরী সদৃশী। তাই ভাব এবং ভাষা এই উভয়ের সমবায়ে তাঁহার কাব্য সর্ব্বতোভাবে নিরবদ্য হইয়াছে।

প্রস্তাবনায়, নিপুণ কবি, দর্শকগণের হৃদয়ে, অতি সংক্ষেপে সেই বনবাস, সেই সীতাহরণ, সেই লঙ্কাসমর, প্রভৃতির কথা জাগাইয়া দিতেছেন, কিছু পরেই চিত্র-দর্শনে যে সমুদয় সুন্দর সুন্দর চিত্র প্রদর্শিত হইবে, তাহা ভাল করিয়া দেখাইবার জন্য, দর্শকগণের নয়ন যেন, পূর্ব্বাহ্ণেই পরিষ্কৃত করিতেছেন। নট এবং সূত্রধার, রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াই কথাবার্ত্তা কহিতেছে। তাহাদের একজন বলিল, "ভাই একি? রাবণদর্পহারী মহারাজ রামের এই শুভ অভিষেক সময়ে, দিন রাত্রি আনন্দ উৎসব প্রভৃতি অপ্রতিহতভাবে হইবার কথা, তাহা না হইবার কারণ কি? সব নীরব কেন?" সূত্রধারের এই সংশয়াত্মিকা উক্তিতে, সামাজিকগণের হৃদয় কম্পিত হইল। অকস্মাৎ বুঝি কোনও বিপদ ঘটিল—ভাবিয়া তাঁহারা একান্ত বিমনা হইলেন। আরব্ধ উৎসব হঠাৎ কেন প্রতিহত হইল,—এই ভাবনার একটি করালরেখা, তাঁহাদের মানসদর্পণে বার বার প্রতিফলিত হইতে লাগিল।—সূত্রধার যখন বলিয়াছিল,—"রাবণদর্পহারী মহারাজ রামের"—তখন ঐ এক 'রাবণদর্পহারী' শব্দে দর্শকগণের স্মৃতিপথে, সেই সব কথা একে একে উদিত হইতেছিল। সেই একবার,—অভিষেকের সমস্ত আয়োজন

সম্পূর্ণ হইয়াছে, কাল রাম রাজা হইবেন, রাজ্যের সর্ব্বত্র অপার আনন্দ, হায়, তাহা আর হইল না, সকলের সকল আশা-প্রতিমাই কৈকেয়ীর এক প্রবল পদাঘাতে চূর্ণ হইল। রাম বনে গেলেন। সীতা হৃত হইলেন। সীতাপহারক রাবণের সহিত কত যুদ্ধ, কত বিগ্রহ করিয়া, রাম, তাঁহার দর্পহরণ করিলেন। রামসীতা ফিরিয়া আসিয়াছেন, সেই পূর্ব্বসঙ্কল্পিত অভিষেক হইয়া গিয়াছে, রামের হিতৈষী বন্ধুবর্গ সাশঙ্কচিত্তে যে অভিষেকের পুনরুদ্যোগ করিয়াছিলেন তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, এখন কয়েকটা দিন নিরাপদে কাটিয়া গেলেই, তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন:—পায়সদগ্ধ বালক যেমন দধিতেও উত্তাপের আশঙ্কা করে, তদ্রূপ রামসুহৃদ্‌বৃন্দ, সেই প্রথম বারের অভিষেকের পরিণাম স্মরণে, মধ্যে মধ্যে চমকিতেছিলেন, তাঁহাদের হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিতেছিল।— এমন সময় হঠাৎ তাঁহাদের কর্ণে ঐ উৎসবপ্রতিবন্ধের কথা প্রবেশ করিল। কিছু পরেই, পতিদেবতা সীতার যে ভয়ঙ্কর দুর্ব্বিপাক ঘটিবে, তাহা সহ্য করিবার জন্য, পূর্ব্ব হইতেই, কবি যেন, দর্শকদিগকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। সেই অসহ্য বেদনা সহিবার উদ্দেশে, দর্শকদিগকে, ক্রমে সহিষ্ণু করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সূত্রধারের কথায় সকলেই উদ্বিগ্ন, সকলেই চঞ্চল, 'কি হইয়াছে' ভাবিয়া সকলেই চিন্তিত। এমন সময়ে নট বলিল, "ভয় নাই, যাঁহাদের আরাধনার জন্য এই কয়দিন এত উৎসব হইতেছে, তাঁহারা সকলেই আজ চলিয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্রের অভিষেক-

যজ্ঞে নানাদিগ্‌দেশ হইতে, কত ব্রহ্মর্ষি, কত রাজর্ষি, মহা-রাজকে অভিনন্দিত করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, লঙ্কাসমর-সুহৃদ্‌ মহাত্মা কপিরাক্ষসগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের অর্চ্চনার উদ্দেশ্যেই এই কতিপয় দিনব্যাপী উৎসব ছিল। আজ তাঁহারা মহারাজ কর্ত্তৃক স্ব স্ব স্থানে প্রেষিত হইয়াছেন। তাই উৎসবেরও অবসান হইয়াছে। সম্প্রতি মহারাজ রামচন্দ্রের জননীগণও, তাঁহাদের জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে যজ্ঞের নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য গিয়াছেন, মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং দেবী অরুন্ধতী তাঁহাদিগকে লইয়া গিয়াছেন।" এতক্ষণে দর্শকগণ পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা কত প্রকার সংশয়ের আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন, নটের উক্তিতে তাঁহাদের সে সমস্ত সংশয়ই নিরাকৃত হইল। এতক্ষণে তাঁহারা বুঝিলেন যে, না—কোনরূপ বিপদ্‌ ঘটে নাই। দর্শকগণ আরও বুঝিলেন যে, কাল যে রাজধানী উৎসবে পূর্ণ ছিল, আজ তাহা নিরুৎসব। কাল যে স্থানে জনস্রোতঃ প্রবাহিত ছিল, আজ তাহা প্রায় নির্জ্জন। কেবল রাম-সীতা-লক্ষ্মণ-প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি সেই নীরব রাজধানীতে অবস্থান করিতেছেন। পাঠক! অযোধ্যার এই মহানীরবতা অনুভব করিবার পূর্ব্বে, বিজয়াদশমীর পরদিন, বাঙ্গালীর গৃহে যে দশা হইয়া থাকে, তাহা একবার স্মরণ করুন। দুর্গাপূজার পরে, ক্ষুদ্র গৃহস্থের পর্ণকুটীর যদি ঐ প্রকার বিষণ্ণতার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারে, তবে অযোধ্যার ন্যায় মহানগরী, যে নগরী নানাবিধ উৎসব আমোদে, গীতবাদ্যে,

এবং জনকোলাহলে পরিপূর্ণ ছিল, উৎসবান্তে, জনকোলাহলশূন্য হইলে সেই নগরীর অবস্থা যে কিদৃশী হইতে পারে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। প্রবল ঝটিকার অবসানে প্রকৃতির যেরূপ অবস্থা, প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাতের নিবৃত্তির পর, সমুদ্র-বক্ষের যেরূপ অবস্থা, অযোধ্যার আজ সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। কেবল কি অযোধ্যার অবস্থাই এইরূপ হইয়াছে, না রামসীতার হৃদয়ের অবস্থাও আজ এই প্রকার? জীবনের প্রভাতে, রাজলক্ষ্মী সীতার করধারণ করিয়া, প্রেমময় রাম একবার রাজসিংহাসনে বসিতে যাইতেছিলেন, তাহা হয় নাই। নবীন যৌবনের সেই কত আশা, কত উল্লাস, রাজ্যের কত হিতৈষণা প্রাণে মুহুর্মুহু কাদম্বিনীর ক্রোড়ে বিদ্যুতের ন্যায় খেলিতেছিল, ভাগ্যের বিবর্ত্তনে, সে সমস্তই স্বপ্নে পরিণত হইল। রাজ-সিংহাসন ত দূরের কথা, শেষে বিশাল অযোধ্যারাজ্যের এক কোণেও, রাম সীতার একটু স্থান হইল না! তারপর কত কি হইয়াছে। সে সকল ভাবিতে গেলেও রামের হৃদয় অবশ হইয়া পড়ে। আজ আবার সেই অযোধ্যার সেই সিংহাসনে রামসীতা বসিয়াছেন। যে জীবনের প্রারম্ভেই বিষাদের ছায়া আসিয়া ভাসিয়া উঠে, সে জীবনের মধ্যে বা শেষে প্রসাদের সম্ভাবনা অতি অল্প। প্রাতঃকালে যাহার 'অনিষ্টদর্শন' ঘটে, সমস্ত দিনই তাহার নানাপ্রকার 'অনভিমত' ঘটিবার সম্ভাবনা। কবিবর ভবভূতি, অতি সন্তর্পণে, গম্ভীরপদা সরস্বতীর সাহায্যে, এই সমুদয় গভীর ভাব দর্শকগণের চিত্তমুকুরে ধীরে ধীরে

প্রতিভাসিত করিতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে ইহাও বলিয়া-দিলেন যে, বধূ জানকী কঠোরগর্ভা বলিয়া, তাঁহার সান্ত্বনার জন্য রামকে রাখিয়া, গুরুজনবর্গ সকলেই "জামাতৃযজ্ঞে" প্রস্থান করিয়াছেন। অন্তঃপুরে রাজপরিবারের মধ্যে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ ব্যতিরেকে, আর কেহই নাই।

ক্রমে, সংক্ষেপে, রাজধানীর তথা রাজা ও রাণীর মনের অবস্থার কথঞ্চিৎ আভাস দিয়া, কবি, দর্শকগণকে আরও একটু চিন্তামগ্ন করিবার জন্য,—অবশ্যম্ভাবিনী যে মহাঝটিকায় অচিরেই সোনার অযোধ্যা শ্মশানে পরিণত হইবে, তাহা দেখাইবার জন্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

অভিনয়ের জন্য, সূত্রধার এবং নট, দুইজনেই এখন অযোধ্যা-বাসী সাজিয়াছে। তাহারা উভয়ে রামদর্শনে যাইতেছে। রামরাজত্বে রাজার নিকট প্রজার অবাধ গতি ছিল।

উক্ত প্রজাদ্বয় স্থির করিতে পারিতেছে না যে, রাজার নিকটে যাইয়া কি প্রকার স্তবস্তুতি করা আবশ্যক। তাহাদের একজন বলিল "না ভাই, তুমি একটী ভাল স্তব ঠিক কর"—অমনি দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, 'ভাল স্তব'—ইহার অর্থ কি? এ সংসারে কি কোন বস্তু সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে উত্তম হইতে পারে? না হইয়া থাকে? তুমি কি জান না যে, স্ত্রীলোকের চরিত্র নিতান্ত নিষ্কলঙ্ক হইলেও যেমন তাহাতে দুষ্ট ব্যক্তিরা অম্লানবদনে দোষারোপ করিয়া তৃপ্তিলাভ করে, তদ্রূপ ভাষা বা ভাব যতই নির্দ্দোষ হউক না কেন, দোষদর্শী যাহারা,

তাহাদের চক্ষে তাহা কিছুতেই নির্দ্দোষরূপে প্রতিপন্ন হয় না। সুতরাং লোকনিন্দা-পরিহার-বাসনায় নিয়ত সাশঙ্ক ব্যবহার করা বিফল। তুমি যতই কর না কেন, নিন্দুকের মুখ কিছুতেই বন্ধ করিতে পারিবে না। সংসারে অনিন্দনীয়তা কোথায়? অতএব আমার বিবেচনায়, সর্ব্বত্র স্বেচ্ছানুসারে ব্যবহার করাই সঙ্গত"।[১]

১ম ব্যক্তির এই উক্তিশ্রবণে, দর্শকগণের হৃদয়ে, একটা ভাবনা, কখন ভাসিতে কখন ডুবিতে লাগিল। নিষ্কলঙ্ক নারী-চরিত্রেও পাষণ্ডেরা কলঙ্কারোপ করিতে পারে, করিয়া থাকে, সংসারে বৃথা অপবাদের করালগ্রাসে সকলকেই পড়িতে হয়,— এই চিন্তা তাঁহাদের মনে জাগিতে লাগিল। শারদকৌমুদীবৎ, আকাশগাত্রবৎ, নির্ম্মল সীতাচরিত্রে লোকপবাদরূপিণী যে ঘন-কৃষ্ণ-করাল-কাদম্বিনী উদ্‌গতপ্রায়, তাহার একটা স্পষ্ট আভাস দিয়া, কবি, দর্শকগণকে ক্রমে ঐ দুঃসহ সহিবার জন্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। সীতানির্ব্বাসনের ভিত্তি-নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই প্রসঙ্গে কবি, তাঁহার নিজেরও মনঃক্ষোভের একটা কৈফিয়ৎ দিলেন। এত প্রয়াস করিয়াও যখন নিন্দুকের হাতে পরিত্রাণ পাইলাম না, তখন আর কেন? পরচিত্তবিনোদন-

১—উত্তর চরিত—"সর্ব্বথা ব্যবহর্ত্তব্যং কুতোহ্যবচনীয়তা?
যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জ্জনোজনঃ॥

প্রয়াসে আর নিয়ত সশঙ্কচিত্তে লেখনী পরিচালনা করিব কেন? আমি ব্যক্তিগত মতামতে নিরপেক্ষ হইয়া, এখন হইতে বীণাপাণির সেবা করিব। কে কি বলিল না বলিল, সে দিকে লক্ষ্যও রাখিব না। যে সামাজিকদিগের কঠোর শায়কে কবির বীরচরিত ও মালতীমাধব জর্জ্জরিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে কবি বুঝাইয়া দিলেন যে, যতক্ষণ তোমাদের অপেক্ষা রাখিব, ততক্ষণই তোমাদের অস্তিত্ব, তোমাদিগকে যদি উপেক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে, হে দোষদর্শি-গণ, তোমাদের স্থান কোথাও নাই। উপেক্ষাই তোমাদের প্রকৃত অভ্যর্থনা। যেহেতু, সর্ব্বথা দোষলেশবিমুক্ত বিষয়েও যখন দোষোদ্ভাবন করা দুর্জ্জনের প্রকৃতিসিদ্ধ, তখন সে পক্ষে উদাসীন থাকাই শ্রেয়ঃ, খলকৃত স্তুতি এবং নিন্দা,— দুইই তুল্য।

"কুৎসাপ্রবণ লোক সাধ্বী রমণীর চরিত্রেও যেমন অনায়াসে নানাবিধ দোষকল্পনা করিয়া থাকে, সেইরূপ অতিসুচিন্তিত প্রবন্ধেও দোষার্পণ করা অনেকের স্বভাব," ১ম ব্যক্তির এই সত্য কথা শ্রবণে ২য় ব্যক্তি বলিল,- "কেবল স্বভাব বলিও না, মজ্জাগত স্বভাব,—বলা উচিত। কেননা বিদেহাধিপতি রাজর্ষি জনকের শুদ্ধশীলা দুহিতা সীতাদেবীর চরিত্রেও যখন লোকে অলীক অপবাদ-বিলেপনে তৎপর, তখন, তাহাদের মজ্জাগত স্বভাবই বলা সঙ্গত নহে কি? তাহারা মাত্র 'অসৎ' এই বিশেষণের যোগ্য নহে, উহাতেও তাহাদের প্রকৃত বৈশিষ্ট প্রকাশিত হয় না, তাহারা 'অত্যন্ত অসৎ'—ইহাই বলা বোধ হয়

সর্ব্বথা উচিত।” ২য় ব্যক্তি আরও বলিল,—“অসচ্চরিত্র লঙ্কেশ্বরের ভবনে দেব-যজন-সম্ভবা রাজনন্দিনী সীতা কিছু কাল একাকিনী বাস করিয়াছিলেন, মাত্র এই মূল টুকু আশ্রয় করিয়া, লোকে, সাধ্বী ললনাদিগের আদর্শভূতা সীতাদেবীর নির্ম্মল চরিত্রেও কলঙ্কারোপ করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ করিতেছে না। যদিও রাবণবধের অব্যবহিত পরেই অনলে পরীক্ষা করিয়া, রামচন্দ্র সীতার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সুদূর লঙ্কানগরীর সেই অগ্নিপরীক্ষায় অযোধ্যাবাসীরা প্রত্যয়-স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহে।”

নটের মুখে এই কথা শুনিয়া দর্শকগণ স্তম্ভিত হইলেন। যাহা কেহ কখন স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই, আজ হঠাৎ তাহাই উপনত হইল! আকাশগাত্রে কলঙ্কস্পর্শ বরং সম্ভব, কিন্তু জানকী-চরিত্রে কলঙ্ক লেশ-স্পর্শও সম্ভব নহে। তাদৃশ সীতা-চরিত্রেও লোকে নানা কথা বলে। লোকে না করিতে পারে, এমন কাজ নাই; না কহিতে পারে, এমন কথা নাই। সূত্র-ধারের সেই ‘হঠাৎ উৎসব বন্ধ হইল কেন’—প্রশ্নে, একবার দর্শকগণের চিত্তে নানাবিধ সন্দেহের কথা জাগিয়াছিল, কত প্রকার আশঙ্কায় প্রাণ অস্থির হইয়াছিল। পরে নটের উক্তিতে তাঁহাদের সে সন্দেহ নিরাকৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও প্রাণের সে উদ্বেগ-তরঙ্গ সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হয় নাই। ইহারই মধ্যে আবার এই অশনিসম্পাত! সকলেই শিহরিয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরেই অযোধ্যার অদৃষ্টে

বিধাতার যে ভয়ঙ্কর অভিশাপ নিপতিত হইবে, অযোধ্যাবাসী-দিগের হৃদয় যে অভিশাপ-বজ্রে শতধা চূর্ণবিচূর্ণ করিবে, যে ভীষণ চিতানলে স্বর্ণপুরী ভস্মীভূত হইবে, সেই সমস্ত সহ্য করিবার জন্য, দর্শকদিগের চিত্ত কবি যেন ধীরে ধীরে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। প্রথমে, সূত্রধারের উক্তিদ্বারা ক্ষেত্র যেন কর্ষণ করা হইয়াছিল, এইক্ষণ আবার সেই ক্ষেত্র বীজবপনের উপযোগী করিবার জন্য পরিস্কৃত ও সুসিক্ত করা হইল, অচিরেই, সেই সীতানির্ব্বাসনরূপ বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হইবে।

নটমুখে এই ভয়ঙ্কর লোকাপবাদের কথা শ্রবণ করিয়া নিরীহ সূত্রধার বলিল,—"আহা! এই কিংবদন্তী যদি মহারাজের কর্ণগোচর হয়, তবেই সর্ব্বনাশ, কষ্টের আর অবধি থাকিবে না।"

দর্শকগণ বুঝিলেন যে, মহারাজ রামচন্দ্র এখনও এ সকল সর্ব্বনাশের বিবরণ শ্রবণ করেন নাই। তবুও মন্দের ভাল। সূত্রধারকে আশ্বস্ত করিয়া নট বলিল, "ভয় নাই, দেবতারা এবং ঋষিরা মঙ্গল করিবেন।" রামের নিষ্পাপ সংসারে দেবতা ব্রাহ্মণের অশেষ অনুগ্রহ, তাঁহারাই বিপদে রক্ষা করিবেন—ভাবিয়া বিষণ্ণ সামাজিকগণ, চিত্তের অবসাদ কথঞ্চিত বিদূরিত করিলেন। কবির কি অদ্ভুত সৃষ্টিকৌশল,—কোন্ প্রসঙ্গে কোন্ কথা উঠিল! শরতের পূর্ণিমায়, শারদী চন্দ্রিকার পরিবর্ত্তে হঠাৎ ভীমা অমানিশার অন্ধকার আবির্ভূত হইল! ক্রমে সূত্রধার এবং নট, 'মহারাজ এখন কোথায়' জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা

করিল। রাজপুরবাসী লোকে বলিল, 'মহারাজ এখন অন্তঃপুরে, রাজর্ষি জনক, অরণ্যবাস-প্রতিনিবৃত্ত, অভিষিক্ত রামচন্দ্রকে, স্নেহবশতঃ অভিনন্দিত করিতে আসিয়া, নানাবিধ উৎসব আমোদে এই কয়দিন যাপন করিয়া, আজ বিদেহরাজ্যে প্রস্থান করিয়াছেন। পিতৃবিচ্ছেদে দেবী জানকী বড়ই বিমনা, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য, নরপতি রামচন্দ্র ধর্ম্মাসন হইতে এইমাত্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।'

পিতৃবিচ্ছেদে কোমলহৃদয়া জানকী অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, তাই, তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য, রাম অন্তঃপুরে গিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া, সামাজিকগণ বুঝিলেন,—সীতাময়-জীবিত রামের হৃদয় কি উপাদানে গঠিত। এই নাটকে, এই সর্ব্বপ্রথম রামচন্দ্রের পরিচয় পাইতেছি, প্রথম পরিচয়েই দেখিতেছি, রাম-সীতার হৃদয়বন্ধন কত সুদৃঢ়। আরও দেখিতেছি, বিচ্ছেদ-কাতরা সীতাকে আশ্বস্ত করিতে রাম গিয়াছেন, অন্তঃপুর প্রায় নির্জ্জন, সেই জনহীন বিশাল প্রাসাদে ছিলেন পিতা জনক, অনেক দিন পরে পিতার সাক্ষাৎ পাইয়া, কন্যা সীতা আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। আর যে পিতার সহিত দেখা হইবে, সে সম্ভাবনা ছিল না,—বনবাসে গেলে, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের কতক সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু দুরন্ত রাবণের কবল হইতে পরিত্রাণের সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না। সে অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছে। সীতা ফিরিয়া আসিয়াছেন। যাঁহাদের সহিত বনে গিয়াছিলেন, তাঁহারা যেমন, ঐ প্রবল সমর-

জয়ী হইয়া, অক্ষতদেহে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের অদৃষ্ট-দেবতারূপিণী মৈথিলীও তদ্রূপ অক্ষতমনে ফিরিয়াছেন,—কাহারই কোনরূপ অপচয় ঘটে নাই, বরং পরস্পরের প্রতি পরস্পরের স্নেহ, প্রেম, দাক্ষিণ্য এই বনবাসে শতগুণ উপচয় প্রাপ্ত হইয়াছে। সীতা তাই আহ্লাদ সাগরে নিমগ্না। জনকেরও আনন্দ অপরিসীম। তাঁহার কন্যা কোশলরাজ্যের অধীশ্বরী হইবেন, গুণাভিরাম রামচন্দ্রের বামপার্শ্বে সাক্ষাৎ রাজলক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইবেন, জনকের ধনুর্ভঙ্গপণ সার্থক হইবে, কিন্তু সে সব কৈকেয়ী বিফল করিয়াছিলেন। বড় আশায় ছাই দিয়াছিলেন। রমণীকুল-ললাম-ভূতা সাধ্বী সীতার শুভাদৃষ্টক্রমে সেই সকল নির্ম্মল আশালতিকা আবার অঙ্কুরিত, পল্লবিত, শেষে কুসুমিত পর্য্যন্ত হইয়াছে। তাই পিতা জনকের এত আনন্দ। আনন্দময়ী জানকী, অনেক দিন পরে, তাঁহার আনন্দপূর্ণ-হৃদয় পিতার ক্রোড়ে বসিয়াছিলেন, বসিয়া সেই সমস্ত অতীত ঘটনা, সেই বনবাস, রাক্ষসহরণ, লঙ্কাসমর—একে একে সব বলিয়া বলিয়া নিজের প্রাণ-ভার লঘু করিতেছিলেন। সীতা এক প্রকার মাতৃহীন। মহর্ষি জনকই তাঁহার মাতা, জনকই তাঁহার পিতা। মাতৃহীন সন্তান সাধারণতঃ সর্ব্বত্রই পিতার অধিকতর আহ্লাদ-ভাগী, পিতার জীবিত-নির্ব্বিশেষ। সীতাও জনকের সেইরূপ ছিলেন। এ হেন পিতা চলিয়া গিয়াছেন, তাই সীতা কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। এই এক কবিতার দ্বারাই কবি যেন, সামাজিকগণের হৃদয়ের যত কিছু সহানুভূতি, সমস্ত সীতার দিকে

টানিয়া আনিলেন। রঘুকুল-রাজলক্ষ্মী সীতা পিতার বিচ্ছেদে কাতর, মহারাজ তাঁহার সান্ত্বনার জন্য গিয়াছেন,—দেবতা তাঁহাকে শান্তিদান করুন,—সামাজিকগণের হৃদয়বীণা এই কথা বার বার ঝঙ্কার করিতে লাগিল। সামাজিকগণ এই প্রসঙ্গে আরও একটা বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, সীতা বড়ই কোমলপ্রাণা; তিনি আত্মীয়স্বজনের বিচ্ছেদ কখনই সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার হৃদয় কুসুমের ন্যায় কোমল। রামের এই অন্তঃপুর প্রবেশ-দর্শনে, সীতার অদৃষ্ট-দেবতা হয়ত, রামের উদ্দেশে বলিতেছিলেন, 'রাম, তোমার সীতার বিচ্ছেদ-কাতর হৃদয়ে শান্তিদান করিতে যাইয়া দেখিও যেন, তাহাকে চিরবিচ্ছেদ-সাগরে নিমগ্ন করিও না।'

এতদূরে উত্তরচরিতের প্রস্তাবনা শেষ হইল। নিপুণ মহাকবি, এতদূরে, দর্শকগণের হৃদয়, রাম-সীতার ভাবী হর্ষ বিষাদ প্রভৃতি অনুভব করিবার যোগ্য করিয়া নির্ম্মিত করিলেন। অতঃপর, রামসীতার প্রণয় বিরহ প্রভৃতির যত গভীর ভাবব্যঞ্জক চিত্রই প্রদর্শিত হউক না কেন, যত অসহ্য বেদনার ছবিই অঙ্কিত হউক না কেন, দর্শকবৃন্দ অনায়াসেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। অণুবীক্ষণের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র বস্তুও যেমন স্থূলরূপে প্রতীত হয়, রামসীতার হৃদয়বর্ত্তী অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবনিচয়ও তদ্রূপ, এই প্রস্তাবনার সাহায্যে, অনায়াসেই দর্শকগণ, বাছিয়া বাছিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন। এই জন্যই বলিয়াছি যে, উত্তরচরিতের প্রথম অঙ্কের প্রস্তাবনার

তাৎপর্য্য সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, মূল গ্রন্থের তাৎপর্য্যাববোধের ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রামসীতা ও চিত্রদর্শন।

কুলগুরু বশিষ্ঠ, রাজসংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সদৃশী দেবী অরুন্ধতী এবং স্নিগ্ধহৃদয় শ্বশ্রূগণ—সকলেই আহূত হইয়া জামাতৃযজ্ঞে গমন করিয়াছেন, রাজাবরোধ শূন্যপ্রায়। ইঁহাদের বিরহে কোমলপ্রাণা জানকী অত্যন্ত কাতর। নিয়ত নানাবিধ দুশ্চিন্তায়, ক্ষণে ক্ষণে, তাঁহার মুখারবিন্দ পরিম্লান হইতেছে। সম্মুখে রাম উপবিষ্ট, তিনি নানা প্রসঙ্গে, নানা উপদেশে গর্ভ-ভরালসা বিমনায়মানা জনকতনয়ার প্রীতিবিধানের চেষ্টা করিতেছেন। বলিতেছেন, "দেবি আশ্বস্ত হও, যাঁহারা আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, তাঁহারা অচিরেই প্রত্যাগমন করিবেন। তুমি অত অধীর হইও না।" রামের এই কথায়, সীতা কহিলেন, "আর্য্যপুত্র, সকলই বুঝিতেছি, কিন্তু বুঝিয়াও আমার অবুঝ মনকে বুঝাইতে পারিতেছি না; যাঁহারা স্নেহ করেন, ভাল বাসেন, তাঁহাদের বিচ্ছেদ বড়ই যন্ত্রণাদায়ক।" রাম শুনিলেন,—তাঁহার সীতার এই মোহময়ী উক্তিতে, বলিষ্ঠহৃদয় রামের মনে মায়াময় সংসারের অনেক কথা ভাসিয়া উঠিল। সীতা—সীতা,

সহস্রগুণসম্পন্না হইলেও রমণী, আর রাম—রাম, তাঁহার হৃদয় সর্ব্বতোভাবে সীতাময় হইলেও তাহা জ্ঞানীর হৃদয়, বীরের হৃদয়, অযোধ্যার অধীশ্বরের হৃদয়। জানকীর কথায় রাম বলিলেন,—"সীতে! ঠিকই বটে, বন্ধুবর্গের বিপ্রযোগ যন্ত্রণাদায়ক, সত্য।—মোহময় সংসারের এই সকল ব্যাপারে, মায়ার এই সকল খেলায়, সংসারী ব্যক্তির হৃদয়ের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত ক্ষুভিত হয়। এই সকল যাতনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশাতেই, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা, সমস্ত বিষয়বাসনা পরিহার পূর্ব্বক, অরণ্যে গমন করিয়া, ক্লান্ত হৃদয়কে বিশ্রাম প্রদান করেন।" প্রলয়ের পূর্ব্বে যেমন তাহার নানাবিধ দুর্লক্ষণ প্রকাশিত হয়, বিপদের পূর্ব্বে যেমন কত দুর্নিমিত্ত আবির্ভূত হয়, ঝটিকার পূর্ব্বে নিসর্গসুন্দরী প্রকৃতির যেমন রূপ-বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, আজ সীতাকে সান্ত্বনা করিতে যাইয়া, ধীর সীতাময় রামচন্দ্রের মুখ হইতেও তেমনি এই বাক্যগুলি নির্গত হইল। সীতার কথায় রামের হৃদয়ে শম-গুণের প্রভাব জাগিয়া উঠিল। শমগুণের প্রভাবে, সংসারে অনাস্থা, বিষয়ে বৈরাগ্য, পরিশেষে শান্তির অন্বেষণে বনে গমন প্রভৃতি কত-কি মহার্ঘ উপদেশ বাণী অতর্কিতে রাম বলিয়া ফেলিলেন। রাম যে জন্য সীতার নিকটে আসীন, যে জন্য ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞে যাইতে পারেন নাই, যে জন্য ধর্ম্মাসন হইতে একপদে সীতার কক্ষে উপনীত, রামের এই কথাগুলি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কোথায় প্রণয়-গদ্গদ কণ্ঠে রাম দুর্ম্মনায়মানা জানকীকে সান্ত্বনা করিবেন, আর কোথায় এই উদাসীনভাবপূর্ণ

বচনবিন্যাস। এ সময়ের এ কথা নহে। অবিলম্বেই যে মহাপ্রলয় সংঘটিত হইবে, ইহা যেন তাহারই পূর্ব্ব লক্ষণ, যে অনল-বৃষ্টিতে, সোণার অযোধ্যা দগ্ধীভূত হইবে, ইহা যেন তাহারই সূচক অগ্নিবর্ণ মেঘ, আপতিষ্যমাণ অশনির পূর্ব্ব বিকাশ। দুঃসময় আসিবার পূর্ব্বে তাহার অনেক লক্ষণ জানিতে পারা যায়। তাই আজ রামের মুখ হইতে, মঙ্গলার্থিনী দেবার্চ্চনা-পরায়ণা রমণীর হস্ত হইতে মঙ্গলঘট-স্খলনের ন্যায়, এই কথা-গুলি বাহির হইল। নতুবা প্রিয়তমার সান্ত্বনার সময়ে অরণ্যে গমনের কথা উঠিবে কেন। উহা যে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত-বিরোধী।

অভিনয় আরব্ধ হইবার পর, এই প্রথম রামসীতার আবির্ভাব। যাঁহাদের পূত চরিত্র দেখিবার এবং পূত কথা শুনিবার জন্য দর্শকগণ সমুৎসুক, প্রস্তাবনায় সূত্রধার এবং নট যাঁহাদের ছায়া দর্শকগণের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে, সেই রামসীতা এতক্ষণে উপস্থিত,—দর্শকগণ নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির ভাবে রামসীতাকে দেখিতে এবং তাঁহাদের এই প্রথমোচ্চারিত বচনাবলী শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বন্ধুগণের বিচ্ছেদ বড়ই যাতনাদায়ক সত্য, কিন্তু দর্শকগণ, সীতার এই প্রথম কথাতেই, সীতার সেই অনন্তপ্রেমরত্নপূর্ণ হৃদয়খানির যেন অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিয়া লইলেন। পিতা জনক, গুরুদেব বশিষ্ঠ, গুরুপত্নী অরুন্ধতী, ভগ্নী ঊর্ম্মিলা মাণ্ডবী প্রভৃতি এবং বরেণ্য শ্বশ্রূগণ—ইঁহাদের বিরহে জানকী এত কাতর হইয়া পড়িয়া-

ছেন,—চিরবিরহ নহে, কতিপয় দিনের জন্য বিরহ ;—তাহাতে আবার তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্ব রাম, তাঁহারই সান্ত্বনার জন্য নিয়ত নিকটবর্ত্তী, তবুও সীতার প্রাণ এত অস্থির। যখন রাম বনে গমন করেন, তখন সীতা, যাঁহাদিগের শত নিষেধ সত্ত্বেও, রামের সঙ্গিনী হইয়াছিলেন, রামের বিরহ সহিতে পারিবেন না,—ভাবিয়া, যাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া, হৃদয়েশ্বরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছায়াময়ী মূর্ত্তির ন্যায় গমন করিয়াছিলেন, আজও ত সেই রাম বর্ত্তমান। একদিন যাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া, স্নেহময়ী জানকী সকলের বিরহ সহিতে পারিয়াছিলেন, আজ সেই রামেরই নিকটে থাকিয়া, তাঁহাদেরই জন্য সীতা এত ব্যাকুলা কেন? বনগমনের পূর্ব্বে সীতার হৃদয় দুঃখ-যাতনা প্রভৃতি সহিতে যতদূর সমর্থ ছিল, এখন বুঝি আর ততদূর সমর্থ নহে।

বনবাসকালের নানাবিধ যন্ত্রণায় সীতা-হৃদয়ের সে পূর্ব্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বনবাসে প্রথমতঃ রাম লক্ষ্মণ ব্যতীত আর সকলের বিচ্ছেদে, তারপর—রাবণ হরণ করার পর, সেই রামের বিরহে—লক্ষ্মণের বিরহে—সীতার প্রাণ শতধা বিভগ্ন হইয়াছিল। যাহা একবার ভাঙ্গে, তাহা আর জোড়া লাগে না। যেমনটি ছিল, তেমনটি আর হয় না। রামের সহিত সীতা পুনর্মিলিত হইয়াছেন সত্য, সেই অযোধ্যার এবং মিথিলার আত্মীয় স্বজনের সহিত সীতা আবার মিলিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু হৃদয়ের সে ক্ষত স্থানের দাগ এখনও আছে, চিরদিন থাকিবেও। বিরহব্রণের যাতনা গিয়াছে, কিন্তু ব্রণের চিহ্ন যায়

নাই। তাই বিরহের নাম শুনিলেই, সীতার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। মনে কত-কি বিপদের বিভীষিকা মূর্ত্তির অস্পষ্ট ছায়া ভাসিয়া উঠে। সীতা-হৃদয়ের আর সে পূর্ব্বতন বল নাই, পূর্ব্বে যাহা সহিতে পারিতেন, এখন তাহা ভাবিতেও প্রাণ কান্দিয়া উঠে। তাই আজ প্রাণাধিক রামের অঙ্কবর্ত্তিনী থাকিয়াও প্রকৃতিপেলবা জনকদুহিতার এত অবসাদ। তাঁহার চিরকোমল হৃদয় অধুনা এত কোমলতম হইয়া পড়িয়াছে যে, পূর্ব্বে যাহা সহিতে পারিতেন, এখন তাহা ভাবিবারও আর শক্তি নাই। ইহাই যদি হইল, তবে, পূর্ব্বে, যখন হৃদয়ের বিরহ-সহন-ক্ষমতা অন্ততঃ কিছু ছিল, তখনই যাঁহার বিরহ সহিতে পারেন নাই, সহিতে কিছুতেই পারিবেন না ভাবিয়া, অরণ্যে অরণ্যে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, যাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইয়াছেন, আজ যদি তাঁহার—সেই রাম-চন্দ্রের বিরহ উপস্থিত হয়, তবে সীতার অবস্থা যে কি প্রকার হইবে, কি শোচনীয় দশায় সীতা পতিত হইবেন, দর্শকগণ তাহা একবার অনুমান করিয়া লউন, অচিরেই যাহা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইবেন, এখন তাহার জন্য প্রস্তুত হউন। আর সেই সঙ্গে সীতা-হৃদয়ের পরিচয় গ্রহণ করুন।

রামের এই শম-প্রধান উক্তির পর সীতার কোন কথাই আর সঙ্গত নহে, সঙ্গত হইতে পারে না। যদি সীতা এই স্থানে, রামের কথার উত্তরে কোন কথা কহিতেন, তবে তাহা রসাভিব্যক্তির তথা সীতা-প্রকৃতির ঘোর বিরোধী হইত। পুরুষপ্রধান রাম সামান্য কথা প্রসঙ্গে যে গভীর ভাব-সমুদ্রের তরঙ্গলীলা

প্রদর্শন করিলেন, রমণী-কুল-বরেণ্যা সীতার পক্ষে তাহার প্রতিপ্রদর্শন নারী-প্রকৃতির বিরুদ্ধ। তাই মহাকবি, সীতাকে কোন কথাই বলিতে দিলেন না। অথবা কেবল কি কথা বলিতে দিলেন না ? রামের ঐ কথায় সীতার মনের অবস্থা হয়ত আরও দুঃস্থ হইতে পারে ;—বিষয়ীর মনে শ্মশানবৈরাগ্যের ন্যায়, সীতাহৃদয়ে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য আরও বৈমনস্য জন্মিতে পারে ;—তাই কবি সীতাকে রামের উক্তিগুলি ভাল করিয়া ভাবিবার বা ভাবিয়া বুঝিবার অবসরও দিলেন না।

রামের কথা শেষ হইতে না হইতেই বৃদ্ধ কঞ্চুকী তথায় উপস্থিত হইলেন। কঞ্চুকী মহারাজ দশরথের সময়েও কঞ্চুকী ছিলেন। রাজকর্ম্মচারী হইলেও প্রাচীন্যে এবং চরিত্র-মাহাত্ম্যে তিনি সকলেরই সম্মানভাজন। বৃদ্ধ তিনি, তাঁহার সর্ব্বত্র অবাধ' গতি, অকস্মাৎ তাঁহার অভ্যুপাগমে রামসীতা—উভয়েই 'শশব্যস্ত' হইলেন। পিতার সময়ের প্রাচীন কর্ম্মচারীর প্রাপ্য সম্মানদানে ব্যগ্র হইলেন। কঞ্চুকী আসিয়াই চিরাচরিত পদ্ধতি ক্রমে, রামকে "রামভদ্র" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এই কয়েক দিন হইল রাম রাজা হইয়াছেন মাত্র, জন্মাবধি তাঁহাকে কৃতজ্ঞ কঞ্চুকী পুত্রবৎ দেখিয়া আসিতেছেন, এখনও পূর্ব্ব অভ্যাস একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাই 'মহারাজ' বলিয়া সম্বোধন করিবার পূর্ব্বেই অভ্যস্ত কণ্ঠ হইতে, সেই স্নেহপূর্ণ 'রামভদ্র' সম্বোধন নির্গত হইল। কথাটা বলিয়াই কঞ্চুকী বুঝিতে পারিলেন যে,— না, এসময়ের ইহা নহে। রাজমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ

রাখাই উচিত। কোন অবস্থাতেই রাজার সম্মানহানি করিতে নাই। কঞ্চুকীর মনে বিনয়লঙ্ঘন-জনিত আশঙ্কা জন্মিল,—তিনি অমনি নির্গত কথার প্রতিসংহার করিয়া পুনঃ সম্বোধন করিলেন 'মহারাজ!' অভিজাত বংশের সন্তান অন্যের আভিজাত্য গৌরব রক্ষা করিতেই সর্বদা সমুৎসুক, ধ্বংস করিতে কদাচ অভিলাষী হয়েন না। যিনি নিজে সম্মান্য, তিনি অন্যকেও সম্মান করিতে জানেন। দূরদর্শী কঞ্চুকী নূতন রাজা রামের সম্মানে তাই অত উৎসুক। বৃদ্ধ কঞ্চুকীর ব্যবহারে গুণাভিরাম রাম হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি সস্মিতবদনে কহিলেন "আর্য্য! আপনি আমার পিতৃদেবের পরিজন, আমাকে ত রামভদ্র বলিয়া ডাকাই আপনার সর্ব্বথা উচিত। তবে ওরূপ করিতেছেন কেন? চিরদিন যাহা বলিয়া আসিয়াছেন, আজও তাহাই বলিয়া ডাকুন।"

ভাবের কবি ভবভূতি, রামের হৃদয়-সমুদ্র যে অনন্ত ভাবরত্নে পরিপূর্ণ, তাহার একটি একটি রত্ন, ক্রমে, কেমন কৌশলে দর্শকদিগকে দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন!

কঞ্চুকী কহিলেন, 'ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে অষ্টাবক্র ঋষি আসিয়াছেন'—রাম এবং জানকী, শুনিয়াই, তাঁহাকে সত্বর অন্তঃপুরে আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। অষ্টাবক্র উপনীত হইয়া আসন পরিগ্রহ করিবার পর, তিনজনে নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিলেন। এমন সময়ে সীতা বলিলেন, "ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে গমনের পর, আমার গুরুজনবর্গ, আমাদিগকে কি স্মরণ করিয়া

থাকেন ?” প্রত্যুত্তরে অষ্টাবক্র কহিলেন, “দেবি ! স্মরণ করেন না ? ভগবান বশিষ্ঠ আপনার উদ্দেশে বলিয়াছেন যে, ভূত-ধাত্রী ভগবতী পৃথিবী তোমার জননী, সাক্ষাৎ প্রজাপতিকল্প রাজা জনক তোমার পিতা, আর স্বয়ং ভগবান সবিতা এবং আমরা যাঁহাদের গুরু, মা, তুমি সেই বরেণ্য নৃপতিগণের কুলবধূ, সুতরাং জগতে এমন আর কি কমনীয় আছে, যাহা দিয়া তোমাকে আশীর্বাদ করিব ? তবে এইমাত্র বলি, তুমি বীরপ্রসবিনী হইও। তুমি যেমন বীরের কন্যা, বীরের পুত্রবধূ, বীরের স্ত্রী, তেমন বীরের জননীও হইও১।” ভবভূতির এই কবিতা পাঠ করিবার কালে কালিদাসের রঘুবংশের কৌৎসরঘু-সংবাদ এবং শকুন্তলার মারীচ-দুষ্মন্ত-সংবাদ মনে পড়ে।

মহর্ষি বশিষ্ঠের আশীর্বাদবাণী রাম অবনতমস্তকে স্বীকার করিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র বীরপুত্রের পিতা হইবেন,—ভগবান বশিষ্ঠ এই আশীর্বাদ করিয়াছেন, এ ত আশীর্বাদ নহে, ইহা বর। রাম জানেন, মহর্ষিগণ যাহা বলেন, তাহা অসম্ভব হইলেও সম্ভব হয় ; তাঁহারা যে কথাই বলুন না কেন, সম্ভবা-সম্ভব-নিরপেক্ষ হইয়া অর্থ তাহার অনুসরণ করে। তাই রাম প্রসন্নহৃদয়ে কহিলেন,—“অনুগৃহীত হইলাম।” ক্রমে ঋষির

১—উত্তর-চরিত—বিশ্বম্ভরা ভগবতী ভবতীমসূত।
রাজা প্রজাপতি-সমো জনকঃ পিতা তে।
তেষাং বধূস্ত্বমসি নন্দিনি ! পার্থিবানাং
যেষাং গৃহেষু সবিতা চ গুরুর্বয়ঞ্চ ॥

সহিত রামের অনেক কথা হইল। কথাপ্রসঙ্গে রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঋষিবর! ভগবান্ বশিষ্ঠ যে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তাহা ত শুনিলাম, কিন্তু তিনি কি আমাকে কোন আদেশ করেন নাই?" অষ্টাবক্র অমনি বলিলেন—"করিয়াছেন বই কি, তিনি বলিয়াছেন, 'রাম, আমরা সকলেই একপ্রকার জামাতৃযজ্ঞে আবদ্ধ হইয়া দূরে রহিয়াছি, তুমি বালক, রাজ্যও নূতন, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে প্রজাদিগের অনুরঞ্জনে নিরত থাকিও। কেন না তোমাদের বংশ প্রজারঞ্জনের জন্য চিরবিশ্রুত। প্রজারঞ্জনে তোমাদের যে নির্ম্মল যশঃ অর্জ্জিত হইয়া থাকে, তাহা সকল ধনের সার, রাম, তোমাদের পরম সম্পদ্।"

রাম নিবিষ্টমনে গুরুদেবের আদেশ শ্রবণ করিলেন;—যে আদেশবাণী শুনিবার জন্য রঘুবংশপ্রদীপ রামচন্দ্র অষ্টাবক্রকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কুলগুরু বশিষ্ঠের সে আদেশ এতক্ষণে শুনিলেন। শুনিয়া বলিলেন,—"ভগবান বশিষ্ঠদেব যথার্থই বলিয়াছেন। প্রজারঞ্জনের জন্য আমার অকর্ত্তব্য বা অদেয় কিছুই নাই। স্নেহ, দয়া, সুখ, শান্তি,—অথবা অধিক কি, আমার জানকীকে পর্য্যন্তও যদি লোকের মনস্তুষ্টির জন্য আমাকে ত্যাগ করিতে হয়, তবে তাহাতেও আমি কুণ্ঠিত নহি।" সীতা শুনিলেন,—তাঁহার হৃদয়সর্ব্বস্বের বলিষ্ঠ-হৃদয়ের গভীর ধ্বনি, মধুর বংশীর ধ্বনির ন্যায়, আনন্দময়ী সীতার মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিল। তিনি অমনিই বলিলেন,—"এই জন্যই লোকে আমার আর্য্যপুত্রকে রঘুবংশের অলঙ্কার বলিয়া থাকে।"

রাম 'রাম,' তাই লোকের সেবার জন্য, 'জানকীকেও ত্যাগ করিতে পারি,' এতবড় কথা কহিতে পারিয়াছেন, আর সীতা 'সীতা,' তাই অতবড় কথা শুনিয়াও, জীবনসর্ব্বস্বের মুখে আপনার পরিত্যাগ-কল্পনা শুনিয়াও প্রিয়তম রামচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিতে পারিলেন। রামসীতার প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া লৌকিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে মনে হয়, এমন কথা বলিতে নাই। পারি-না-পারি, হউক-না-হউক, যাহা ভাবিতেও বুক ভাঙ্গিয়া যায়, হৃদয়-যন্ত্র শিথিল হইয়া পড়ে, নয়ন জড়তাময় হয়, তেমন কথা বলিতে নাই। মানুষ তেমন কথা বলিতে পারে না—ভাবিতে পারে না। রাম অতিমানুষ-প্রভাব-সম্পন্ন মহাত্মা, অমিতশক্তি মহাপুরুষ, শুধু সীতার হৃদয়ের নহে, তিনি তাঁহার নিজের হৃদয়েরও অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা, তাই অতবড় কথা বলিতে পারিলেন। সীতাকে সান্ত্বনা করিতে যাইয়া, কিছু পূর্ব্বে, রাম সেই অরণ্য-গমনের উল্লেখ করিয়াছিলেন। একবার অভিষেকের পূর্ব্বাহ্ণে রাম অযোধ্যানগরীকে অতল শোক-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া বনে গিয়াছিলেন, অনেকদিন পরে ফিরিয়াছেন, রাজা হইয়াছেন,—সীতা রাজমহিষী। আজ আবার হঠাৎ সেই রামের মুখে 'বনগমন'— এই শব্দ শুনিয়াই, সমাগত দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে একটা প্রবল আঘাত লাগিয়াছে। এ আবার কি কথা—ভাবিয়া সকলেই চমকিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তখনই, কুশল কবি, অষ্টাবক্রকে আনিয়া প্রসঙ্গান্তরে সেই অনভিপ্রেত আলাপ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আবার এখন এই কথা—

'সীতাকেও ত্যাগ করিতে পারি'—যাহা হইবার, বুঝি পূর্ব্ব হইতেই তাহার সূচনা আরম্ভ হয়।

স্নেহ, দয়া, সুখ, এসমস্ত অপেক্ষা সীতা রামের প্রিয়তমা। তাই রাম সকলের শেষে সীতার নাম করিয়াছেন। রামের জীবনের স্নেহ, দয়া, সুখ, এই তিনের সমষ্টিই যে জানকী, জানকীর জানকীত্ব যে কেবল স্নেহ, কেবল দয়া, কেবল সুখ ব্যতীত আর কিছুই নহে, ইহা রাম জানিতেন, জানিতেন বলিয়াই প্রথমে একটি একটি করিয়া মানবজীবনের প্রধান সম্পদ পরিত্যাগের কথা বলিয়া, শেষে সর্ব্বসম্পন্নময়ী জানকীর পরিত্যাগের কথা কহিলেন। দর্শকগণ অবাক্ হইলেন। এ কি কথা? কোথায় অষ্টাবক্রের সহিত আলাপ, কোথায় কি না সীতার পরিত্যাগবার্ত্তা। মহাকবি ভবভূতি, সুদক্ষ অশ্বপালক যেমন উদ্দাম অশ্বকে শকট-বহন-ক্ষম করিবার জন্য প্রথমতঃ নানাবিধ শিক্ষা দান করে, তদ্রূপ, দুঃসহ সীতা-নির্ব্বাসন-ব্যাপার প্রদর্শিত করিবার জন্য ক্রমে, দর্শকদিগকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

রামের এই কথায়, দর্শকবৃন্দ মর্ম্মবেদনায় চঞ্চল হইবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই মঞ্জুভাষিণী মৃদুহাসিনী জানকীর কথায় তাঁহারা আশ্বস্ত হইলেন। বুঝিলেন যে, না, ইহা সত্য সীতা পরিত্যাগ নহে—এ একটা প্রাসঙ্গিক কথামাত্র। এই প্রসঙ্গে মহাকবি, দর্শকগণের সম্মুখে, যে মহান, অনুপম, ত্রিজগদ্বন্দ্য আদর্শ চরিত্র উত্তোলন করিয়া ধরিলেন, জগতের

অন্য কোন জাতির কোন ভাষায় এমন আদর্শ বিরল। রাম যে কত অনন্ত শক্তির অধিপতি, রাম-হৃদয় যে কত বলিষ্ঠ, বিরাট্ রামচন্দ্রের হৃদয় যে কি মহা মহা উপাদানে গঠিত, দর্শকগণ, এই এক কথাতেই তাহা বুঝিয়া লইলেন। প্রজার সন্তোষবিধানের জন্য আত্মজীবনের চিরসন্তোষরূপিণী জনক-নন্দিনীকেও রাম পরিত্যাগ করিতে পারেন, পরের তুষ্টির জন্য, আত্মতুষ্টিকে অম্লানহৃদয়ে, চিরদিনের মত বিসর্জ্জন দিতে পারেন,—ভাবিয়া, সামাজিকগণের ভাবপ্রবণ হৃদয়, সূর্য্যের প্রতি সূর্য্যমুখীর ন্যায়, রামের প্রতি হেলিয়া পড়িল। ভক্তি ভরে সকলে রামচন্দ্রকে মনে মনে বন্দনা করিলেন। একটি কথার দ্বারা, কবি, কেমন করিয়া, তাহার অসংখ্য সামাজিক-দিগকে বিমুগ্ধ করিয়া লইলেন। মন্ত্রমুগ্ধ ব্যক্তিকে যেমন, যে দিকে ইচ্ছা লওয়া যায়, যাহা ইচ্ছা বলান যায়, সেই প্রকার, ভবভূতি তাঁহার সামাজিকদিগের হৃদয় এমনই বশীভূত করিলেন যে, সে হৃদয়ে এখন রাম-সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা, যেরূপ ইচ্ছা, ধারণা অঙ্কিত করিতে পারিবেন। দর্শকগণ আত্মবিস্মৃত হইয়া, কবির চিত্র দেখিতে লাগিলেন। রাম যখন—

স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥

বলিয়া পূজনীয় বশিষ্ঠের আদেশ-বাণী শিরোধারণ করিলেন, তখন সামাজিকগণের মনের অবস্থা যেরূপ হইয়াছিল, হৃদয়ে যে করুণ অথচ ভয়াবহ চিন্তার উদ্রেক হইয়াছিল, সেইরূপ অবস্থায়,

সেই প্রকার চিন্তা লইয়া সহৃদয় লোক অধিকক্ষণ থাকিতে পারেন না। উহাতে হৃদয় দমিয়া যায়। মন চিন্তা-বিমূঢ় হয়, মানুষ আত্মহারা হইয়া পড়ে। আর ওরূপ অকল্যাণকর প্রসঙ্গ যত সত্বর বিষয়ান্তরে প্রচ্ছাদিত হয়, মানুষের মন হইতে ওরূপ ভয়ানক বিষয়ের স্মৃতি পর্য্যন্তও যাহাতে সত্বর তিরোহিত হয়, তাহাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। সহিষ্ণুতার একটা শেষ আছে, সকল বিষয়েরই একটা সুনিয়ত সীমা আছে; রাজপদে অভিষিচ্যমান গুণাভিরাম রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণ ও রাজলক্ষ্মীরূপিণী জানকীর সহিত বনে পাঠাইয়া অযোধ্যাবাসিগণ, সহিষ্ণুতার সে সুনিয়ত সীমা এক প্রকার লঙ্ঘন করিয়াছিল। রামের শোকে তাহারা আকুল হইয়াছিল। সকল থাকিতেও এক রামের অভাবে, তাহারা যেন অনাথ হইয়াছিল। আজ সেই রামের সুদিন আসিয়াছে, অথবা শুধু রামের কেন? রামের সুদিনের সঙ্গে সঙ্গে রামরাজ্যের প্রজা-পুঞ্জেরও সুদিন আসিয়াছে। আজ এই শুভদিনে রামের মুখ দিয়া যে বাগ্‌বজ্র নিপতিত হইল, তাহা সহ্য করিবার শক্তি অযোধ্যার প্রজাবৃন্দের আর নাই, রামসীতাকে বনে পাঠাইয়া তাহারা তাহাদের হৃদয়ের সমস্ত সামর্থ্যটুকু ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছে, অমন দুর্ঘটনা যদি আবার ঘটে, তবে তাহারা আর তাহা সহিতে পারিবে না। তাই বলিতেছিলাম, ওরূপ ভয়ানক প্রসঙ্গ যত সত্বর বিস্মৃত হওয়া যায়, ততই মঙ্গল। তাই কবি, রামের মুখ দিয়া ঐ সীতা-পরিত্যাগ-বাণী নিঃসৃত হইতে না হইতেই তথায় লক্ষ্মণকে উপস্থাপিত করিলেন। অকস্মাৎ কুমার লক্ষ্মণের আগমনে

সকলেই আনন্দিত হইলেন। রাম স্বকীয় চরিত্রমাহাত্ম্যে যেমন সকলের পূজ্য, কুমার লক্ষ্মণও তদ্রূপ স্বীয় অনুপম চরিত্র-মাধুর্য্যে অযোধ্যাবাসীর হৃদয়ের ধন, আনন্দের নিদান। রঙ্গমঞ্চে রামসীতা আসিয়াছেন, দর্শকগণ তাঁহাদের চিরধ্যেয় রামসীতার পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া, রামসীতার লোকাতিশায়িনী বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, এতক্ষণে লক্ষ্মণের আগমনে সেই পূর্ণ পরিতৃপ্তি সুসম্পূর্ণ হইল। কৃষ্ণ কাদম্বিনীর অপসারণে, ভুবন-মোহন সুধাংশুর কিরণমালায় যেমন অন্ধকারময় জগৎ ঝটিতি হাসিয়া উঠে, তদ্রূপ প্রসন্নমূর্ত্তি কুমার লক্ষ্মণের অকস্মাৎ আগমনে, দর্শকগণের হৃদয় হইতে সেই রামোচ্চারিত বিভীষিকা বাণীর কঠোর প্রতিধ্বনি তিরোহিত হইল; হৃদয়ের অন্ধকার দূর হইল। রামসীতার সহিত, সামাজিকগণও সহাস্যবদনে কুমার লক্ষ্মণকে অভিনন্দিত করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

প্রলয়ের সূচনা।

প্রসন্নমূর্ত্তি কুমার লক্ষ্মণের জীবনের প্রধান ব্রতই ছিল রামসীতার পরিচর্য্যা। যখন 'ক্রূর-নিশ্চয়া' কৈকেয়ীর চক্রান্তে রামচন্দ্র বনে গমন করেন ও সাধ্বী দেবীপ্রতিমা সীতা তাঁহার সহচারিণী হয়েন, এবং লক্ষ্মণও অগ্রজের অনুসরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া, মাতা সুমিত্রাদেবীর চরণপ্রান্তে অনুমতি ভিক্ষা করেন, তখন জননী সুমিত্রা লক্ষ্মণেরই জননীর ন্যায় বলিয়াছিলেন—

রামং দশরথং বিদ্ধি বিদ্ধি মাং জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথা সুখং।

জননীর আদেশ সুশীল লক্ষ্মণ প্রাণের সহিত গাঁথিয়া লইলেন। তিনি সুমিত্রার আত্মজের ন্যায়, যথার্থই রামকে পিতার তুল্য এবং জানকীকে মাতার তুল্য জ্ঞান করিতেন।

রামসীতার সেবা, রামসীতার চিত্তপ্রসাদন, রামসীতার আদেশ প্রতিপালন—লইয়াই যেন লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণের ন্যায় দেব-চরিত্র অনুজ এবং সীতার ন্যায় আত্মচ্ছায়াসদৃশী ভার্য্যা পাইয়াছিলেন বলিয়াই, রাম অক্লেশে বনবাস-লাঞ্ছনা পরমসুখবোধে ভোগ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ এবং সীতাবিহীন রাজ্য রামের পক্ষে গহন-অরণ্যকল্প, লক্ষ্মণ এবং সীতার সহিত থাকিতে পারিলে গহন বনও সুসমৃদ্ধ নগরীর তুল্য। ইন্দ্রত্বের বিনিময়েও তাদৃশ ভ্রাতা এবং তাদৃশী ভার্য্যা প্রার্থনীয়। যেমন সংসারের শান্তি-

রূপিণী রমণীদিগকে বিমল পাতিব্রত্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে পতিব্রতা জানকী ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, মনে হয় সেইরূপ, জগতে অনুপম সৌভ্রাত্রধর্ম্ম উপদেশ দিবার জন্যই বুঝি সুশীল লক্ষ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দিগ্‌দর্শনযন্ত্রের শলাকা যেমন সতত উত্তরমুখীই থাকে, কোন অবস্থাতেই তাহার বিপর্য্যয় হয় না, কুমার লক্ষ্মণের হৃদয়ও তদ্রূপ নিয়ত রামসীতার পরিচর্য্যায় তৎপর, কোন সময়েই তাহার অন্যথা ঘটে না। যেন কোন বৈদ্যুতী শক্তির প্রভাবে, লক্ষ্মণ জানিতে পারেন যে, রাম-সীতার হৃদয় কখন কি চায়, কখন কি ভাবে।

রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বনবাসে অনেক যাতনা, অনেক বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেই যাতনা-বিড়ম্বনার মধ্যে যে সুখ পাইয়াছিলেন, যে সমস্ত নয়নতর্পণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছিলেন, তাহারও তুলনা নাই। আজ সম্পদের দিনে রামের মনে সেই সৌন্দর্য্যরাশির কথা উদিত হয়। সৌন্দর্য্যদর্শন করা এক কথা, আর জগতে যাহাদিগকে লইয়া 'আমি,' যাহাদিগকে বাদ দিলে আমার 'আমিত্ব'টুকু খুঁজিয়া পাই না, তাহাদিগের সঙ্গে সৌন্দর্য্যদর্শন আর এক কথা। যখন হৃদয় বাঞ্ছিত-বিরহের প্রবল হুতাশনে দাউ দাউ জ্বলিতে থাকে, তখন জগতের তাবৎ সুন্দর বস্তুই অসুন্দরতম বলিয়া মনে হয়। নয়নরঞ্জন সুধাংশু তখন, দুর্নিরীক্ষ্য মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অনুমিত হয়েন। আবার প্রিয়-সমাগমে অতি অসুন্দরকেও সুন্দর বলিয়া মনে হয়। আর যাহা সুন্দর, তাহার সৌন্দর্য্যও শতগুণ বর্দ্ধিত হয়। রাম

যখন বনে ছিলেন, তাঁহার জীবনের প্রধান অবলম্বন সীতা এবং লক্ষ্মণ তখন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। প্রকৃতির লীলানিকেতন জনস্থানের নিসর্গসুন্দরী ছবি, তিনি, সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া দেখিয়াছেন। পরিপূর্ণ প্রাণে গহন অটবীর পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া কত আনন্দ পাইয়াছেন। জীবনে তেমন দিন আর আসিবে না। ওরকম দিন একবার বই দুইবার আসে না। জীবনের প্রকৃত শুভক্ষণ বড়ই অল্পকালস্থায়ী। যাঁহারা সেই চপলা-চঞ্চল শুভক্ষণ পাইয়া, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, বিধাতার সেই অনুগ্রহ-দান অঞ্জলি পাতিয়া গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন, তাঁহাদেরই জীবনে চরিতার্থতা জন্মে, তাঁহারাই ধন্য ও কৃতকৃত্য হয়েন। আর যাঁহারা জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ হেলায় অতিবাহিত করেন, দিনমানে কৌমুদী অন্বেষণের ন্যায়, তাঁহাদিগকে সারা জীবন, শেষে, ঐ শুভমুহূর্ত্ত স্মরণ করিয়া পশ্চাত্তাপে দগ্ধ হইতে হয়। রাম, তদীয় জীবনের সেই শুভ-মুহূর্ত্তে জনস্থানের শ্যামায়মানা অরণ্যানীর, বীচিমালিনী তটিনীর, এবং নীলস্নিগ্ধশিখরমালাবিমণ্ডিত পর্ব্বতরাজির—যে সমুদয় চিরস্মরণীয় অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলেন,—আজ সম্পদের দিনে—অথবা সেই সময়ের তুলনায় এই বিড়ম্বনাময় সংসারের দুঃখের দিনে, সেই সকল অনবদ্য, হৃদয়াঙ্কিত মূর্ত্তি বার বার মনে পড়িয়া থাকে, আবার দেখিতে ইচ্ছা করে। তখন জানকীকে লইয়া যাহা দেখিয়াছেন, এখন জানকীকে লইয়া আবার তাহাই দেখিতে বাসনা হয়। তখন জানকীকে হারাইয়া, যাহা

যাহা দেখিয়াছেন, যেমন যেমন করিয়াছেন, আজ জানকীকে লইয়া, তাহা দেখিতে এবং সেই সেই অবস্থার কথা ভাবিতে ও আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা হয়। পূর্ণতার সময়ে অপূর্ণতার বিষয়, জীবনের সেই বিষাদের বিষয় কার না চিত্তে ভাসিয়া থাকে? কোন্ যুবক বাল্যের কথা বা কোন্ প্রৌঢ় যৌবনের কথা এবং কোন্ বৃদ্ধ প্রৌঢ়ত্বের কথা চিন্তা না করেন? জীবনের অতীত কাহিনী চিন্তা করিয়া, কখন হর্ষে কখন বিষাদে কে না নিমগ্ন হয়েন? তাই রামের ইঙ্গিতক্রমে, সুবুদ্ধি লক্ষ্মণ, তাঁহাদের সেই অরণ্যবাসের ঘটনাবলীর এবং তৎতৎ বনবাস-স্থলীর চিত্র প্রণয়ন করিতে, চিত্রকরকে অনুমতি করিয়াছিলেন। রাজ-চিত্রকর, সৌন্দর্য্যদর্শনপটু লক্ষ্মণের মুখ হইতে শুনিয়া শুনিয়া, একখানি সুন্দর আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছে। লক্ষ্মণ সেই আলেখ্যখানি লইয়া, ধীরে রামসীতার সমীপে আসিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন। রাজপুরী একপ্রকার জন-শূন্য, ছিলেন জনক, তিনিও আজ চলিয়া গিয়াছেন, তাই কঠোর-গর্ভা জানকী যার-পর-নাই বিমনা; হয়ত চিত্রদর্শনে তাঁহার অসুস্থ হৃদয় কথঞ্চিৎ সুস্থ হইবে,—এই ভাবিয়া চিত্তপ্রসাদনপটু লক্ষ্মণ আলেখ্য লইয়া আসিয়াছেন। রাম আলেখ্যহস্ত লক্ষ্মণকে দেখিয়াই বুঝিলেন, এবং স্নেহপূর্ণকণ্ঠে কহিলেন,—"লক্ষ্মণ, দুর্ম্মনায়মানা দেবী জানকীর চিত্ত-বিনোদন করিতে তুমিই জান। এই চিত্রে আমাদের অতীত জীবনের কতদূর পর্য্যন্ত অঙ্কিত হইয়াছে?"—

অভিনয়দর্শনার্থিগণ যেন হাতে চাঁদ পাইলেন। রামসীতা-লক্ষ্মণের সেই বিশ্ব-বিশ্রুত বনবাস-বৃত্তান্তের চিত্রাবলী আজ রাম-সীতা-লক্ষ্মণেরই সম্মুখে, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, এই ভাবনাতেও তাঁহাদের শরীর আনন্দ-পুলকিত হইল। বনবাসের কত অদ্ভুত কিংবদন্তী জনাননে এবং গোষ্ঠীবন্ধনে কত নূতন নূতন আকারে বেড়াইতেছিল, অযোধ্যাবাসিগণের কত কৌতূহল জন্মাইতেছিল, আজ সেই সকল জনশ্রুতির প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইবে। সেই ক্রমবর্দ্ধিত কৌতূহলের চরিতার্থতা ঘটিবে। তাই সামাজিকগণের অতুল আনন্দ। মহাকবি, কেমন কৌশলে, তাঁহার দম্ভ-প্রবণ বিদর্ভ-বাসি-বৃন্দের হৃদয়, আপন মনের মত ছাঁচে ঢালাই করিয়া লইলেন। উত্তরোত্তর কৌতূহল-বৃদ্ধিই নাটকের জীবন। যে নাটক দর্শকের কৌতূহল ক্রমে বর্দ্ধিত করিতে না পারে, তাহা উত্তম নাটক নহে। যেমন অভিনেয় বিষয় এবং অভিনেতৃ-বৃন্দ দৃশ্যকাব্যের প্রধান অঙ্গ, সেইরূপ অভিনয়-দিদৃক্ষু সামাজিকগণও উহার অন্যতম অঙ্গ। অনুরক্ত সামাজিক ব্যতীত দৃশ্যকাব্যের চরম চরিতার্থতা জন্মিতে পারে না। সুতরাং কাব্যরচয়িতাকে প্রতিপদে নাটকের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায়, সামাজিকদিগের অনুরাগোৎপত্তির প্রতিও নিয়ত সাগ্রহ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে স্থলে কবির এই দৃষ্টি যত প্রখর, তথায় নাটকের সার্থকতা তত বহুল। মহাকবি ভবভূতির অপার নৈপুণ্য ছিল, তিনি এই চিত্রদর্শনচ্ছলে তাঁহার বীরচরিত এবং মালতীমাধবে বিরক্ত সামাজিকদিগকে এবার

একান্ত অনুরক্ত করিয়া লইলেন। পূর্ব্বে বহু চেষ্টা করিয়াও সামাজিকগণের যে বিরাগজ্বর বিচ্ছেদ করিতে পারেন নাই, এবার এই চিত্রদর্শনরূপ 'চিন্তামণির' প্রয়োগে তাহাকে দূরীভূত করিয়া, সুস্থ সামাজিকদিগের মন নিজের হাতের মধ্যে করিয়া লইলেন। ইহার পর হইতে, সেই মন, কবি, যখন যে দিকে ইচ্ছা, ঘুরাইতে ফিরাইতে লাগিলেন। যাদুকরের ন্যায় সেই মন লইয়া কত খেলা খেলাইতে লাগিলেন। ইহা কবিশক্তির পরাকাষ্ঠা। নির্ম্মাণ-দক্ষতার চরম উৎকর্ষ।

'আমাদের অতীত জীবনের কতদূর চিত্রিত হইয়াছে?'— রামের এই প্রশ্নে কুমার লক্ষ্মণ কহিলেন—'আর্য্য! জানকীর অগ্নিপরিশুদ্ধি পর্য্যন্ত।' রাম শুনিলেন, তাঁহার বক্ষঃস্থল যেন শতধা চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। রাম যে কিরূপ সীতাময়-জীবিত, তাহা সীতা যেমন জানিতেন, তেমনি, সীতা যে কি প্রকার পবিত্র-চরিত্রা, পাপ-লেশ-বিমুক্তা ও পতিব্রতা ললনাদিগের শীর্ষস্থানীয়া, তাহাও রাম জানিতেন। কোন দিন, এক নিমিষের জন্যও রামের মনে সীতার চরিত্র-সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ-লেশ জন্মে নাই। শারদ-কৌমুদী-বৎ নির্ম্মল জানকী-চরিত্রের সুস্নিগ্ধ ও সুবিমল ছায়ায় রামের জীবন যে কি পরিমাণে পরিতৃপ্ত ছিল, তাহা জগতের আর কেহ অনুমানও করিতে পারিতেন না। অত সুখ অত শান্তি বুঝি সংসারে কাহারও ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই, আর ঘটিবে না। এতাদৃশী দেবীকেও অনলে বিশোধন করিয়া লইতে হইয়াছিল, সীতাময়প্রাণ রাম

তাঁহার এমন সীতাকেও, ধর্ম্মতঃ না হউক, লোকতঃ অবিশ্বাস করিয়াছিলেন,—ভাবিয়া সীতা-পার্শ্ববর্ত্তী রামচন্দ্রের পরম সঙ্কোচ বোধ হইল। প্রসাদপ্রতিমা জানকী নির্ব্বাক্ হইয়া স্বামী ও দেবরের এই কথোপকথন শুনিতেছেন। যখন লঙ্কানগরীতে, সীতাকে অনলে পরীক্ষা করিবার কথা রাম বলিয়াছিলেন, সে এক দিন, আর এখন এ আর এক দিন। সীতাহারা হইয়া, নানাবিধ যুদ্ধবিগ্রহে, রাম অনেক দিন একপ্রকার শূন্যহৃদয়ে কাল কাটাইয়াছেন; বহুকাল পরে, অকস্মাৎ "রক্ষোভবনোষিতা" সীতার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর, তাই রাম তখন ঐ অনল-পরীক্ষার কথা বলিতে পারিয়াছিলেন, রামের সীতাবিহীন হৃদয়ের কঠোরতা তখনও প্রচুর ছিল। তাই রাম অম্লানমনে ঐরূপ অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা করিয়া বসিয়াছিলেন। আজ আর রামের সে কঠোরতা নাই, স্থিরশান্তিরূপিণী জানকীর সংসর্গে আজ রামের হৃদয় কোমল,—কুসুম অপেক্ষাও কোমলতর। তাই আজ সেই পূর্ব্বকৃত অগ্নিপরীক্ষার কথার আলোচনাতেও রাম ব্যথিত, লজ্জিত, ততোধিক অপরাদ্ধ। তাই রাম, লক্ষ্মণের মুখ হইতে 'আর্য্যার অগ্নিপরিশুদ্ধি পর্য্যন্ত'—এই কথা বাহির হইতে না হইতেই বলিয়া উঠিলেন, 'ক্ষান্ত হও, লক্ষ্মণ, ক্ষান্ত হও; নিজের জন্মের দ্বারা যিনি জগতে পবিত্রতমা হইয়াছেন, সেই অযোনিসম্ভবার পবিত্রতা পরীক্ষা করিতে পারে, জগতে এমন কি পাবন পদার্থ আছে? লক্ষ্মণ, যেমন তীর্থবারি এবং বহ্নি স্বয়ং পবিত্র পদার্থ, তদ্রূপ আমার জানকীও

স্বয়ং পবিত্র রমণী[১]।' লজ্জিত রামের হৃদয়ে এই আলাপ-পরম্পরায় ক্রমে লজ্জার সহিত পশ্চাত্তাপ উদিত হইল। তখন অনুতপ্ত রঘূত্তম, সৌরকুল-লক্ষ্মী সীতার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"দেবি! দেবযজন-সম্ভবে! আমার এই অবুদ্ধিকৃত-কার্য্যের ফল তোমাকে চির-জীবন ভোগ করিতে হইবে। তুমি যতদিন ধরাতলে থাকিবে, এই অগ্নি-বিশোধন-প্রবাদও ততদিন বিদ্যমান রহিবে। সীতে! মানবসমাজ নানাবিধ কষ্টের হেতু, কিন্তু তথাপি মানবরঞ্জনরূপ-কুলকীর্ত্তি-রক্ষণই যাঁহাদের জীবনের মুখ্য ব্রত, তাঁহাদের তাদৃশ কষ্টহেতু মানবসমাজেরও আরাধনা করিয়া চলিতে হয়। সুতরাং দেবি! আমি লোকাপবাদ-পরিহারবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, সেই অগ্নিপরিশুদ্ধিকালে তোমার প্রতি যে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম, বিলক্ষণ বুঝিতেছি, তাহা কোনক্রমেই তোমার ন্যায় সাধ্বী ললনার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। লোকে সুরভি প্রসূনকে আদর করিয়া মস্তকেই স্থান দেয়, ইহাই স্বাভাবিক, চরণের দ্বারা কোন্ মূর্খ তাহাকে বিমর্দ্দিত করিয়া থাকে? সীতে! আমি তাহাই করিয়াছিলাম[২]।" সীতা তাঁহার ব্যথিত হৃদয়েশ্বরের অনুতাপ-

---

১—উত্তর-চরিত—উৎপত্তি-পরিপূতায়াঃ কিমস্যাঃ পাবনান্তরৈঃ।
তীর্থোদকঞ্চ বহ্নিশ্চ নান্যতঃ শুদ্ধিমর্হতঃ॥

২—উত্তর-চরিত—কষ্টোজনঃ কুলধনৈরনুরঞ্জনীয়স্তন্ মে বদুক্তমশিবং নহি তৎ ক্ষমং তে।
নৈসর্গিকী সুরভিণঃ কুসুমস্য সিদ্ধা মূর্দ্ধি স্থিতি র্ন চরণৈরবতাড়িতানি।

বিধুর মুখচ্ছবি দর্শনে মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া যাইতেছিলেন,—আর সেই সঙ্গে, আপন হৃদয়-দেবতার মুখে আপনার চরিত্র সৌভাগ্যের স্তুতি শ্রবণে মনে মনে স্বীয় নারীজন্ম সার্থক জ্ঞান করিতেছিলেন।

বিনয়ভূষণা জানকীর অন্তঃকরণ, রামের এই উক্তিপরম্পরায় যে কীদৃশ প্রীতিপূর্ণ ও কি অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিমুগ্ধ হইয়াছিল, তাহা শব্দ-বিদ্যা-পারদর্শী মহাকবি ভবভূতিও শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করিতে প্রয়াস করেন নাই। এমন অনেক স্থল আছে, এমন অনেক সময় আছে, যেখানে কথা বলা অপেক্ষা কথা না বলাই অধিক সুন্দর। শব্দ অন্তঃস্থিত ভাবের জ্ঞাপক। যে স্থলে অন্তঃকরণের ভাব অসীম, অতুল, অনির্ব্বচনীয়, সেখানে পরিমিত শব্দের সাহায্যে তাহার প্রকাশ কি প্রকারে সম্ভবপর? তথায় সে চেষ্টা বৃথা, সে চেষ্টায় তথায় ভাবের স্ফুরণ হওয়াত দূরের কথা, প্রত্যুত ভাবের অভাব অথবা একেবারে ধ্বংসই হইয়া যায়। এই জন্যই, অনেকস্থলে, যেখানে মানুষে মানুষে নহে, মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে কথাবার্ত্তা হয়, তথায় অনেক সময়ে, সশব্দ কণ্ঠ অপেক্ষা অশব্দ দৃষ্টি অধিক মনোজ্ঞ, হইয়াও থাকে তাহাই। যে স্থলে শব্দের ক্ষমতা ক্ষীণ হইয়া আইসে, তথায় নয়নের ক্ষমতা, দৃষ্টির শক্তি উপচিত হয়। সেই সকল স্থলে কথা বলা অপেক্ষা নীরবতাই সুন্দর। সরব কণ্ঠ অপেক্ষা নীরব কণ্ঠ তথায় ভাবসম্পদের সমধিক দ্যোতক। তাই এই স্থলে প্রীতিময়ী জনকনন্দিনী তাঁহার চিরধ্যেয় পরমদেবতার প্রশস্তি-বাক্যের

কোনই উত্তর দিলেন না। আর ও প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি না হয়, হৃদয়েশ্বর তাঁহার গুণগাথার সঙ্গীত আর না করেন, এই আশয়ে সীতা বলিলেন, "থাক্, আর্য্যপুত্র থাক্, আসুন আলেখ্য দর্শন করি।" এই বলিয়া রামের সহিত উঠিয়া অগ্রসর হইলেন।

উত্তর চরিতের প্রারম্ভ ভাগের এই সকল অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, অমর কালিদাসের বিজয়-স্তম্ভ অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের প্রারম্ভ ভাগ মনে পড়ে। শকুন্তলানাটক খুলিয়াই যেমন দেখিতে পাই, তাহাতে প্রথম হইতেই বিস্মৃতির প্রাধান্য, রাজা দুষ্মন্ত যে বিস্মৃতির অমোঘ শক্তিতে আত্ম-বিমূঢ় হইয়া, কণ্বদুহিতা শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই বিস্মৃতি যেমন নাটকের সূচনা হইতেই সামাজিকের মনে ক্রমে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, তদ্রূপ, উত্তরচরিতেও দেখি, প্রথম হইতেই, প্রাকৃত জনের মনে সাধ্বী ললনার চরিত্রে সন্দেহ, এবং ক্রমে, বন-গমন ও সীতার পরিত্যাগ-বৃত্তান্ত, বার বার নানা-প্রসঙ্গে ঘুরিয়া ফিরিয়া আলোচিত হইতেছে। সামাজিকগণের হৃদয়ক্ষেত্র, সীতানির্ব্বাসনরূপ বিষতরুর বীজ বপনের যোগ্য করিবার জন্য, যেন প্রথম হইতেই প্রযত্ন হইতেছে। অনতি-বিলম্বেই, অলীক লোকাপবাদ নিবন্ধন, সাধ্বী জানকীকে নির্ব্বাসিত করিয়া, রামচন্দ্র অযোধ্যায় যে মহাপ্রলয় সংঘটন করিবেন, সেই মহাপ্রলয়ের সূচনা করিয়া দিবার নিমিত্তই যেন মাঝে মাঝে এই সকল উল্কাপতন হইতেছে, দিগ্‌দাহ হইতেছে। সীতার চরিত্রে সম্পূর্ণভাবে নিঃসন্দিগ্ধ থাকিয়াও, পরচিত্ত-বিনোদ-

প্রয়াসী রাম লঙ্কায় সীতার যে অগ্নিপরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা যে অতীব গর্হিত কার্য্য হইয়াছে, সীতার ন্যায় নারীকুলদেবতার অসদৃশ হইয়াছে, এ কথা সেই রামই নিজমুখে বারবার স্বীকার করিতেছেন। রামের কথাতেই সামাজিকগণ বুঝিতেছেন যে, এরূপ একটা ব্যাপার, সীতার সম্বন্ধে এ প্রকার একটা সম্পূর্ণ অদ্ভুত ব্যাপার রাম করিয়া বসিয়াছিলেন। সামাজিকগণ আরও ভাবিতেছিলেন যে, যাহা হইবার হইয়াছে, যাহার শেষ ভাল, তাহার সবই ভাল, রামসীতার পুনর্ম্মিলন হইয়াছে, সীতা অগ্নি-পরীক্ষায় বিশুদ্ধ হইয়া অনল-বিশুদ্ধ হেমের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, সব দিক রক্ষা হইয়াছে, ও প্রসঙ্গ এখন বিশ্রান্ত হইলেই মঙ্গল। "কথাপি খলু পাপানাং অলমশ্রেয়সে যতঃ" অসতের প্রসঙ্গও অমঙ্গলজনক।

অষ্টম অধ্যায়।

চিত্রদর্শন।

সুশীল লক্ষ্মণ ধীরে আলেখ্যখানি খুলিয়া কহিলেন—'এই সেই আলেখ্য।' সীতা স্থিরনেত্রে তাহা দেখিতে লাগিলেন। কত কি তাহাতে চিত্রিত ছিল,—শৈশবে রামচন্দ্র, দুরন্ত রাক্ষসী তাড়কাকে নিধন করিয়াছিলেন, তাই প্রসন্ন হইয়া, মহর্ষি বিশ্বামিত্র, রামকে তাঁহার বিশ্ববিজয়ের প্রধান অস্ত্র দিব্যাস্ত্র দান

করিতেছেন—চিত্রিত ছিল। পতিদেবতা সীতার নয়নে চিত্রের এ অংশ বড়ই মধুর লাগিল। ক্রমে দেখিতে দেখিতে, মিথিলা-বৃত্তান্ত উপস্থিত হইল। সদ্যঃপ্রস্ফুটিত নবনীলোৎপলদলবৎ স্নিগ্ধ শ্যামল দেহের কান্তিতে দশদিক আলোকিত করিয়া, রামচন্দ্র অনায়াসে হরধনুঃ ভঙ্গ করিতেছেন, রাজর্ষি জনক বিস্ময়-স্তিমিত-নেত্রে চিরসুন্দর রামের প্রসন্ন-কোমল মুখখানির দিকে চাহিয়া আছেন, রামের পার্শ্বে ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন বিরাজমান, নাতিদূরে, লজ্জাবনতমুখী বধূবেশা সীতা, মাণ্ডবী, উর্ম্মিলা এবং শ্রুতকীর্ত্তি উপবিষ্টা—চিত্রিত ছিল,—সীতা অনিমেষ-নয়নে ও আনন্দ-তন্দ্রালস-মনে এই চিত্রখানি দেখিতে লাগিলেন,—দেখিতে দেখিতে তিনি বর্ত্তমান ভুলিয়া গেলেন, এই চিত্র তাঁহাকে অতীতের সেই স্থানে লইয়া গেল। তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, 'আহা! মনে হইতেছে, বুঝি সেই মিথিলার সেই বিবাহকাল আবার ফিরিয়া আসিয়াছে; আমি যেন সেই বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইয়াছি।' জীবনের অতীত কাহিনী ভাবিতে ভাবিতেই, অনেক সময়ে লোকের হৃদয়ে, কত ভাব, কত পুরাণ কথা, কত ঘটনা জাগিয়া তাহাকে আকুল করে, আর যদি সেই কাহিনীর কোন জীবন্ত চিত্র কেহ দেখিতে পায়, তবে তাহার হৃদয়ের যে কি অবস্থা ঘটে, তাহা সহৃদয়-হৃদয় ব্যতীত অন্যের অবোধ্য। শৈশবে বা কৈশোরে,—যখন সংসারের কোন জটিল ভাবনায় বা জ্বালা-যন্ত্রণায় হৃদয় বিড়ম্বিত, ব্যাহত এবং কলুষিত হইতে পায় না, যখন সংসারের সর্ব্বত্রই

আনন্দের লহরী ভাসিয়া বেড়ায়, জগৎ অদৃষ্টপূর্ব্ব মনোমোহন ভূষায় বিভূষিত হইয়া, নয়নে নিত্য নূতন ছবি প্রতিভাত করে,—পরিণতবয়সের তাপক্লান্ত কোন্ মানব, ক্ষণেকের জন্য তখনকার,—সেই অতীত জীবনের সেই ছবি মানসনেত্রে একবার না দেখিয়া থাকে, বা না দেখিতে চায় ? কে এমন নিষ্ঠুর, যে জীবনের সেই প্রভাত-সৌন্দর্য্য চিন্তা করিয়া আপনার বৃশ্চিকদষ্ট হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করিতে না চায় ? আর যদি সত্য সত্যই সে সময়ের যথাযথ প্রতিকৃতি, কোন নিপুণ ভাস্কর চিত্রিত করিয়া দেখাইতে পারেন, তবে কে এমন আছেন, যিনি তাহা দেখিয়া, বর্ত্তমান ভুলিয়া, অথবা ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, বর্ত্তমানকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া, অতীতের সেই মোহনচিত্র দেখিতে দেখিতে স্বপ্নাবিষ্টবৎ না হয়েন ? তাই আজ রামসীতা তাঁহাদের সেই বাল্যের এবং কৈশোরের ছবি দেখিতে দেখিতে একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছেন। সেই মিথিলা, সেই বিরাট্ রাজন্যসভা, সেই শুভ লগ্ন, জীবনের সেই প্রধান অভ্যুদয়রূপী হরধনুর্ভঙ্গ, সেই বরবধূর নিরাবিল হৃদয়ের আশার বিদ্যুৎ, হর্ষের নির্ঝর,—সেই পরস্পরের করগ্রহণ,—না—না, করগ্রহণ নহে, করগ্রহণচ্ছলে উভয় কর্ত্তৃক উভয়ের জীবনগ্রহণ, অথবা জীবনসর্ব্বস্বের গ্রহণ—প্রভৃতি কত কথা আজ রামসীতার হৃদয়ে যুগপৎ উদিত হইতেছিল।—সাগরবক্ষে যেমন তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, তাহার উপর তরঙ্গ, তাহার উপর তরঙ্গ উত্থিত হইয়া নীল-বারিধিকে আকুল করিয়া তুলে, তদ্রূপ, আজ রামসীতার হৃদয়ে একটি ভাব

উঠিতে না উঠিতেই তাহার উপর আর একটি ভাব, আর একটি ভাব উঠিয়া উঠিয়া, উভয়কে একেবারে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। যে সকল কথা, যে সকল ঘটনা, পরস্পারের যে সকল প্রণয়গীতিকা অনেকদিন ভুলিয়া গিয়াছেন, আজ সেই সকল মনে পড়িতে লাগিল। প্রৌঢ়ের প্রসন্নগম্ভীর হৃদয়, আজ আবার সেই নবাগত সখা যৌবনের মুগ্ধ-সুন্দর, কেবল সুন্দর আকার ধারণ করিল। হেমন্তের আকাশে শরতের চাঁদ হাসিয়া উঠিল। সীতার হৃদয়ের যে ভাব, রামের হৃদয়েও সেই ভাবই জাগিতেছিল। এক মন্ত্রেই যেন উভয়ে বিমুগ্ধ হইতেছিলেন,—দুই হৃদয় যেন ক্রমে এক হৃদয়ে পরিণত হইতেছিল, মিশিয়া যাইতেছিল। তাই রাম জানকীর করকিশলয় ধারণ করিয়া বলিলেন,—"সীতে! যথার্থ বলিয়াছ, তোমার এই কোমল করপল্লব বিবাহের মঙ্গলাভরণ কমনীয় কঙ্কণে বিভূষিত ছিল, আর মহর্ষি শতানন্দ, মূর্ত্তিমান মহোৎসবের ন্যায় তোমার এই করপদ্ম আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, আমি আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছিলাম,—জানকি! আজ সেই সব একে একে মনে পড়িতেছে, বোধ হইতেছে যেন সেই দিন, সেই ক্ষণ, সেই সব ফিরিয়া আসিয়াছে,—সেই সময়েই বর্ত্তমান রহিয়াছি।"—সীতার হৃদয়ের ধ্বনি যেন রামের হৃদয়ে প্রতি-ধ্বনিত হইল।

লক্ষ্মণ আলেখ্যের অন্য অংশে অঙ্গুলিসংযোগপূর্ব্বক কহি-লেন, 'ইনি আর্য্যা, ইনি আর্য্যা মাণ্ডবী, আর ইনি বধূ শ্রুতকীর্ত্তি।'

সুশীল লক্ষ্মণ ইচ্ছাপূর্ব্বক, চিত্র-মধ্যবর্ত্তিনী উর্ম্মিলার নাম উল্লেখ করিলেন না। কিন্তু কৌতুকপ্রিয়া জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃ-জায়া সীতা দেবর লক্ষ্মণের এ বিনয়-প্রকাশে বাধা দিলেন, তিনি সস্মিত-বদনে জিজ্ঞাসিলেন, 'বৎস ! সকলকেই ত চিনিলাম, কিন্তু ইনি কে ?'—লক্ষ্মণ দেখিলেন যে প্রমাদ ! আর্য্য রামচন্দ্রের সমক্ষে আর্য্যা জানকী তাঁহাকে যে প্রকার অপ্রতিভ করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন, কৌতুকপ্রিয়তা দেখাইতেছেন, তাহার যথোচিত প্রতিবিধান আবশ্যক। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ একটু হাসিয়া ও একান্ত লজ্জিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, 'বটে. উর্ম্মিলার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে জব্দ করিবার প্রয়াস ? আচ্ছা, এমন স্থান বাহির করিতেছি, যাহাতে সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইবে,' এই ভাবিয়াই বলিলেন, 'আর্য্যে, এইদিকে দৃষ্টিপাত করুন, ইহা একটি প্রধান দ্রষ্টব্য, এই ভগবান্ ভার্গব,'—লক্ষ্মণের আর অধিক বলিতে হইল না। এক 'ভার্গব' এই কতিপয় অক্ষরেই সীতার সমস্ত হর্ষ, পরিহাস কোথায় তিরোহিত হইল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ভার্গব এই কথায় সীতার মনে বিবাহবাসরের সেই সব কথা জাগিতে লাগিল। কিশোর রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সেই দুর্জ্জয় হরধনুর্ভঙ্গ, এবং তচ্ছ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া, প্রবল-প্রতাপ, একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুলের উচ্ছেদকর্ত্তা, শৌর্য্য-মদোন্মত্ত পরশুরামের সেই বিশ্ব-বিকম্পন বীরদর্প, মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডবৎ ভার্গবের সেই রোষ-কষায়িত লোচন, সেই দুর্দ্দর্শ মূর্ত্তি, একে একে গর্ব্বভর-মন্থরা, ললিতপ্রকৃতি জনকনন্দিনীর

চিত্তমুকুরে ভাসিতে লাগিল। 'ভয় হইতেছে' বলিয়া তিনি যেন জড়সড় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখের সে সস্মিতভাব জলদক্রোড়ে পূর্ণচন্দ্রবৎ কোথায় লুকাইল। সীতা দেবর লক্ষ্মণকে লইয়া পরিহাস করিতে গিয়াছিলেন, সুশীল লক্ষ্মণ, তাহার প্রতিপ্রসব করিলেন। কি সুন্দর চিত্র! এই চিত্রের এদিক্ ছাড়িয়া দিলেও, ইহার অন্য যে দিক্ চিত্রের গর্ভে লুক্কায়িত, তাহাও কম উজ্জ্বল নহে। ভগিনী চতুষ্টয়ের প্রতিকৃতি-প্রদর্শনকালে, বিনয়ভূষণ লক্ষ্মণ, স্বীয় ভার্য্যা উর্ম্মিলার নামোল্লেখ না করিয়া, কৌশলে তাঁহাকে বাদ দিয়া, আপনার চরিত্রের একটা প্রধান অংশ যেন অনন্ত শুভ্র আলোকে আলোকিত করিয়া ধরিলেন। এমন অনেক স্থল আছে, যেখানে কোনও বিষয়ের প্রকাশে যত সৌন্দর্য্য, গোপনে তাহার অনেক অধিক সৌন্দর্য্য, অনেক অধিক মাধুর্য্য পরিস্ফুট হয়। লক্ষ্মণ এইস্থলে উর্ম্মিলার নাম গোপন করিয়া তাহাই করিলেন। আর আনন্দময়ী জানকী লক্ষ্মণের সেই পরিস্ফুট সৌন্দর্য্য, মনোমোহন মাধুর্য্য, উষাদেবী যেমন কমলের মাধুর্য্য বাড়াইয়া দেন, তদ্রূপ শতগুণ বাড়াইয়া দিলেন। কি সুন্দর চিত্র! কি অপার্থিব কল্পনা!

চিত্রের এমনই নৈপুণ্য যে, রামজানকীর মনে হইতেছিল, যেন সত্যসত্যই বীরশ্রেষ্ঠ ভার্গব উপস্থিত। সীতার ভয়ম্লান মুখচ্ছবি দর্শনে, লক্ষ্মণ মনে মনে হাসিয়া কহিতে যাইতেছিলেন, 'আর্য্যে, দেখুন, ভার্গবের ন্যায় মহাবীরকেও আর্য্য কি প্রকারে পরাভূত করিয়াছিলেন'—কিন্তু বিনয়প্রধান রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে

এতটা বলিতে দিলেন না। রাম লক্ষ্মণের অর্দ্ধোচ্চারিত বাক্যে বাধা দিয়া কহিলেন, 'প্রিয়তম, আরও ত অনেক দ্রষ্টব্য আছে, তাহাই দেখাও।'

পতিদেবতা সীতা হৃদয়েশ্বরের এই বিনয়-গর্ভ উক্তি শ্রবণে, স্নেহ এবং সম্ভ্রমের সহিত, তদীয় মুখের দিকে অনিমেষনয়নে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া কহিলেন, 'আর্য্যপুত্র, এই অতিশয়িত বিনয়ে আপনার কি শোভাই না জন্মিয়াছে?' নবদুর্ব্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বহিরাকৃতির ন্যায় অন্তঃপ্রকৃতিও যে কত সুন্দর, কত মধুর, তাহা সীতার সহিত দর্শকদিগকেও কবি দেখাইতে লাগিলেন।

ক্রমে অযোধ্যাবৃত্তান্ত উপনীত হইল। ভ্রাতৃচতুষ্টয় বিশাল অযোধ্যারাজ্যের লক্ষ্মীরূপিণী বধূদিগকে লইয়া মিথিলা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। রামকর্ত্তৃক তাড়কা নিহত এবং হরধনুঃ ভগ্ন হইয়াছে, রামের অবদান-গাথা রাজ্যের সর্ব্বত্র গীত হইতেছে, পিতা দশরথ মহিষীগণের সহিত, পুত্রগণের বৈবাহিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতেছেন। কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা একপ্রাণ হইয়া পুত্রগণের শুভানুধ্যান করিতেছেন, বধূদিগকে বরণ করিয়া প্রাসাদে গ্রহণ করিতেছেন, ভ্রাতৃবৎসল রাম ভ্রাতৃবর্গের সহিত এই আনন্দ যজ্ঞের যজমানরূপে বিরাজ করিতেছেন, রাজ্যের সর্ব্বত্রই আনন্দ, সর্ব্বত্রই উল্লাস। এ বড় সুখের দিন! এমন দিন, এমন আনন্দ, সকল দিক্ সমানভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, কয়জনে জীবনে ভোগ করিতে পান?

অযোধ্যার চিত্র উপনীত হইবা মাত্র, ভাবুক রামের হৃদয়ে ঐ সব একে একে জাগিতে লাগিল। তাঁহার প্রফুল্ল নয়নযুগল শিশির-মণ্ডিত-শতদলবৎ সহসা জলভরাপ্লুত হইল। তিনি বাষ্প-পীড়িত-কণ্ঠে কহিলেন, 'ভাই, আমাদের সে সুখের দিন চলিয়া গিয়াছে, জীবনে তেমন দিন আর আসিবে না।' সত্যই জীবনে তেমন দিন আর আসিবে না, অমন দিন, অমন সুখের, মোহের, আনন্দ-প্রবাহের দিন, জীবনে একবার বই দুইবার আসে না। সকলের জীবনে একবারও আসে না। বিধাতার যাঁহারা অপার কৃপার পাত্র, ভাগ্য যাঁহাদের অত্যন্ত প্রসন্ন, তাঁহাদের জীবনে, হয়ত, ঐরূপ সুদিন আসিতে পারে, সকলের ভাগ্যে, তোমার আমার ভাগ্যে আসে না। রামের ভাগ্যে আসিয়াছিল, চকিতে আসিয়া স্বপ্নের ন্যায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার একটা চিরস্থায়িনী স্মৃতির রেখা হৃদয়ে আঁকিয়া দিয়া সে চলিয়া গিয়াছে। আজ রাম, সেই রেখার দিকে চাহিতেছেন, আর নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছেন। যাঁহারা অতীতের সুখস্মৃতিতে এইভাবে অশ্রুবর্ষণ করিতে পান, তাঁহারা ধন্য, তাঁহাদের জীবন সার্থক। ঐ দিন যখন আসিয়াছিল, তখন রাম প্রবলপ্রতাপ দয়াময় দশরথের ক্রোড়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন রাম ছায়াময় স্নিগ্ধ বটবৃক্ষের তলে নিদ্রাভিভূত ছিলেন। মহা-দ্রুমের সুশীতল ছায়ায় এবং মন্দ মন্দ সমীরণে, রাম তখন নিদাঘ-রবির কোন তাপ জানিতে পারেন নাই। এখন সে দিন নাই। এখন রামের মস্তক ছায়াশূন্য, সংসার-মার্ত্তণ্ডের প্রখর-কর-জালে

নিয়ত পরিতপ্ত,—রাম তাই আজ গলদশ্রুলোচনে সেই দিনের কথা ভাবিতেছেন। জানকী তখন বালিকা, শরচ্চন্দ্রের নির্ম্মল কৌমুদীকলাপ একত্র সমাহৃত করিয়া, বিধাতা বুঝি তাঁহার কেবল-সুন্দর দেহ-লতিকা নির্ম্মিত করিয়াছেন; জননীগণ আনন্দ-বিবশ-হৃদয়ে সেই জ্যোৎস্নাময়ী ননীর পুত্তলীকে ক্রোড়ে ক্রোড়ে রাখিতেছেন, মুখচুম্বন করিতেছেন। অন্যান্য পুর-বাসিনীরা ঐ লাবণ্য-প্রতিমাকে অঞ্চলে ধারণ করিতে না পারিয়া আপনাদিগকে বঞ্চিত মনে করিতেছে, আর সস্পৃহনয়নে, বালিকা সাতার কুঞ্চিতালক-লাঞ্ছিত প্রফুল্ল মুখ-শশীর প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। কিশোর রাম আনন্দের এই বিচিত্র বিলাস দূরে দূরে থাকিয়া দেখিতেছেন,—কি সুন্দর চিত্র! কি মধুর ভাব! মহাকবি ভবভূতি, কি অপার্থিব কৌশলেই না এই অতীত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন! এই চিত্র দেখিতে দেখিতে, আর সেই অতীত বৃত্তান্ত ভাবিতে ভাবিতে, রামসীতা একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িলেন। সেই দিন আর এই দিনের তুলনায় একান্ত বিধুর হইলেন। উভয়ের প্রতি উভয়ের সেই দিন যে ভাব জন্মিয়াছিল, আজ তাহা মনে পড়িল। উভয়কে উভয়ে আজ সেই পুরাতন ভাবে বিভাসিত করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ দেখিলেন প্রমাদ, স্বজন-বিরহে বিমনায়মানা জানকীর চিত্ত-বিনোদনার্থে লক্ষ্মণ এই চিত্র-প্রদর্শন করিতেছেন, কিন্তু ক্রমে ফল বিপরীত হইতেছে, বিনোদনের পরিবর্ত্তে চিত্ত সবেদন হইতেছে, তাই, চতুর লক্ষ্মণ, চিত্রান্তরে রামসীতার চিত্তাকর্ষণ

করিয়া পূর্ব্বকথা ভুলাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কহিলেন—'দেখুন, এই মন্থরা'—দুষ্টা মন্থরারই কুচক্রে কৈকেয়ী রামকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। ও প্রসঙ্গ যত না উঠে, ততই মঙ্গল। গুরুজন অন্যের পরামর্শে একটা কুকার্য্য করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহার পুনরালোচনায় লাভ কি? তাহাতে বেদনার বৃদ্ধি বই হ্রাস হইবে না; অনভিপ্রেত বিষয়ের ভূয়োভূয়ঃ সমালোচনে মন অস্থির হয়, হৃদয় মলিন হয়। তাই রাম, লক্ষ্মণপ্রদর্শিত ঐ মন্থরা-চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, এবং কোন উত্তর না দিয়া, সীতাকেও ঐ পাপিনীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে না দিয়া—'বৈদেহি, ঐ দেখ'—বলিয়া তাঁহার আদরিণী সীতাকে অন্য একখানি চিত্র দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ রামেরই অনুজ, তিনি একটু হাসিয়া মনে মনে কহিলেন, 'তাইত, আর্য্য দেখিতেছি মধ্যমা জননীর ব্যাপারটী একেবারেই ছাড়িয়া দিয়া গেলেন।'

রামপ্রদর্শিত চিত্রের প্রতি চাহিয়াই সীতার নয়নে সর্ব্বাগ্রে রাম-লক্ষ্মণের সেই জটাবন্ধন-চিত্র পতিত হইল। সীতা কহি-লেন,—"আহা! এই সেই জটাবল্কলধারণের ব্যাপার!—" সীতার হৃদয়ে এই ব্যাপারে তখন যে বেদনা জন্মিয়াছিল, তাঁহার এখনও বুঝি শেষ হয় নাই। হৃদয়ের সে পূর্ব্ব ক্ষত এখনও নিরাময় হয় নাই। এই চিত্রে তাই সীতা-হৃদয়ে কত ভাব জাগিতে লাগিল। সীতার ধনুর্ভঙ্গ-পণ-বিজেতা হৃদয়েশ্বর বিশাল কোশল রাজ্যের রাজ-রাজেশ্বর হইবেন, রামের বিজয়োন্নত মস্তকে রঘুকুলের চিরগৌরবমণ্ডিত রাজ-কিরীট শোভা পাইবে.

আর রাজার কুমারী সীতাও রাজার মহিষী হইয়া, রাজলক্ষ্মীরূপে অযোধ্যার সিংহাসন অলঙ্কৃত করিবেন, হৃদয়ে কত উল্লাস, কত আশা! সব ফুরাইল! স্বপ্নের মত কোথায় মিশিয়া গেল! যে মস্তকে রাজমুকুট উঠিবে, তাহাতে জটাবন্ধন করিতে হইল! এই স্থানেই রোরুদ্যমান সুমন্ত্রের সমক্ষে, নিষাদপতির ভবনে রামলক্ষ্মণ রাজকুমারবেশ পরিহারপূর্ব্বক তাপস-বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। এই স্থানেই সীতার সমক্ষে, সীতাপতি রামচন্দ্র দীন দুঃখীর ন্যায় বল্কল গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর এই স্থানেই স্বহস্তে রাম তাঁহার প্রাণাধিকপ্রিয়তরা রাজনন্দিনী জানকীকে কাঙালিনীর বেশ পরাইয়াছিলেন। আর তখন বাষ্পপস্তম্ভিত-কণ্ঠী সীতা চিন্তাজড়নয়নে তাঁহার হৃদয়েশ্বরের এই মর্ম্মভেদী ক্রিয়াকলাপ দর্শন করিয়াছিলেন। সে দিনের সে বেদনা, সে যাতনা, হৃদয়ের সে প্রদাহ জীবনে কখনও মিটিবে কি না সন্দেহ, তাই আজ নিষাদপতির ভবন-দর্শনমাত্রেই সাশ্রু-নয়না সীতার সেই দুঃখের কাহিনী মনে পড়িল; সেই জটা-সংযমনবৃত্তান্ত হৃদয়ে জাগিয়া, সাধ্বীর চিত্ত চঞ্চল করিয়া তুলিল।

ক্রমে আলেখ্যগাত্রে নানাবিধ দৃষ্টপূর্ব্ব স্থানের প্রতিকৃতি দেখিতে দেখিতে মুগ্ধা সীতা জটাসংযমন বৃত্তান্ত ভুলিয়া গেলেন। পতিতপাবনী ভাগীরথীর চিত্রদর্শনে, রাম মস্তক অবনত করিয়া, সেই রঘুকুলদেবতাকে প্রণাম করিলেন। লক্ষ্মণ কহিলেন,—'আর্য্য, এই সেই চিত্রকূট পর্ব্বতের রমণীয় পথ। এই অদূরে সেই পথি-পার্শ্ববাহিনী নীল-সলিলা যমুনার তটবর্ত্তী শ্যাম নামক

বটবৃক্ষ, আমরা যখন চিত্রকূটাভিমুখে গমন করিতেছিলাম, তখন মহর্ষি ভরদ্বাজ, আমাদিগকে, পথের চিহ্ন স্বরূপ এই বটবৃক্ষের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন।' সীতা মুগ্ধলোচনে এই ছবিখানি দেখিলেন,--তাঁহার হৃদয়ে এই বৃক্ষের স্মৃতি চিরদিন জাগরূক থাকিবে। তিনি রামের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আর্য্যপুত্র! এই প্রদেশের কথা মনে পড়ে কি?" সীতা-বৎসল রাম অমনি কহিলেন, "জানকি! কেমন করিয়া ভুলিব? এই স্থান আমার জীবনে একটি প্রধান স্মরণীয়। সীতে! বন্ধুর পার্ব্বত্যপথে নিয়ত পরিভ্রমণ-হেতু, তুমি যখন অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলে, তখন বাতাহত লতিকার ন্যায়, পরিমৃদিত মৃণালীর ন্যায়, তোমার অলস-দুর্ব্বল দেহযষ্টি, আমার বক্ষঃস্থলে স্থাপিত করিয়া, তুমি এইস্থানে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে। জানকি! এই স্থান এবং সেই দিন আমি কখনও ভুলিব না।" রাম যথার্থই বলিয়াছেন, তাঁহার জীবনে ইহা এক স্মরণীয় ঘটনা। অমর কালিদাস, তাঁহার মৃগয়ানিবৃত্ত শ্রমক্লান্ত প্রিয় রামকে গোদাবরীতটবর্ত্তী বেতসকুঞ্জে লইয়া গিয়া, মৈথিলীর উৎসঙ্গ-তলে শায়িত করিয়াছেন, তরঙ্গিণীর শীকর-বাহী সমীরণে, ঘর্ম্মাক্ত রামের গাত্র-মার্জ্জনা করিয়া দিয়াছেন; আর কালিদাসের প্রিয় সেবক ভবভূতি, তাঁহার মুগ্ধ-প্রতিমা সীতাকে শ্রমক্লান্ত অবস্থায় যমুনার তটবর্ত্তী বটবৃক্ষতলে রামের বক্ষে শায়িত করিয়া ঘুম পাড়াইয়া দিলেন। কালিদাসের যে স্থলে উৎসঙ্গ, ভবভূতির তথায় বক্ষঃস্থল; কালিদাসের রাম সীতার

উৎসঙ্গে সুপ্ত, আর ভবভূতির সীতা রামের বক্ষঃস্থলে নিদ্রিত। কালিদাস সৌন্দর্য্যের কবি, তাই সৌন্দর্য্যের অনুরোধে যতটুকু আবশ্যক, মাত্র ততটুকু বলিয়াছেন। আর ভবভূতি ভাবের কবি, করুণার কবি, তাই ভাবের সুসম্যক্ বিকাশের আশায়, একটু অতিরিক্ত হইলেও, তাহা প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

দেখিতে দেখিতে, বিশাল বিন্ধ্যাটবীর নয়নমোহিনী শ্যামল-চ্ছবির প্রতি জানকীর নেত্র নিপতিত হইল। অন্য নানা প্রকার দ্রষ্টব্যও ছিল, কিন্তু সীতা সে সমস্ত উপেক্ষা করিয়া কহিলেন,—"আর্য্যপুত্র, মনে আছে? আমরা যখন দক্ষিণারণ্যে প্রবেশ করি, তখন প্রখর রৌদ্রতাপে আমার পাছে কষ্ট হয় ভাবিয়া, আপনি যে স্বহস্তে আমার মস্তকে তালবৃন্তের আতপত্র ধারণ করিয়াছিলেন, ঐ দেখুন, সেই ছবি, আসুন ঐ খানি দেখি—" সীতা আজ রাজরাণী, পার্থিব সৌভাগ্যের চরম স্থানে আরূঢ়া, কিন্তু অরণ্যবাসকালের সেই সকল অপার্থিব সুখস্মৃতির নিকটে এ পার্থিব সৌভাগ্য অতি অকিঞ্চিৎকর! তাই, সেই সকল নিরাবিল প্রণয়ের স্বপ্ন প্রতিমুহূর্ত্তে জানকীকে উন্মনা করিয়া তুলিতেছে। তাঁহার হৃদয়েশ্বরের হৃদয় যে কেবল-সীতা-ময়, ইহা, প্রত্যেক আলেখ্য প্রতিক্ষণে তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। রমণীয় দক্ষিণারণ্যে কত সিদ্ধ মহাপুরুষ, কত জীবন্মুক্ত ঋষি সাধনা করিতেন, গিরিনির্ঝরিণীর শান্ত তটদেশে তাঁহাদের মনোহর তপোবনরাজি বিরাজিত; বনবাসকালে রামসীতা ঐ সকল তপোবনে আতিথ্যস্বীকার করিয়াছিলেন। প্রকৃতির

প্রাঞ্জল-প্রশান্ত-মূর্ত্তি-দর্শনে আত্মহারা হইয়াছিলেন। আজ সেই সকলের প্রতিকৃতি দর্শনে রামের হৃদয়ে সেই পূর্ব্বানুভূত ভাব জাগিতে লাগিল। তিনি ভাববিহ্বল-মনে, তাঁহার হৃদয়েশ্বরীকে সেই সকল স্থান দেখাইতে লাগিলেন। মুগ্ধ-প্রকৃতি জানকীর মনে হইল, যেন আবার সেই নির্ম্মল গিরিণদীর তীরে, বনরাজির ক্রোড়ে উপনীত হইয়াছেন। সেই ময়ূর, হরিণ, শুক,—সেই পুষ্পিত বনলতা, শ্যামল বৃক্ষচ্ছায়া, মন্দ সমীরণ,—সেই শমপ্রধান বনবাসিগণ, দয়াময়ী তাপসকামিনীরা এবং তাঁহাদের অকৈতব ব্যবহার—যুগপৎ সীতার হৃদয়ে ভাসিয়া উঠিল। প্রকৃতি-সরলা সীতা আনন্দে ক্রমে যেন অবশচিত্ত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে প্রিয়ংবদ লক্ষ্মণ, প্রকৃতিদেবীর লীলানিকেতনকল্প প্রস্রবণ গিরির প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"আর্য্য, জনস্থানমধ্যবর্ত্তী এই সেই প্রস্রবণ গিরি; এই দেখুন,—নব-জলদসংযোগে, প্রস্রবণের সমুচ্চ-শিখরমালার কি অপূর্ব্ব নীলিমা জন্মিয়াছে! ঐ দেখুন, প্রবলতরঙ্গমালিনী কলনাদিনী গোদাবরী প্রস্রবণের পাদমূল ধৌত করিয়া বহিয়া যাইতেছে; আর ঐ দেখুন, সেই গোদাবরীর তীর হইতে যতদূর দৃষ্টি যায়, নীল স্নিগ্ধ ঘনসন্নিবিষ্ট বনরাজি দর্শকের চিত্তহরণ করিয়া, কোথায়—কোন্ অজ্ঞেয় সীমায় চলিয়া গিয়াছে! ইহা অতি মনোজ্ঞ দৃশ্য।"

রাম দেখিলেন, নয়ন-তর্পণ প্রস্রবণ গিরির এবং প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরীর তটবিলাসিনী কানন-শ্রেণীর এই আলেখ্য-দর্শনে, তাঁহার সেই পূর্ব্ব কথা মনে পড়িল। এই পর্ব্বতে

সীতার সমভিব্যাহারে রাম কি সুখেই না কালাতিপাত করিয়াছেন! সুশীল লক্ষ্মণ, দিবারজনি, রামসীতার পরিচর্য্যা করিতেন, কিসে তাঁহাদের সুখ হইবে, কি করিলে রামজানকীর চিত্তবিনোদন হইবে, নিয়ত সেই চিন্তায় আকুল থাকিতেন। গোদাবরীর জনহীন, সুরম্য, সুশীতল তটদেশে রাম তাঁহার প্রীতিমূর্ত্তি সীতাকে লইয়া কত ভ্রমণ করিতেন, কত উপবেশন করিতেন, কি অপার্থিব সুখেই দিন যাপন করিতেন! বনবাসের সে সুখের নিকটে অযোধ্যার এই সাম্রাজ্যসুখও অতি নগণ্য। প্রিয়ংবদ রামচন্দ্র তাঁহার হৃদয়ের অধিদেবতাকে আজ সেই সকল কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। সেই যে গোদাবরীতটে, কত দিন কত রজনি, উভয়ে উভয়ের দেহ সংশ্রয়পূর্ব্বক, মুহূর্ত্তের মত কাটাইয়াছেন, সেই যে কত কথা, যাহার আদি ছিল না, অন্ত ছিল না, শত চিন্তা করিয়াও যাহা এখন একবার মনে আনিতে পারেন না, সেই পুরাণ কথা, সেই বিস্মৃত কথা রাম সীতাকে মনে করাইয়া দিতে লাগিলেন। জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণের চিন্তা করিতে করিতে, সেই সুখস্বপ্নের আলোচনা করিতে করিতে, তাঁহারা উভয়ে একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িলেন। উভয়েরই দেহ-মন অলস হইয়া আসিল। স্নেহের প্রতিমা আয়তলোচনা সীতা নিদ্রাবিষ্টার ন্যায়, আনন্দে, জড়তায়, নিমীলিতাক্ষী হইয়া আসিলেন।

চতুর লক্ষ্মণ, রামসীতার চিত্তের এই অবশতা বুঝিতে পারিয়া, কিঞ্চিৎ উত্তেজক ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। কহিলেন,

'দেখুন, এই পঞ্চবটী, আর এই সেই সূর্পণখা।' সীতার চমক ভাঙ্গিল। 'আর্য্যপুত্র, এই শেষ দেখা' বলিয়া কম্পিতকণ্ঠী, বিয়োগ-ভয়-কাতরা জানকী শিহরিয়া উঠিলেন। রাম তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, "অয়ি বিচ্ছেদ-ভীরু! এ যে চিত্র!" অমনি সীতাও বলিলেন, "হউক আর্য্যপুত্র, হউক না চিত্র, দুর্জ্জনের চিত্রদর্শনেও অমঙ্গল ঘটে, উহাতে কাজ নাই।" হায় মা জনকনন্দিনি! সূর্পণখার জন্য একবার তোমার রামকে হারাইয়াছিলে বলিয়া, আজ তাহার ছবি পর্য্যন্তও তুমি দেখিতে চাহিলে না, সেই পূর্ব্বানুভূত বিচ্ছেদ-যাতনায় তোমাকে অধীর করিল, হৃদয়েশ্বরের অঙ্কবর্ত্তিনী থাকিয়াও তোমার চিত্তের বিচ্ছেদভীতি অপনীত হইল না! আর যখন, তোমার এই রাম,—এই সীতাময় রঘুপতিই তোমাকে অজ্ঞাতসারে চিরদিনের মত বিচ্ছেদ-সাগরে ভাসাইয়া দিবেন, তখন তোমার কি দশা হইবে? যে যাহাকে ভয় করে, সে তাহারই হস্তে পতিত হইবে, সংসারের বুঝি এই নিয়ম। কবি যথার্থই গাহিয়াছেন—"চেতো, যস্মাৎ ত্রসতি নিতরাং হা তদেবাপতেৎ কিম্?"—

লক্ষ্মণ কহিলেন,—"এই জনস্থান বৃত্তান্ত; পাপিষ্ঠ রাক্ষস কনকহরিণের ছল করিয়া, যে দুর্ব্যবহার করিয়াছিল, তাহার যথোচিত প্রতিবিধান হইয়াছে সত্য, কিন্তু আজও, তাহা মনে পড়িলে প্রাণ অস্থির হয়, বেদনায় হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে। শূন্য জনস্থানের কুঞ্জে কুঞ্জে, কক্ষে কক্ষে, আর্য্যার শোকে এক প্রকার জ্ঞানহারা হইয়া আর্য্য যে ভাবে আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন,

তাহা ভাবিতেও হৃদয় বিগলিত হয়, মস্তক অবসন্ন হয়। আর্য্যের তখনকার অবস্থা-দর্শনে যে জনস্থানে পাষাণেরও চক্ষে জল আসিয়াছিল, বজ্রেরও হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল,[১] দেবি! এই সেই জনস্থান, একবার দৃষ্টিপাত করুন।" লক্ষ্মণের এই বাক্য-পরম্পরায় পতিদেবতা সীতার চক্ষে জল আসিল, তিনি মনে মনে রামকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, 'ওগো আমার ইহকাল পরকালের দেবতা,. রঘুকুলের চিরানন্দস্বরূপ! এ হতভাগিনীর জন্য তুমি এত কষ্টও পাইয়াছিলে!' লক্ষ্মণের বর্ণিত জনস্থানের সেই পূর্ব্বকথা মনে পড়ায়, রামের চক্ষেও জল আসিল, ছিন্নসূত্রিকা মুক্তামালিকার ন্যায়, অশ্রুবিন্দু ধরণীতলে লুণ্ঠিত হইল। তিনি হৃদয়ের বেগ সংবরণ করিতে প্রয়াস করিলেও, তদীয় অধর এবং নাসাপুট মুহুর্মুহুঃ স্ফুরিত হইতে লাগিল। সন্তাপে হৃদয়-কন্দর পরিপূরিত হইল। রামহৃদয়ের তদানীন্তন অবস্থা লক্ষ্মণের বুঝিতে বাকি রহিল না। লক্ষ্মণ সান্ত্বনাচ্ছলে দুই একটী কথা কহিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রাম বাধা দিয়া কহিলেন, "ভাই, সেই সময়ে যে বিপদ্ ঘটিয়াছিল, প্রতিবিধানের বাসনায় তখন তাহা কোনমতে সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই দুঃখাগ্নি, এখন পুনরায় মনে হইলে, যেন

১—উত্তর-চরিত—"অথেদং রক্ষোভিঃ কনককরিণচ্ছদ্ম-বিধিনা
তথা বৃত্তং পাপৈর্ব্যথয়তি যথা ক্ষালিতমপি!
জনস্থানে শূন্যে বিকল-করণৈরার্য্য-চরিতৈঃ
অপি গ্রাবা রোদিত্যপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ম্!!!"

পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ বেগে, দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে যেন নূতন ব্রণ উত্থিত হইয়া অনন্ত বেদনা জন্মাইয়া দেয়[১]।" রাম বিরত হইলে স্নেহময়ী জানকী কহিলেন, "হা ধিক, হা ধিক, আমারও মনে হইতেছে যে, আমি বুঝি আর্য্য-পুত্রকে হারাইলাম,"—বলিয়াই মৈথিলী সাশ্রুনয়নে মস্তক অবনত করিলেন। লক্ষ্মণ ভাবিলেন,—এখন অন্য চিত্রের প্রয়োজন, এ ভাবে ইঁহাদিগকে আর রাখা উচিত নহে। তাই বলিলেন, "আর্য্য! দেখুন, দেখুন, জনস্থানের পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী চিত্রকুঞ্জপরিশোভিত এই সেই দণ্ডকারণ্য, ঋষ্যশৃঙ্গপর্ব্বতে এই সেই মতঙ্গমুনির আশ্রম, এই সেই সিদ্ধ শবরী শ্রমণা, আর এই সেই পম্পা নামক মনোজ্ঞ সরোবর।" এই রমণীয় পম্পাতীরে সীতাবিযুক্ত রাম তারকণ্ঠে কত রোদন করিয়াছিলেন, সে রোদনের কথা সীতা শুনিয়াছেন, আজ এই স্থানের প্রতিকৃতি-দর্শনে, তাহার উল্লেখ করিলেন। রামের চক্ষে আবার জল আসিল।

সীতা চিত্রপটের আর এক অংশে দৃষ্টিযোজনা করিয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! ঐ যে কুসুমিত কদম্বতরুর শাখায় ময়ূর-ময়ূরীগণ নৃত্য করিতেছে, আর শীর্ণ-কলেবর আর্য্য-

১—উত্তরচরিত—"তৎকালং প্রিয়-জন বিপ্রযোগ-জন্মা
তীব্রোঽপি প্রতিকৃতিবাঞ্ছয়া বিসোঢ়ঃ।
দুঃখাগ্নির্মনসি পুনর্ব্বিপচ্যমানো
হৃন্মর্ম্ম-ব্রণ ইব বেদনাং করোতি।"

পুত্র তরুতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, তুমি গলদশ্রুনয়নে উহাঁরে ধরিয়া রহিয়াছ, উহার নাম কি ?" লক্ষ্মণ বলিলেন, "আর্য্যে ! ঐ পর্ব্বতের নাম মাল্যবান্ ; মাল্যবান্ বর্ষাকালে অতি রমণীয় স্থান ; দেখুন, নব জলধর-মণ্ডলের সহযোগে শিখরদেশে কি অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইয়াছে ! এই স্থানে আর্য্য একান্ত বিকল-চিত্ত হইয়াছিলেন।"[১] লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া সীতাপতি রামচন্দ্র ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন, "প্রিয়তম ! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, মাল্যবানের বর্ণনে আর প্রয়োজন নাই। আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না, মনে হইতেছে, আমার জানকী-বিচ্ছেদ বুঝি আবার ফিরিয়া আসিল !" লক্ষ্মণ অগ্রজের নির্দ্দেশমতে চিত্র-প্রদর্শনে বিরত হইলেন। দিন যায় কিন্তু ক্ষণ যায় না। অনেকে অনেক সময়ে অনেক কথা বলিয়া থাকে, তাহার কোন কথা হয়ত ঐ ক্ষণে পড়িয়া যায়। অদৃষ্ট-দেবতা পরোক্ষে থাকিয়া হয়ত স্বস্তি বলিয়া উঠেন। আজ রামচন্দ্রের মুখনির্গত "জানকীবিচ্ছেদ বুঝি আবার ফিরিয়া আসিল"—কথাতেও যেন সীতার পরোক্ষবর্ত্তিনী অদৃষ্টদেবী স্বস্তি বলিয়া লইলেন। যে রাম, আজ আলেখ্যপটে মাল্যবান্ পর্ব্বতের প্রতিকৃতি-দর্শনেই সেই অতীত সীতা-বিরহ স্মরণ করিয়া এত কাতর হইলেন, সীতার সম্মুখে থাকিয়াও তাঁহাকে 'হারাই হারাই' ভাবিয়া চমকিয়া উঠিলেন, তাদৃশ সীতাময়-

১—বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী।

জীবিত, সীতা-ধ্যান, সীতা-জ্ঞান রামচন্দ্রকে, মুহূর্ত্তপরে দর্শকগণ যে ভাবে দেখিবেন, তাহার গভীরতা, ভীষণতা এবং দুষ্করতা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই, মহাকবি ভবভূতি এই উক্তি রামের মুখ দিয়া নির্গত করাইলেন। যে হৃদয়ের প্রণয়বন্ধন এত দৃঢ়, যে হৃদয়ের প্রেম এত অগাধ, যে হৃদয়ের শক্তি এত অপরিসীম, সেই হৃদয়ে যদি কোন ভাবান্তর ঘটে, তবে তাহাই অদ্ভুত, অত্যদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। কবি, সেই অত্যদ্ভুত ব্যাপার-প্রদর্শনের জন্য, আলেখ্যদর্শনে এই আলোকযন্ত্রের স্থাপনা করিলেন।

আলেখ্যদর্শনজনিত পরিশ্রমে গর্ভভরালসা জানকী ঈষৎ পরিশ্রান্তা হইয়া পড়িলেন। ক্রমে তাঁহার নিদ্রাবেশ আসিল। রাম তাঁহাকে লইয়া গবাক্ষ-সন্নিধানে উপবেশন করিলেন। সীতার চন্দ্রকান্তমণিনির্ম্মিত হারতলতার ন্যায় কোমল বাহু-লতিকা, রামচন্দ্র স্বকণ্ঠে স্থাপিত করিয়া, আনন্দ-নিমীলিতাক্ষ হইয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! এ কি? তোমার বাহু-বল্লরীর প্রতি-স্পর্শে আমার সংজ্ঞালোপ হইতেছে, নিদ্রাবেশ আসিতেছে, জানকি! এ কি সুখ না দুঃখ? আমি কি জাগ্রত না নিদ্রিত? আমার শরীরে কি কোন বিষের প্রবাহ সঞ্চারিত হইল, না কোন অননুভূতপূর্ব্ব মত্ততায় আমার চিত্ত হরণ করিল? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! আমার ইন্দ্রিয়গণ ক্রমে, তোমার স্পর্শমাহাত্ম্যে শিথিল হইয়া আসিতেছে, একবার যেন তন্দ্রা আসিতেছে, পরক্ষণেই আবার তাহার লোপ হইতেছে।

একি ইন্দ্রজাল ? না কোন মায়া ?” মঞ্জুভাষিণী সীতা সস্মিত-বদনে কহিলেন, “আর্য্যপুত্র, এ দাসীর উপর আপনার অনন্ত অনুগ্রহ।” নিদ্রাবেশ-বিবশা সীতার এই গদ্গদবচন-শ্রবণে রামের মনে হইল, তাঁহার কর্ণকুহরে যেন অমৃতধারা বর্ষণ হইতেছে। তাঁহার ম্লান জীবন কুসুমকে যেন, উষাদেবীর ন্যায় এই বচনপরম্পরা বিকসিত করিয়া দিতেছে। সরোরুহাক্ষী জানকীর এতাদৃশী ভাষা যেন তাঁহার অবসন্ন হৃদয়ে নূতন উৎসাহ জাগাইয়া তুলিতেছে। রাম অতৃপ্ত-নয়নে সীতার নিদ্রালস মুখচ্ছবির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। এমন সময়ে জানকী “প্রিয়ংবদ ! শয়ন করিব” বলিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সীতাময়-প্রাণ রাম অমনি বলিলেন—‘অয়ি ! কি অন্বেষণ করিতেছ ? জানকি ! সেই বিবাহের দিন হইতে, কি শৈশবে, কি যৌবনে, কি গৃহে, কি বনে, এই রামবাহুই ত তোমার চিরন্তন উপাধান, তোমার গাঢ়নিদ্রার একমাত্র আশ্রয়।’ নিদ্রাবিবশা সীতা তখন অস্পষ্ট-কণ্ঠে, ‘সত্য, আর্য্যপুত্র ! সত্য, তাই বটে’—বলিতে বলিতে রামচন্দ্রের বক্ষের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। প্রেমময় রাম, ‘একি ? আমার প্রিয়বচনা কি বুকের উপরেই ঘুমাইলেন ?’—বলিয়া স্নেহপূর্ণ-নয়নে নিদ্রিত সীতাপ্রতিমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কহিলেন, “আহা, সীতা আমার গৃহের যথার্থই লক্ষ্মীরূপিণী. ইঁহার মুখদর্শনে আমার নয়নে অমৃতধারা বর্ষিত হয়, ইঁহার অঙ্গস্পর্শে মনে হয়, আমার সর্ব্বশরীর যেন স্নিগ্ধ শীতল চন্দন-

রসে অভিষিক্ত হইতেছে, আমার কণ্ঠলগ্ন ইঁহার এই মৃণাল-কল্প বাহুলতিকা, শিশির-শীতল মুক্তার মালা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিতেছে, এতাদৃশী দেবী রমণীর সমস্তই কমনীয়, সমস্তই সুন্দর, কিন্তু হায়, অসুন্দরের মধ্যে ইঁহার বিরহ।”—

রামের মুখ হইতে যেমন নির্গত হইল, 'বিরহ'—অমনি প্রতিহারীও সম্মুখে আসিয়া বলিল, 'দেব! উপস্থিত—।' রামের সঙ্গে সামাজিকগণও চমকিয়া উঠিলেন। সকলেরই মনে হইল 'বুঝি বিরহই উপস্থিত।' জানকী নিদ্রিতা, তিনি ইহার কিছুই শুনিলেন না, কিছুই বুঝিলেন না। তিনি তাঁহার শৈশবের সহচর, যৌবনের সখা, হৃদয়সর্ব্বস্বের হৃদয়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, অথবা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন বলি কেন, তিনি যেন, চিত্রদর্শন করিতে করিতে, সেই পূর্ব্বকথা, পূর্ব্ব ঘটনা ভাবিতে ভাবিতে, আপনার সত্ত্বা বহির্বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া, তাঁহার রামের সত্ত্বায় মিশাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার স্থূল শরীর ঐ রামের বক্ষে নিহিত, আর তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর রামের আত্মায় মিলিত হইয়া গিয়াছে। মুক্তবেণী এতদিনে যুক্তবেণীতে পরিণত হইয়াছে। ঐ বাহিরে, রামের দেহে যেমন সীতার দেহ আশ্রিত, ঐ প্রকার দেখ, ঐ ভিতরে, লোকনয়নের অন্তরালে, রামের প্রাণে সীতার প্রাণ মিলিত! পতিব্রতা যেন তাঁহার বাহ্য শরীর ঐ তাঁহারই প্রিয়তমের বক্ষে গচ্ছিত রাখিয়া, অন্তঃশরীর লইয়া, তাঁহার জীবনসর্ব্বস্বের সহিত মিশিয়া গেলেন। স্থূল-দৃষ্টি মানব দেখিল, সীতা নিদ্রিতা, কিন্তু প্রেমরূপ অক্ষয়স্বর্গের

যাঁহারা অধিবাসী, তাঁহারা বুঝিলেন যে, না, সীতা নিদ্রিতা নহেন, তিনি তাঁহার চিরধ্যেয় দেবতার সত্তায় মিশ্রিতা। বহু তপস্যায় অভীষ্ট দেবতার সাযুজ্য-লাভ কদাচিৎ ঘটে, আজ পাতিব্রত্য-তপস্বিনী জানকীরও রাম-সাযুজ্য-প্রাপ্তি হইল। কি সুন্দর চিত্র! ভবভূতি, তুমি ধন্য, তোমার কল্পনা ধন্য, তোমার কৃপায় সংস্কৃত ভাষা, আর সেই ভাষার উৎপত্তিস্থল বলিয়া ভারতবর্ষও ধন্য হইয়াছে! যতদিন জগতে বিদ্যার চর্চ্চা থাকিবে, মানুষের জ্ঞান-শক্তি থাকিবে, চিন্তাশক্তির লোপ না পাইবে, ততদিন, তোমার পূজা করিয়া, সকলেই আপনাকে ধন্য ও গৌরবিত মনে করিবে। তুমি দক্ষিণাপথের বরেণ্য বেদজ্ঞবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, বাগ্-দেবতার সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলে, কবিগুরু রত্নাকরের মোহনবংশীর মধুরস্বরে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া উচ্চকণ্ঠে তান ধরিয়াছিলে, তোমার তানে ভারতবর্ষ বিমুগ্ধ হইয়াছে। তোমার ন্যায় প্রেমিক-শ্রেষ্ঠের দ্বারা, তোমার কুল পবিত্র হইয়াছে, জননী কৃতার্থা এবং পৃথিবী পুণ্যবতী হইয়াছেন। তোমার ন্যায় অনর্ঘ রত্নকে বক্ষে ধারণ করিয়া বসুন্ধরার বসুন্ধরা নাম সার্থক হইয়াছে।

নবম অধ্যায়।

বিসর্জ্জন।

রাম-কথিত 'বিরহ' শব্দের পরই প্রতিহারীর 'উপস্থিত' এই কথায়, আপাততঃ মনে হয়, বুঝি বিরহই উপস্থিত হইল। তাই সীতা-সর্ব্বস্ব রাম অতিব্যগ্র-ভাবে কহিলেন, 'কে উপস্থিত?' অথবা শুধু রাম নহে, সমাগত সামাজিক-বর্গের সম্মিলিত হৃদয়ের কথার প্রতিধ্বনিরূপে, রামের মুখ হইতে নির্গত হইল 'কে উপস্থিত?' প্রতিহারী কহিল, 'মহারাজের প্রিয় সেবক দুর্ম্মুখ!' রামের স্বস্তি হইল। প্রতিহারীর 'উপস্থিত' এই কথায়, প্রণয়-প্রবণ রামহৃদয়ে যে প্রবল আঘাত লাগিয়াছিল, উৎকণ্ঠার যে উত্তাল তরঙ্গ উঠিতেছিল, তাহার অপনোদন হইল। কল্পনাকুশল মহাকবি, যেন ইন্দ্রজাল-প্রভাবে, ক্ষণে ক্ষণে, রামকে তথা রামানুরক্ত সামাজিকদিগকে, একবার নিদ্রিত, আবার জাগরিত করিতে লাগিলেন। একবার বিষাদ, পরক্ষণেই আবার হর্ষ। প্রবল বর্ষার পূর্ব্বে, যেমন শ্রাবণের আকাশে কখন ঘনকৃষ্ণ জলদামালার তাণ্ডব-নর্ত্তন, পরক্ষণেই অমনি প্রখর তপন দেখা যায়, আসন্নমৃত্যুর নয়নে যেমন কখন পুলক কখন ভীতি অনুমিত হয়, আজ রামের হৃদয়েও হঠাৎ সেইরূপ নানাপ্রকার অস্বাভাবিক

লক্ষণ জন্মিতে লাগিল। তিনি, প্রতিহারীর মুখে দুর্ম্মুখের আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্রেই, তাহাকে সমীপে আনয়ন করিতে বলিলেন।

দুর্ম্মুখ আসিল,—আসিবার কালে, আজ তাহাকে যে কঠোর কার্য্য করিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া, সে মর্ম্মে মর্ম্মে কান্দিতে লাগিল। তাহার প্রাণ অস্থির হইল। কিন্তু সে রামের ভৃত্য, কর্ত্তব্যপালনের জন্য হৃদয়ে যে সামর্থ্যের প্রয়োজন, তাহার তাহা যথেষ্ট ছিল। সে পাষাণে বুক বাঁধিয়া অগ্রসর হইল। বিপদের পূর্ব্বে, প্রাণ আপনিই কান্দিয়া উঠে, মানুষকে আকুল করিয়া তুলে। তখন জীব বুঝিতে পারে না; অথবা বিপদের সে ভেরি-নিনাদ বার বার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইলেও, জীব তাহা তখন ভাল করিয়া শুনিতে চায় না। বিপদ কিন্তু নানাভাবে জীবকে তাহার আগমন-ঘোষণা পূর্ব্ব হইতেই করিতে থাকে। তাই আজ চিত্রদর্শনের প্রারম্ভ হইতেই, অথবা চিত্রদর্শন কেন, রাম-জানকীর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিবার সময় হইতেই, কত ভাবে কত রকম অমঙ্গলের সূচনা হইল। সীতা-ক্ষেমকাম রাম এবং রামসীতা-ক্ষেমকাম সামাজিক,—ইঁহাদের কেহই কিন্তু ঐ আপতিষ্যমাণ অনর্থের সূচনা বুঝিতে পারিলেন না। এখন বিপদ আসন্নপ্রায়, তাই যেন জোর করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত, রামসীতার অদৃষ্টদেবতা, ঐ 'বিরহ' শব্দের সহিত 'উপস্থিত' শব্দের কাকতালীয় সংযোগ করিয়া দিলেন। রামের প্রাণ

অস্থির হইয়াছিল, সেই সঙ্গে, তাঁহার বক্ষঃস্থলশায়িনী সীতার প্রাণও অস্থির হইল। এদিকে দুর্ম্মুখ রাম-সমীপে আগতপ্রায়, ওদিকে নিদ্রিতা সীতাদেবীও "হা আর্য্যপুত্র! হা প্রিয়দর্শন! তুমি কোথায়!"—বলিয়া স্বপ্নের মধ্যে কান্দিয়া উঠিলেন। কিন্তু ইহাতেও সীতা-সংগত রামের চমক ভাঙ্গিল না। দুর্দ্দৈবের এ করাল ভেরির ভৈরব নাদেও সীতাময়প্রাণ রাম আসন্ন সর্ব্বনাশের আশঙ্কা করিলেন না। সামাজিকগণের চিত্ত-ভিত্তির উপর অচিরেই যে ভয়ঙ্কর অশনি-সম্পাত হইবে, সেই আকস্মিক বজ্রপাতে যাহাতে সে দুর্ব্বল ভিত্তি ভাঙ্গিয়া না যায়, তজ্জন্য কবি, ক্রমে তাহাকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।—রাম সীতার দুঃস্বপ্ন-রোদন-ধ্বনির অন্যরূপ সমাধান করিলেন। কহিলেন, "চিত্রদর্শনে দেবীর যে উদ্বেগদায়িনী প্রবল বিরহ-ভাবনা জন্মিয়াছে, দেখিতেছি, সেই ভাবনাতেই সীতা আমার আকুল হইয়াছেন"—এই বলিয়া স্থিরপ্রসাদ রামচন্দ্র নিদ্রিতা সীতার দেহে, স্নেহপূর্ণহৃদয়ে করচালনা করিতে লাগিলেন। আর এদিকে যেন, তাঁহার প্রেমময়ী হৃদয়বীণায় সতত ধ্বনিত গীতিকার প্রতিধ্বনিরূপে, তদীয় মুখ হইতে নির্গত হইল—"আহা! অকৃত্রিম প্রেম কি পরম পদার্থ! কি সুখ, কি দুঃখ, কি সম্পত্তি কি বিপত্তি, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য, সকল অবস্থাতেই উহা একরূপ ও অবিকৃত। ঈদৃশ প্রণয়সুখের অধিকারী হওয়া অল্পসুখের কথা নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, এরূপ প্রণয় জগতে নিতান্ত বিরল ও একান্ত দুর্লভ;

যদি এত বিরল ও এত দুর্লভ না হইত, সংসারে সুখের সীমা থাকিত না।"[১]—

রাম নিজে প্রেমিক-চূড়ামণি, তাই প্রেমের মহত্ত্বে তিনি বিমুগ্ধ, প্রেমের আকর্ষণে তিনি আবদ্ধ। অকৃত্রিম প্রেম জগতে বিরল ও একান্ত দুর্লভ সত্য, কিন্তু অকৃত্রিম প্রেমের প্রকৃত উপাসক, অকৃত্রিম প্রেমের যথার্থ অধিকারী জগতে ততোধিক বিরলতর ও দুর্লভতর। রাম সেই অপার্থিব প্রেমরত্নের অদ্বিতীয় অধিকারী, এজন্য তিনি যে কত সুখী, তাঁহার সৌভাগ্য যে কত অপরিমিত, তাহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বিদিত ছিলেন। দেবযজনসম্ভূতা সীতার নির্ম্মল হৃদয় যে অপূর্ব্ব প্রেমরত্নের আকর, তাঁহার ন্যায় দেবী যে মর্ত্তে অসম্ভব, ইহা রাম জানিতেন। তাই রামের মুখ দিয়া সীতার অগোচরে, তাঁহার মর্ম্মের রহস্য প্রকাশিত হইল। দর্শক-গণ বুঝিলেন যে, সীতা রাম-হৃদয়ের কোন্ স্থানের অধিকারিণী, ও রামের কীদৃশী চিত্তহারিণী। পরিমিত, দৃষ্টিগ্রাহ্য জলস্রোত যেমন, ক্রমে অনন্ত, অপরিমিত, দৃষ্টির অবিষয়ীভূত সাগরে মিশিয়া আপনার অস্তিত্বের লোপ করে, অনন্তের অনন্তত্ব লাভ করে, তদ্রূপ অযোধ্যার লক্ষ্মীরূপিণী, প্রেমময়ী জনকদুহিতাও

১—বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী।

উত্তর-চরিত—অদ্বৈতং সুখ-দুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু যৎ
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহ-সারে স্থিতং
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে॥

রামের অগাধ প্রেম-পূর্ণ-হৃদয়ে নিদ্রিত হইয়া, সেই হৃদয়ে মিশিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বাহ্য দেহ পড়িয়া আছে, আন্তর দেহ—কেবল-প্রেমময় দেহ—রামের অগাধ প্রেম-সাগরে মিলিয়াছে। প্রেমের এমন চিত্র, প্রেমিক হৃদয়ের এমন সম্মিলন আর আছে কি?

দুর্ম্মুখ আসিয়াছে, কালভুজঙ্গমবৎ সে গরলবর্ষণ করিয়াছে। যাহা শুনিবার,—রাম তাহা শুনিয়াছেন,—সম্যক্-প্রকারে শুনিতে না শুনিতেই জানকীবল্লভ মূর্চ্ছিত হইয়াছেন। লঙ্কানগরীতে সাধ্বী জনক-দুহিতার অনলপরীক্ষার দ্বারা যে অপবাদ রাম দূর করিয়াছিলেন, আজ দৈবদুর্ব্বিপাকে, তাহা পুনরায় আবির্ভূত হইয়া, উন্মত্ত-কুক্কুর-বিষের ন্যায় রামের সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইল। তাঁহাকে ক্ষিপ্ত করিল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে, যে নিদ্রিত দেবীপ্রতিমার মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে, রাম প্রেমের কত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছেন, আপনার জীবন সার্থক মনে করিয়াছেন, সেই সীতার প্রতি তাঁহার পুত্রাধিক প্রিয়তর প্রজাপুঞ্জের এই বিচার দেখিয়া, তিনি মর্ম্মাহত—জীবন্মৃত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে শত বৃশ্চিক যেন যুগপৎ দংশন করিল। তিনি 'হায়! আমার ন্যায় হতভাগ্যের এখন কর্ত্তব্য কি?'—ভাবিয়া ক্রমে অবশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ক্ষণমধ্যেই তাঁহার হৃদয় কর্ত্তব্য-নির্ণয়ে ব্যগ্র হইল। তিনি কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া, অতিকাতর-চিত্তে অথচ দৃঢ়তার সহিত কহিলেন—

সতাং কেনাপি কার্য্যেণ লোকস্যারাধনং ব্রতম্।
যৎ পূজিতং হি তাতেন মাঞ্চ প্রাণাংশ্চ মুঞ্চতা॥

"যেরূপ ত্যাগ স্বীকারের দ্বারাই হউক না কেন, লোকের আরাধনা করা সজ্জনের সর্ব্বপ্রধান ব্রত। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব, এই লোক-রঞ্জন-ব্রত পালন করিতে যাইয়া, সত্যের জন্য, আমার সহিত স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।" পিতৃপিতামহের সৎকীর্ত্তি-পরম্পরায় অধস্তনদিগকে উন্নত করে, তাহাদের হৃদয়ে বল জন্মাইয়া দেয়। আজ এই প্রাণঘাতী সঙ্কটে, সত্য-প্রিয় পিতা দশরথের উক্ত আদর্শ, রামের হৃদয়ে বার বার ভাসিতে লাগিল, তাঁহাকে সবল করিল। তিনি পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন; ক্ষণেকের জন্য সীতামূর্ত্তি বিস্মৃত হইলেন। ভগবান্ বশিষ্ঠের সেই উপদেশবাণী তাঁহার কর্ণকুহরে বার বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেই যে অষ্টাবক্রকে রাম বলিয়াছিলেন—

স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্থ মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥[১]

—সেই কথার লুপ্ত ধ্বনি হৃদয়ে আবার বাজিয়া উঠিল। লোকশ্রেষ্ঠ সূর্য্যবংশীয় নৃপতিবৃন্দের সাধু শুদ্ধ চরিত্রপ্রভায় যে কুল চিরকাল সমুজ্জ্বল, আজ রামের জন্য সেই কুলে কলঙ্ক জন্মিবে,—ভাবিয়া, তাঁহার হৃদয় আকুল হইল। তাঁহার ন্যায় মন্দভাগ্য জগতে অতি বিরল,—মনে করিয়া, তিনি আপন অদৃষ্টে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তখন সেই হৃদয়াসীনা

১—৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সাধ্বী প্রতিমার,—সেই বাল্যের ক্রীড়া-পুত্তলিকা, যৌবনের প্রিয়সঙ্গিনী, সংসারের শান্তিপ্রস্রবিণী, পূত-চরিত্রা প্রিয়তমার কথা তাঁহার মনে জাগিল। তিনি মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইলেন। পবিত্র যজ্ঞভূমি যাঁহার উৎপত্তিস্থল, যাঁহার জন্মের দ্বারা পৃথিবী পর্য্যন্ত পবিত্র হইয়াছে, অকলঙ্ক জনক-কুলের যিনি সাক্ষাৎ আনন্দরূপিণী, লোকপাবন হুতাশন, গুরুদেব বশিষ্ঠ, এবং গুরু-পত্নী অরুন্ধতীপ্রভৃতির ন্যায় যাঁহার নির্ম্মল চরিত্র, রাম যাঁহার দ্বিতীয় জীবন, সেই অরণ্যবাসপ্রিয়সখী, মঞ্জুভাষিণী, মধুরহাসিনী, রাজনন্দিনী জানকীর কি এই পরিণাম?—ভাবিতে ভাবিতে সীতাপতি রামচন্দ্র নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কর্ত্তব্যের অবধারণ রাম পূর্ব্বেই করিয়াছেন। তিনি মহাপুরুষ, অসীম শক্তিধর; কর্ত্তব্যের চরণে তাঁহার অনুৎসর্জ্জনীয় বা কর্ত্তব্যের উদ্দেশে তাঁহার অদেয় কিছুই ছিল না। তিনি আপনার হৃৎপিণ্ডরূপিণী জনকতনয়ার উচ্ছেদ করিয়াও কর্ত্তব্য পালন করিতে কৃত-নিশ্চয় হইলেন। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া, সেই বক্ষঃ-স্থলবিলগ্না নিদ্রিতা দেবী-প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া কত বিলাপ করিলেন। যাঁহার জন্মগ্রহণে ত্রিজগৎ পবিত্র, তাঁহার প্রতি লোকের এই অপবাদ! যিনি রাজার নন্দিনী, রাজার গৃহিণী, তাঁহার এই পরিণতি! ধিক্ রাজত্বে, ধিক্ সিংহাসনে। রাম এক-বার সিংহাসনে আরূঢ় হইতে যাইয়া সীতার সহিত নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, এবার সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াই সীতাকে বিসর্জ্জন দিলেন।—তাই পাষাণে বুক বাঁধিয়া, তিনি, "দুর্ম্মুখ, যাও,

লক্ষ্মণকে বল গিয়া, তোমাদের নূতন রাজা রাম এই আজ্ঞা করিয়াছেন”—বলিয়া, দুর্ম্মুখের কাণে গোপনে বক্তব্য বিবৃত করিলেন।

দুষ্কর প্রজারঞ্জন-ব্রতের দক্ষিণারূপে রাম তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্বকে আজ বিনা দোষে বিদায় দিতে বসিয়াছেন,—ভাবিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা কান্দিয়া উঠিল। যাঁহাকে শৈশব হইতে যত্নে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিতেছেন, যাঁহার অকৃত্রিম প্রণয়ের সীমা নাই, যাঁহার হৃদয়ের রাম ধ্যান, রাম জ্ঞান ব্যতীত অন্য অবলম্বন নাই, আজ তাঁহাকে, সেই পাপলেশ-বিমুক্তা সতী ললনাকে, ছল করিয়া চিরনির্ব্বাসিত করিতেছেন—ভাবিয়া রামের আরও কষ্ট হইল, অনুতাপানলে হৃদয় ভস্মীভূত হইতে লাগিল।[১] তিনি ভাবিলেন, তাঁহার ন্যায় অস্পৃশ্য পাতকী, দেবী জানকীর অঙ্গস্পর্শ করিলেও সে দেবী-অঙ্গ অপবিত্র হয়। তাই রাম, ধীরে কম্পিতকরে, নিদ্রাভিভূতা, গর্ভভরালসা, সীতার অবলুলিত মস্তক উত্তোলন করিয়া, আপন বাহু সরাইয়া লইলেন। এবং সজল-নয়নে বলিলেন,—

অপূর্ব্বকর্ম্মচাণ্ডালময়িমুগ্ধে! বিমুঞ্চ মাম্।
শ্রিতাসি চন্দন-ভ্রান্ত্যা দুর্বিপাকং বিষদ্রুমম্॥[২]

১—উত্তর-চরিত—রামঃ। “হা কষ্টং! অতিবীভৎসকর্ম্মা নৃশংসোঽস্মি সংবৃত্তঃ—
শৈশবাৎ প্রভৃতি পোষিতাংপ্রিয়াং সৌহৃদাদপৃথগাশয়ামিমাং
ছদ্মনা পরিদদামি মৃত্যবে সৌনিকো গৃহ-শকুন্তিকামিব।

২—মুগ্ধে জানকি! আর কেন? আমি আজ যে নৃশংস এবং বীভৎস কর্ম্মে

রাম যেন আজ তাঁহার সংসারের শান্তিকে দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া, নিজে অশান্তির অগ্নিময় গ্রাসে আত্মাহুতি দিলেন। হৃদয়ের দুঃসহ যাতনায় অস্থির হইয়া, আর তিনি বসিয়া থাকিতে পারিলেন না,—ক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার নয়নে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তখন ঘূর্ণায়মান বলিয়া প্রতিভাত হইল। তাঁহার মনে হইল, যেন জীবজগতে কি একটা মহাপ্রলয় হইয়া গেল! তাঁহার জীবনের প্রয়োজন, যে জন্য—যাহার জন্য সংসারে আসা,—সে প্রয়োজন এবারকার মত পর্য্যবসিত হইল! যে সংসার ক্ষণকাল পূর্ব্বে শ্যামল বনবীথিকার ন্যায় নয়নরঞ্জন ও চিত্তবিমোহন ছিল, তাহা এখন ছায়হীন, রূক্ষ জীর্ণ অরণ্যবৎ, রৌদ্রমূর্ত্তি মহাশ্মশানবৎ, নিতান্ত ভীষণ ও একান্ত অসার বলিয়া জ্ঞান হইল। সীতার সম্পর্কে যে জীবন এত সুখময় ছিল, তাহা নিরতিশয় কষ্টপূর্ণ ও দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ মনে হইতে লাগিল। তিনি কত কষ্টে, কত প্রয়াসে, দুস্তর জলধি বন্ধন করিয়া, যে রত্নের উদ্ধার করিয়াছিলেন, আজ সরযূর তটে তাহাকে বিসর্জ্জন দিলেন। এই প্রসঙ্গে, সেই সমস্ত কাহিনী, সেই রাজ্যাভিষেক প্রস্তাব, বনগমন, সীতাহরণ,—সেই বিভীষণ, সুগ্রীব, হনূমান,—সেই প্রাণাধিক লক্ষ্মণের শক্তি-শেল, মায়া সীতার শিরশ্ছেদ, রাবণমেঘনাদের বিনাশ—প্রভৃতি

প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে অতি ঘৃণিত জাতিরও প্রবৃত্তি জন্মে না, সুতরাং মাদৃশ দুরাত্মাকে ত্যাগ কর। সীতে! তুমি সুখপ্রদ চন্দন-তরু-ভ্রমে, এতদিন অনন্ত ক্লেশ-কর বিষবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়াছিলে!

আজ স্বপ্নের ন্যায়, ছায়ার ন্যায়, উন্মত্ত রামের নয়নে ভাসিতে লাগিল। এই ঘোর বিপদে রাম আজ নিঃসহায়। পিতা দশরথ স্বর্গারূঢ়, রাজর্ষি জনক, গুরুদেব বশিষ্ঠ, দেবী অরুন্ধতী, স্নেহময়ী জননী—সকলেই দূরবর্ত্তী,—রাম একাকী—এই দুঃখের সাগরে নিমগ্ন প্রায়!—রামের সীতাময় হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি অস্থির ও অবশ-হৃদয়ে, তাঁহার সেই সংসারের শোভা, চিত্তের অধিদেবতারূপিণী জানকীর পবিত্র চরণে জন্মের মত মস্তক-স্পর্শ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে, যমুনাতীরবাসী ঋষিদিগের প্রতি দুরন্ত দৈত্য লবণ নানাবিধ অত্যাচার করিতেছে, শুনিতে পাইয়া, রাম ত্বরিত পদে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু আবার ফিরিলেন; আবার নিদ্রাভিভূতা সীতার মুখ একবার জন্মের মত শেষ দেখিয়া গলদশ্রুনয়নে—'হা দেবি! তোমার কি এই পরিণতি!'—বলিয়া ভগ্নহৃদয়ে বহির্গত হইলেন। এদিকে, সীতারও নিদ্রা ভঙ্গ হইল। 'হা আর্য্যপুত্র! তুমি কোথায়' বলিয়া, দুঃস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সীতা ব্যগ্রভাবে উঠিয়া বসিলেন। নানাপ্রকার বিভীষিকাময় স্বপ্নে তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়াছিল। তিনি উঠিয়াই ইতস্ততঃ দৃষ্টি-সঞ্চালন করিলেন,—কিন্তু তাঁহার রামকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার বশংবদ প্রিয়তমের অঙ্কে তিনি নিদ্রিত ছিলেন, তাঁহাকে একাকিনী রাখিয়া রাম হঠাৎ কোথায় গেলেন? এ রকমত আর কখনও হয় নাই। এই নূতন। সীতার প্রাণ কান্দিয়া উঠিল। তিনি শর-বিদ্ধা হরিণীর ন্যায় যাতনায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন।

চিত্রদর্শনকালে, সীতা, আর একবার, তাঁহার প্রিয়ঙ্কর, স্থির-প্রসাদ রামচন্দ্রের সহিত তপোবনদর্শনে বাসনা জানাইয়াছিলেন, রামও তাহাতে আনন্দ-সহকারে সম্মতি দিয়াছিলেন। দুর্ম্মুখ আসিয়া এখন সীতাকে বলিল, 'দেবি, কুমার লক্ষ্মণ নিবেদন করিলেন যে রথ সজ্জীভূত, আপনি আরোহণ করুণ।' গর্ভভর-মন্থরা সীতা উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে রথে আরোহণ করিলেন। আরো-হণকালে, সীতার প্রাণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর চঞ্চল ও বিধুর হইল। তিনি তখন বাষ্প-পীড়িত-কণ্ঠে ও অঞ্জলি-বদ্ধ-করে কহিলেন—'হে মঙ্গলময় তপোধনগণ, হে রঘুকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল, আপনাদিগকে নমস্কার, হে আমার আর্য্যপুত্রের চরণকমল, হে আমার নিখিল গুরুজনবর্গ,—সীতা উদ্দেশে নমস্কার কবিতেছে। আপনারা মঙ্গল করুণ।'—অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী, যেন জন্মের মত তাঁহার চিরবাঞ্ছিত আশ্রয়ের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সীতা তপোবন ভূমির পুনর্দর্শন-লালসায় হৃদয়ের বেগ সংবরণ করিতে প্রয়াস করিতে-ছিলেন বটে, কিন্তু, ক্ষণে ক্ষণে নানাবিধ অতর্কিত চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। আজ যে তাঁহার কি সর্ব্বনাশ হইল, অজ্ঞাতসারে যে, কি কালভুজগী তাঁহাকে দংশন করিল, তাহার বিন্দু বিসর্গ তিনি গুণাক্ষরেও জানিতে পারিলেন না। মন্থরার কুচক্র-চক্রে, শূর্পণখার পাপাচরণে এবং রাবণের প্রবল বৈরিতায়, রাম তাঁহার যে স্বর্ণপ্রতিমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, শাখামৃগের সহিত সখ্য-স্থাপন-পূর্ব্বক অপার জলধি বন্ধন করিয়া,

রাম যে রাজলক্ষ্মীর উদ্ধার করিয়াছিলেন,—হৃদয়ের মর্ম্মমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন,—আজ রামের সেই স্নেহের প্রতিমা চিরতরে অতল সাগরে বিসর্জ্জিত হইল! পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি জনকের পূতচরিত্রা আদরিণী দুহিতা, সূর্য্যবংশের মূর্ত্তিমতী কুললক্ষ্মী, রামের সেই ধনুর্ভঙ্গ-পণ-বিজিতা সতী, দশরথের পুত্রবধূ, প্রজানুরঞ্জনার্থে গহন অরণ্যে নির্ব্বাসিত হইলেন!!!

দশম অধ্যায়।

সৃষ্টির চরম উৎকর্ষ।

রত্নাকর বাল্মীকি, তদীয় অদ্বিতীয় মহাকাব্য রামায়ণে, ছন্দোবন্ধে, সীতানির্ব্বাসনের যে করুণ সঙ্গীত গাহিয়াছেন, মহাকবি কালিদাস, তাঁহার অনুপম রঘুবংশে, ছন্দোময়ী ভাষায়, রত্নাকরের যে শোকগীতিকার ঝঙ্কার করিয়াছেন, কবিবর ভবভূতি গদ্যে, নাটকাকারে সেই সীতার বনবাস-গীতিকার পুনর্ঝঙ্কার করিলেন। বাল্মীকির রাম, সীতাকে বনবাস দিবার সময়ে, একান্ত অধীর হইয়া, যেরূপ বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে পাষাণেরও বুক ফাটিয়া যায়। সে কল্পনার, সে রচনার তুলনা নাই। তাই মহাকবি কালিদাস, রঘুবংশে সীতা-নির্ব্বাসন-কালে, অতি সতর্ক হস্তে রামের চরিত্র চিত্র করিয়াছেন। অতি অল্প কথায়, সীতানির্ব্বাসন-ব্যাপার বর্ণন করিয়াছেন। কালিদাসের

সরস্বতী অতি সংযত-পদে চলিয়া গিয়াছেন। বাল্মীকির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত না হইয়া, কালিদাস, রচনাকৌশলের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ভবভূতির বশবর্ত্তিনী বীণা-পাণির বিচরণ-ক্ষেত্র অন্যবিধ, তাই তাঁহার গমনের রীতিও অন্যপ্রকার। ভবভূতির কাব্য শ্রব্য নহে, দৃশ্য। বাল্মীকির শ্রব্য কাব্য রামায়ণের সহিত, কালিদাসের শ্রব্য কাব্য রঘুবংশের সম্বন্ধ কাব্য-ধর্ম্মানুসারে যতটা ঘনিষ্ঠ, ভবভূতির নাটকের তত নহে। যদি ভবভূতিও নাটকাকারে রামচরিত না লিখিয়া, রামায়ণের আদর্শে যেমন কালিদাস লিখিয়াছেন, তদ্রূপ, ছন্দোময় শ্রব্য কাব্যে রামচরিতের অনুবর্ণন করিতেন, তাহা হইলে, কালিদাসের ন্যায় ভবভূতিকেও নিয়ত বাল্মীকির সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতা পরিহার করিয়া চলিতে হইত। তাহা করিতে হয় নাই বলিয়াই, ভবভূতি, সীতানির্ব্বাসন-কালে, রামকে অধিকতর বিধুর করিয়া, কত বিলাপ, কত আর্ত্তনাদ করাইয়াছেন। ভবভূতিকে অল্পে অল্পে, ভয়ে ভয়ে, কথা বলিতে হয় নাই। ভবভূতি, তাঁহার হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। হাত দরাজ করিয়া অমৃত বর্ষণ করিয়াছেন। কল্পনায় বা রচনায় কোন প্রকার কৃপণতা করেন নাই।

শোকে, মোহে, ক্ষোভে, বিপদে প্রাণ যখন অধীর হয়, জীব যখন উন্মত্ত হয়, তাহার বিবেক-শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়া যায়, তখন তাহার মর্ম্মের করুণ ধ্বনি একটু দীর্ঘ হইলে, তাহাতে সৌন্দর্য্যের হানি ঘটে না, প্রত্যুত বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। শোক বা

বিপদের নিকটে স্ত্রীপুরুষ বিচার নাই। যমদণ্ডের ন্যায় শোকের প্রবল দণ্ডের প্রাণঘাতী প্রহার, স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে—সর্ব্বত্র সমভাবে পতিত হয়। অতি বড় পুরুষসিংহও তখন ললিতমনা মুগ্ধা ললনার ন্যায় রোদন করেন, বিলাপ করেন। জীবনে এমন অনেক বিপদ আসে, অনেক সময় আসে, যখন পুরুষের কঠোর হৃদয়, রমণীর নবনীত চিত্তের ন্যায় কোমল হয়, আবার অবলার কোমল হৃদয়েও মত্ত হস্তীর বল জন্মে। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি কর, দেখিবে,—শত শত সমরবিজয়ী, প্রবল-প্রতাপ কত বীর-চূড়ামণির অদম্য উৎসাহপূর্ণ বলিষ্ঠ হৃদয়,—সংসারের কত তাপ, কত আঘাত যে হৃদয়কে কদাচ দ্রবীভূত করিতে পারে নাই, তাদৃশ শক্তিধর হৃদয়ও আবার অবলা-হৃদয়ের ন্যায় অবশ হইয়াছে, কাতর হইয়াছে, প্রলয়-বাতাচূর্ণ স্থাণুর ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। যে বীর-শ্রেষ্ঠের নয়নে কেহ কখন অশ্রু দর্শন করে নাই, সেই নয়ন, সন্তত-বাহিনী অশ্রু-ধারায় পৃথিবীর তর্পণ করিতেছে,—এই প্রকার আবার, কত কুসুমকোমলা সংসার-ললামভূতা নারী তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ কোমলত্ব ত্যাগ করিয়া, কখন মহিষমর্দ্দিনী চামুণ্ডার আকার ধারণ করিতেছেন। তাই বলিতেছিলাম—শোকে, মোহে, সঙ্কটে, কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেই আত্মসত্তা ভুলিয়া যায়, আপন আপন প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট চিরপরিচিত মঞ্চ ত্যাগ-পূর্ব্বক, সকলে সমস্থানে, সমতলে আসিয়া মিলিত হয়। তাই, আজ সীতাপতি রামচন্দ্রকে, সীতার শোকে,—

মৃত্যুর শোক নহে, দৈবকৃত কোনরূপ বিপদের শোক নহে, আত্মকৃত সর্ব্বনাশের শোকে, রমণীর ন্যায় কান্দিতে ও বিলাপ করিতে দেখিতেছি। করুণার কবি ভবভূতি যেন দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে,—এই প্রকারে রামচরিত কল্পিত হইলে স্বষ্টির সৌন্দর্য্য সুচারুতম হইবে।

ভবভূতির যে রাম, তাঁহার চিরানন্দপ্রতিমা জনকতনয়ার এই শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিয়া, এবং সীতা একপল যাঁহার অদর্শনে জগত অন্ধকার দেখিতেন, চৈতন্য হারাইতেন, সীতার সেই প্রাণাধিক উপাস্যদেবতার, সীতাকৃত তাদৃশ আত্ম-সমর্পণের এই অদ্ভুত প্রতিদান স্মরণ করিয়া, রমণীর ন্যায় মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছিলেন, মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হইতেছিলেন, ইতস্ততঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গাঢ় অন্ধতমসে আচ্ছন্ন দেখিতেছিলেন, সেই রামের ইহার মধ্যেও কর্ত্তব্য-চিন্তার ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ত্রুটি ছিল না। তিনি যে মুহূর্ত্তে সীতাবল্লভ-রূপে কান্দিতে কান্দিতে মূর্চ্ছিত হইতেছিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই আবার অযোধ্যার অধীশ্বররূপে, প্রজা-রঞ্জন-যজ্ঞের যজমান-রূপে, সিংহের ন্যায় গাত্রকম্পন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেছিলেন। জ্ঞান এবং অজ্ঞানের, প্রলয় এবং স্বষ্টির ইহা এক বিচিত্র সমাবেশ। আলোক ও অন্ধকারের ইহা অদ্ভুত সংমিশ্রণ। প্রেমরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব স্বর্গীয় ও কমনীয় পদার্থের ইহা অনুপম প্রতিকৃতি। প্রেমের পবিত্র-স্পর্শে মানব দেবতা হয়, আজ রামকেও দেবতা করিল। রামের সীতাগত সীমাবদ্ধ প্রেম, বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইয়া, রাম-কর্ত্তৃক

সীতাকে নির্ব্বাসিত করিল। তোমার আমার ন্যায় সঙ্কীর্ণমনাঃ জড়প্রকৃতি ক্ষুদ্র মানব এই বিশ্বজনীন বিরাট প্রেমের আকার ধারণায় আনিতে পারে না। যে হৃদয় প্রেমে গঠিত নহে, এ দৃশ্য তাহার দ্রষ্টব্য নহে। যে প্রেমের আকর্ষণে পশুপতি উন্মত্ত, যে প্রেমের মোহন-মন্ত্রে, বৈকুণ্ঠপতি, স্বধাম ত্যাগপূর্ব্বক, মধুর বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়া, রাখাল বেশ ধরিয়া, তাঁহার বিশ্বপূজ্য মস্তকে গোপ-নন্দের বাধা বহন করেন, যে প্রেমের ছায়ায় বসিয়া দধীচি আত্মকঙ্কাল ইন্দ্রকে অর্পণ করেন, রামের ইহা সেই প্রেম, ইহা তোমার আমার চিন্তার অতীত। প্রেমাকুল মহাজনের চক্ষে আত্ম-পর ভেদ নাই, স্থান-অস্থান নাই। জগতের কোনরূপ লৌকিক নিয়মেই তিনি নিয়ত নহেন। প্রেমাকুলের প্রেমবিহ্বল প্রাণ জলে-অনলে, অমৃতে-গরলে কোন ভেদ জ্ঞান করে না। জীবনমরণে ইতরবিশেষ করিতে জানে না। প্রেম যুক্তির অধীন নহে, মুক্তির ভিখারী নহে। উচ্চনীচ, পাপপুণ্য, সুখদুঃখ, প্রেমের নিকটে সকলই সমান, প্রেম ইহাদের গুরু-লাঘব তৌল করিয়া নিজে খর্ব্ব হয় না। প্রেমের মাহাত্ম্যে জড়ে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়, আবার আলোকে অন্ধকার জন্মে। যাহার আকার নাই, প্রেম তাহাকে সাকার করিয়া জীবনের ভ্রম ঘুচাইয়া দেয়, আবার সাকারকে ক্রমে শূন্যে—নিরাকারে মিশ্রিত করে। এই অপূর্ব্ব প্রেমরত্নের যাঁহারা অধিকারী, বিরাট ব্রহ্মাণ্ড, তাঁহাদিগের নয়নে ঐ পুরোবর্ত্তিনী ধূলিকণার ন্যায় প্রতিভাত হয়। এই অমৃতে যাঁহারা

বিহ্বল, মৃত্যুঞ্জয়, তাঁহাদের ইহার উদ্দেশে অদেয় বা অকরণীয় কিছুই নাই, সম্ভবাসম্ভব নাই। এই প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াই, সীতাপতি রাম আজ তাঁহার প্রীতি-প্রতিমাকে বিসর্জ্জিত করিলেন, বিন্দুপরিমিত জল অনন্ত সিন্ধুতে মিশাইয়া দিলেন, যাহা কেহ কখন কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই, তাহা কার্য্যে পরিণত করিলেন। রাম স্বয়ং বিরাট পুরুষ, এ নির্ব্বাসন-ব্যাপারও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার অনুরূপ হইল। সৃষ্টির ইহা চরম উৎকর্ষ।

একাদশ অধ্যায়।

তপোবন।

পতিব্রতা সীতার নির্ব্বাসনব্যাপারদর্শনে, সামাজিকগণের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মর্ম্মান্তিক যাতনায় তাঁহারা একান্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা সকলেই বাষ্প-কলুষ-নয়নে ও আকুল-মনে, চিত্রলিখিতের ন্যায় নিস্পন্দভাবে বসিয়া আছেন; এমন সময়ে হঠাৎ দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইল। সুরম্য-তপোবনের চিত্তহারিণী মূর্ত্তি, মূর্ত্তিমতী শান্তির ন্যায়, তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। তপোবনের ছবি দেখিয়া, তাঁহারা কত কি ভাবিতে লাগিলেন। 'সীতার পুনরায় তপোবন-দর্শনের বাসনা হইয়াছিল, সীতা তাঁহার প্রিয়ঙ্কর রামকে সে কথা বলিয়াছিলেন, রাম সেই ছলে সীতাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। যে তপোবনে

অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী বিতাড়িত, সে যে কোন্ তপোবন, কোথায় তাহা অবস্থিত, দর্শকবৃন্দ অবগত নহেন। এ তপোবনের কেহ কি, সেই বিসর্জ্জিত প্রতিমার কোন সংবাদ জানে? কোন সংবাদ রাখে? এই তপোবনের কোন নিবাসী কি সীতার সংবাদ বলিয়া দর্শকগণের চিত্তের বেদনা কথঞ্চিৎ লঘু করিতে পারে?—এবংবিধ নানাপ্রকার আশার বিদ্যুৎ, আবার সেই সঙ্গে নৈরাশ্যের গাঢ় অন্ধকার, ক্ষণে ক্ষণে দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে খেলিতে লাগিল। চিরদিনের মত তাঁহারা যে দেবীকে হারাইয়াছেন, আর কোন দিন্ যে পুণ্যপ্রতিমার চরণদর্শন করিয়া পবিত্র হইতে পারিবেন না,—ভাবিয়াছেন, আজ আবার তাঁহার সংবাদ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা জন্মিল। হতাশ দর্শকবৃন্দ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত-হৃদয়ে ও স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় উদ্ভ্রান্তভাবে দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে রঙ্গমঞ্চে দুইটী ললনা প্রবেশ করিলেন; তাঁহাদের একটীর পরিচ্ছদ এবং আকার প্রকার দেখিলে, তাঁহাকে কোন পথিকবেশা তাপসী বলিয়া মনে হয়, অপরটীর আকার বনদেবতার ন্যায়। সেই অমরী-সদৃশী রমণী দুইটীর অকস্মাৎ অভ্যুপাগমে, দর্শকবৃন্দ চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের হৃদয়ে, যে আশার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কিরণ-রেখা পড়িয়াছিল, এক্ষণে তাহা উষার রশ্মিমালার ন্যায় দীপ্তি-ময়ী হইয়া, তাঁহাদের সমগ্র হৃদয় ভরিয়া ফেলিল। ইঁহাদিগের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, সীতার সম্বন্ধে কত কথা, কত প্রশ্ন, তাঁহারা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ঐ ললনাদ্বয়ের কত কথা, কত বিশ্রম্ভালাপ হইল। উভয়ে উভয়কে কত আদর করিলেন। দর্শকগণ, নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থিরভাবে সমস্ত দেখিলেন। পথিকবেশা তাপসী আত্রেয়ীর প্রশ্নের উত্তরে, যখন বনদেবতা বাসন্তী কহিলেন, 'দেবি! এই দিক্ দিয়া পঞ্চবটী বনে প্রবেশ করিয়া, গোদাবরীর তীরে যে পথ দেখিতে পাইবেন, সেই পথে অগস্ত্যের আশ্রমে যাইতে হইবে,' তখন তাপসী আত্রেয়ীর চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ জল পড়িতে লাগিল। বহুকালবিস্মৃত কি ঘটনা যেন অকস্মাৎ তাঁহার মনে পড়িল। তখন সেই তাপসী মুক্তকণ্ঠে কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন,—'এই কি সেই তপোবন? এই কি সেই পঞ্চবটী? ঐ কি সেই গোদাবরী? এই কি সেই প্রস্রবণ গিরি? আর দেবি, তুমি কি জনস্থানের সেই বনদেবতা বাসন্তী?' বনদেবতা বাসন্তীর আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়নযুগল বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল। তিনি প্রস্তরপ্রতিমার ন্যায় অচল ও স্পন্দহীন হইয়া, রোরুদ্যমানা তাপসীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সামাজিকগণ অবাক্ হইলেন। তাঁহাদের সীতা-বিসর্জ্জন-কাতর অন্তঃকরণে এক নূতন কাতরতা উপস্থিত হইল। সেই জনহীন দণ্ডকারণ্যে কে ইঁহারা, কেন এখানে এমনভাবে কিসের জন্য কান্দিতেছেন, তাপসীর বৈরাগ্যপূর্ণ চিত্ত কি বেদনায় অস্থির হইল? বনদেবতা বাসন্তীই বা, হতচৈতন্যার ন্যায় দাঁড়াইয়া কেন?—এই প্রকার নানাবিধ বিতর্কে সামাজিকগণের শোকাকুল হৃদয় একান্ত আকুলতর হইয়া উঠিল। মহাকবি, এই প্রকার দৃশ্যের অবতারণা-

পূর্ব্বক দর্শকদিগের হৃদয় যেন নিজের মুষ্টির মধ্যে করিয়া লইলেন। দর্শকদিগের চিত্তের আর কোনরূপ স্বাধীনতা রহিল না। সে হৃদয়, যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায়, কবির ইচ্ছার বশে চলিতে লাগিল। "হা বৎসে জানকি! এই তোমার সেই প্রিয় পঞ্চবটী, আর তুমি আজ কোথায়?"— বলিয়া আত্রেয়ী যখন মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন, তখন বাসন্তীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। ভয়ে, উৎকণ্ঠায়, আবেগে তিনি জড়ীভূতপ্রায় হইলেন। জনস্থানে বসতিকালে, বাসন্তীর সীতার সহিত অতিশয় সখীত্ব জন্মিয়াছিল। কতকাল হইল, অযোধ্যার সীতা অযোধ্যায় ফিরিয়া গিয়াছেন। বাসন্তী জানেন, তাঁহার প্রীতিময়, সীতাবল্লভ রামের অঙ্কে, তদীয় সখী জানকী বিরাজমানা। বাসন্তী জানেন, দুস্তর-জলধি-বন্ধন-পূর্ব্বক, সীতাসর্ব্বস্ব রাম যে রত্ন উদ্ধার করিয়াছিলেন, সে রত্ন রামেরই বক্ষে কৌস্তুভের ন্যায়, বিষ্ণুবক্ষে লক্ষ্মীর ন্যায়, শোভা পাইতেছে। বাসন্তী জানেন, তাঁহার যে অভিন্নহৃদয়া সীতা নিমেষব্যাপী রামবিচ্ছেদে ত্রিজগৎ অন্ধকার দেখেন, তিনি এখন রামের সহিত মিলিত,—অযোধ্যার বরণীয় সিংহাসনে, রামের বামে মূর্ত্তিমতী রাজলক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজিত। সেই সীতার উদ্দেশে 'তুমি আজ কোথায়!'—বলিয়া আত্রেয়ী যখন কান্দিয়া উঠিলেন, তখন বনদেবীর নয়নে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ঘুরিতে লাগিল, চেতনাশক্তি বিলুপ্তপ্রায় হইল। সীতার কি হইয়াছে—ভাবিয়া দেবী বাসন্তী ভয়ে, শোকে, বেদনায় বাতেরিত-কমল-দলবৎ

কাঁপিতে লাগিলেন। ক্রমে, অশ্রুসিক্ত-হৃদয়া তাপসীর মুখে, বনদেবতা, অযোধ্যার নূতন রাজা রামের অদ্ভুত প্রজারঞ্জনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন,—তাপসীকথিত বাক্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই, সীতাগতপ্রাণা বাসন্তী মূর্চ্ছিত হইয়া, বাণ-বিদ্ধা কুরঙ্গিণীর ন্যায়, পরশুনিকৃত্তা শালযষ্টির ন্যায়, স্বর্গচ্যুতা দেবতার ন্যায়, ভূতলে পতিত হইলেন। যে জনস্থানে রামের সহিত সীতা কত আনন্দে একদিন কাল কাটাইয়াছেন, আজ তথায়, সীতার সর্ব্বনাশবার্ত্তা ঘোষিত হওয়ায়, বনদেবতা বাসন্তীর সহিত সমগ্র বনস্থলীও যেন বিষণ্ণতার ধূসর আবরণে আচ্ছন্ন হইল। মহাকবি ভবভূতি, উত্তর-চরিতের এই স্থানে, করুণরসের যে বিষাদিনী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই।

তাপসী ও বনদেবতার কথোপকথনে, দর্শকগণের সেই অঙ্কুরিত আশালতিকা সমূলে ছিন্ন হইল। সীতাদেবীর সুসংবাদ ত দূরের কথা, আত্রেয়ীর মুখে, 'তুমি আজ কোথায় ?'—শুনিয়া, তাঁহারাও সীতার চরম অমঙ্গল স্মরণ করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। এই সকল স্থলে, কালিদাসের সহিত ভবভূতির প্রভেদ। কালিদাসের নির্ম্মিত করুণমূর্ত্তির দর্শনে দর্শক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করেন না, তাহাতে দর্শকের নয়ন 'অন্তঃস্তম্ভিত-বাষ্পবৃত্তিকলুষ' হয়। দর্শক বাষ্পদিগ্ধ-হৃদয়ে সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া, কেবল বসিয়া চিন্তা করেন। আর ভবভূতির চিত্রিত করুণমূর্ত্তির দর্শনে, দর্শক জ্ঞানশূন্য হইয়া, উন্মত্তের ন্যায়, মুক্তকণ্ঠে রোদন করেন। সে রোদনে অতি বড় কঠিনেরও চিত্ত দ্রবীভূত হয়।

সৌন্দর্য্যের কবি কালিদাসের সহিত ভাবের কবি ভবভূতির এই পার্থক্য সর্ব্বত্রই বিদ্যমান।

আত্রেয়ীর কথায় দর্শকগণের শোককাতর হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কোথায় সীতা? গহনবনে নির্ব্বাসিতা সীতার পরিণাম কি হইল, সেই গর্ভভর-খিন্না রামদয়িতার জীবন এতদিন আছে কি নাই? আত্রেয়ীর কথায় মনে হয়, সে দেবী-দেহ এ পঙ্কিল পৃথিবী হইতে বুঝি তাহার স্বধামে চলিয়া গিয়াছে,—ইত্যাদি নানা চিন্তায় দর্শকবৃন্দের আকুলহৃদয় সমাকুলতর হইল। কোথায় কোন্ বনে, কুমার লক্ষ্মণ তাঁহার ভ্রাতৃজায়াকে ফেলিয়া আসিলেন, তাহার পরই বা কি হইল?—ভাবিতে ভাবিতে সামাজিকমণ্ডলী নিরতিশয় বিষণ্ন হইয়া পড়িলেন। বাসন্তীর মনেও ঐ ভাবনা বলবতী। তাই তিনি আত্রেয়ীকে জিজ্ঞাসিলেন, "দেবি, সেই অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণ প্রত্যাবৃত্ত হওয়ার পর, দেবী জানকীর কি দশা ঘটিয়াছে?"—তাপসী কহিলেন, 'আর জানি না'। বাসন্তীর প্রশ্নে, দর্শকবৃন্দের চিত্তে আশার যে ক্ষীণ আলোকরেখা ভাসিয়াছিল, তাহা ছিন্ন হইল। বাসন্তীর সহিত তাঁহারাও নীরবে ও আনতবদনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বনদেবতা বাসন্তী ও তাপসী আত্রেয়ী—উভয়েই কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সামাজিকবৃন্দও নীরব, স্পন্দনরহিত। মহাকবির এই অনুপম বর্ণনা যখন পাঠ করি, তখন জনস্থানের সেই বিষাদময়ী ছবি, আত্রেয়ী-বাসন্তীর সেই শোক-

কাতর মলিন মুখচ্ছবি, উজ্জ্বল আলেখ্যের ন্যায়, নয়নের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। আবেগ ও অবসাদে হৃদয় যেন দমিয়া পড়ে।

কিয়ৎক্ষণ পরে, সজলনয়না বাসন্তী স্খলিতকণ্ঠে, আত্রেয়ীকে সীতার সম্বন্ধে আরও কত কি জিজ্ঞাসা করিলেন। সীতাকে বনবাস দিয়া, অযোধ্যার নূতন রাজা রামচন্দ্র এখন কি করিতেছেন, কেমন আছেন,—এই প্রশ্নের উত্তরে যখন আত্রেয়ী বলিলেন যে, রাজা এখন অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তখন বাসন্তীর হৃদয়ে যেন যুগপৎ শত সূচি বিদ্ধ হইতে লাগিল। 'কাহাকে সহধর্ম্মচারিণী করিয়া রাম এই যজ্ঞ করিতেছেন; কোন্ ভাগ্যবতী, বাসন্তীর প্রিয়সখী সীতার আসনে উপবিষ্ট,—হা ধিক্, শুধু নির্ব্বাসন নহে, রাম কি শেষে আবার পরিণয় পর্য্যন্তও করিলেন,'—ভাবিতে ভাবিতে সীতা-গত-প্রাণা বনদেবতা কান্দিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন আত্রেয়ী বলিলেন,—'সোণার সীতা গড়াইয়া, তাহাকেই সীতার স্থানে বসাইয়া রাম রাজার কর্ত্তব্য যজ্ঞ সম্পন্ন করিতেছেন,' তখন বাসন্তীর যেন পুনর্জ্জীবন আসিল, তিনি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। রামের উপর তাঁহার এতদিন অপরিমিত প্রীতিই ছিল, আজ, সোণার সীতার সংবাদে, রামের উপর বনদেবতার অপরিমিত ভক্তিও জন্মিল। যে রামকে, তিনি, আত্রেয়ীর সহিত কথোপকথন-কালে, কতবার, 'অযোধ্যার রাজা' বলিয়া শ্লেষ করিয়াছেন,—তুচ্ছ রাজ-পদের গৌরব রক্ষার জন্য রাম দেবী জানকীকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন,—ধিক্ তাঁহার রাজপদে, ধিক্ তাঁহার যশোলিপ্সায়,—ভাবিয়া, বাসন্তী যে

রামকে কত প্রকার কঠোর কথা বলিয়াছেন, এতক্ষণে বুঝিলেন যে, তাহা নহে, সে রাম শুধু পার্থিব অযোধ্যার রাজা নহেন, সে রাম অপার্থিব, অজেয়, দুর্লভ প্রেমরাজ্যেরও অপ্রতিরথ সম্রাট্। রামের মহচ্চরিত্র, উদার হৃদয়, ও অনুপম প্রণয় স্মরণ করিয়া, বনদেবতা মনে মনে ভক্তিভরে রামকে প্রণাম করিলেন। বাসন্তী বুঝিলেন যে, যাঁহারা প্রকৃত মহাপুরুষ, যাঁহাদের চিত্ত, বিধাতার অপার অনুগ্রহরূপ পূত পাদোদকে নিয়ত পবিত্র, মানব হইয়াও যাঁহারা দেবতা, তাঁহাদের সেই চিত্তের প্রকৃত স্বরূপ, যথার্থ পরিচয় সংসারের জীব কদাচ উপলব্ধি করিতে পারে না। মহাপুরুষগণের হৃদয় যে ক্ষণে বজ্রাপেক্ষাও কঠিন, তাহার পরক্ষণেই আবার কুসুমাপেক্ষাও কোমল হইয়া থাকে। সেই সকল নরদেবগণের প্রকৃত মূর্ত্তি সঙ্কীর্ণমতি মানবনয়নের অগম্য।[১] সোণার সীতার সংবাদে, সীতাশোককাতর সামাজিক-গণের হৃদয়েও প্রীতির মন্দাকিনী প্রবাহিত হইল। রাম অযোধ্যার রাজরাণী সীতাকে বনে বিসর্জ্জন দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের রাণী যে সীতা, তাঁহাকে বিসর্জ্জন দেন নাই, তাঁহাকে পূজা করিতেছেন,—ভাবিয়া, সীতা-বিসর্জ্জন-কাতর রামের দুঃখেও তাঁহাদের সমবেদনা জন্মিল। তাঁহারা এতক্ষণে স্পষ্টতররূপে বুঝিলেন যে, প্রজানুরঞ্জনের জন্য রাম কেবল সীতাকে বিসর্জ্জন দেন নাই, সীতার সহিত তদীয় হৃৎপিণ্ডকেও

১—উত্তর-চরিত—বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি।

উৎপাটিত করিয়া অতল দুঃখসাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। বাসন্তীর সহিত তাঁহাদেরও মস্তক, রামের উদ্দেশে আনত হইল। যে নয়ন হইতে এতক্ষণ শোকাশ্রু বিগলিত হইতেছিল, তাহাতে প্রেমাশ্রু উদ্ভূত হইল। কবিগুরু রত্নাকরের ইহা অতুল সৃষ্টি। মহাকবি ভবভূতি যে সমুদয় অনঘ পুষ্পাঞ্জলিদ্বারা সৃষ্টিকর শ্রেষ্ঠ বাল্মীকির ঐ অনুপম প্রতিমার অর্চ্চনা করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। বাল্মীকি তপোবলে মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন, ভবভূতিও আপন প্রতিভাবলে মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। যেমন বাল্মীকি গুরু, তাঁহার তেমনই শিষ্য ভবভূতি। ভবভূতির সমসাময়িক মনীস্বিবৃন্দ, তাহাকে যে শ্রীকণ্ঠ আখ্যায় বিমণ্ডিত করিয়াছিলেন, তাহা অনুরূপই হইয়াছিল। যাঁহার কণ্ঠে করুণাময়ী বীণাপাণি নিয়ত বিলাস না করেন, তাঁহার এরূপ সামর্থ্য, এই প্রকার সৃষ্টি-নৈপুণ্য অসম্ভব।

দ্বাদশ অধ্যায়।

রাম ও পঞ্চবটী।

বনদেবতা বাসন্তী ও তাপসী আত্রেয়ী চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই বিষাদমলিনা মূর্ত্তি স্বপ্নের মত দর্শকগণের নয়নে এখনও ভাসিতেছে। তাঁহাদের সেই হৃদয়বিদারিণী করুণ-বাক্যাবলী, সাগর-গামিনী উন্মাদিনী তটিনীর বহুপূর্ব্বশ্রুত কুলকুল বিলাপের ন্যায় এখনও দর্শকগণের কাণে বাজিতেছে। সেই সঙ্গে রামের সোণার সীতার কথা মুহুর্মুহু মনে পড়ায়, দর্শকবৃন্দ রামকে, নিয়ত উদ্দেশে প্রণাম করিতেছেন। রামের প্রেমময়ী মূর্ত্তি স্বস্ব হৃদয়ে স্থাপিত করিয়া, নানাবিধ মানসোপ-চারে তাহার পূজা করিতেছেন। রামের তথা রামহৃদয়ের সম্বন্ধে একটা সুদৃঢ় সংস্কার, আত্রেয়ী 'সোণার সীতা' এই এক কথায় দর্শকগণের চিত্তে বদ্ধমূল করিয়া গিয়াছেন। সেই সংস্কারবশে পরিচালিত হইয়া দর্শকগণ নিয়ত রামের অনুধ্যানে রত। বিরাট্ পৃথিবীর সমস্ত বিষয় হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়া, তাঁহাদের চিত্ত একমাত্র রামধ্যানে অভিনিবিষ্ট,—রামকে একবার দেখিবার জন্য আকুল। এমন সময়ে রাম আসিলেন। এতক্ষণ যাঁহাকে ধ্যানবলে, হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে মানসনয়নে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তিনি, সেই উপাস্য রামচন্দ্র সাধকরূপী দর্শক-বৃন্দের বহির্নয়নের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহারাও অকস্মাৎ, সেই হিরণ্ময়ী সীতা-প্রতিকৃতির প্রতিষ্ঠাতা রামকে

দেখিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। রামের আজ বিচিত্র বেশ। দয়াময় রামচন্দ্র আজ ঘাতকের ন্যায় কৃপাণ-হস্তে উপস্থিত। আজ তাঁহার বধ্য এক শূদ্র। তাহার অপরাধ, সে শূদ্র হইয়াও তপস্যা করিতে গিয়াছিল। রাজার কর্ত্তব্য শূদ্র-তপস্বীর বিনাশ-সাধন। তাই দয়াময় রঘূত্তম আজ রাজার কঠোর কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে রত। সেই শূদ্র-তপস্বীকে বধ করিতে উদ্যত। রাম অযোধ্যার রাজা, সুতরাং রাজার কর্ত্তব্য তাঁহাকে পালন করিতেই হইবে, কিন্তু দয়াময় রামচন্দ্রের কর্ত্তব্য অন্যবিধ, তাই দয়াময় রামের সহিত রাজা রামের এই তপস্বী-বিনাশ লইয়া নানা আন্দোলন হইতেছিল। যে রাম রাজার কর্ত্তব্য পালনের নিমিত্ত, দুর্ব্বহ-গর্ভ-ভর-কাতরা সীতাকে গহনবনে বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছেন, সেই রাম আজ তপস্বী শূদ্রকে বধ করিতে এত কাতর কেন? সেই রামের হৃদয়ে এত দয়া কেন? দয়ামায়ার ত মূলচ্ছেদে রাম সিদ্ধহস্ত, তবে আজ এ বিসদৃশ ভাব কেন? যে হাতে সীতাকে বনে দিয়াছেন, সে হাত ত এখনও বিদ্যমান, তবে আর বিষাদ কেন? করুণা,—তাহা ত অনেক দিন রামের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, তবে আর বৈমনস্য কেন?[১]—কৃপাণধারী দক্ষিণ হস্তকে উদ্দেশ

১—উত্তর-চরিত—রে হস্ত দক্ষিণ! মৃতস্য শিশোর্দ্বিজস্য
জীবাতবে বিসৃজ শূদ্রমুনৌ কৃপাণম্!
রামস্য পাত্রমসি, দুর্ব্বহ-গর্ভ-খিন্ন
সীতা-বিবাসন-পটোঃ করুণা কুতস্তে!!!

করিয়া, এই সমস্ত কথা বলিতে বলিতে, রাম যখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশপূর্ব্বক তপস্যারত শূদ্রমুনিকে খড়্গাঘাত করিলেন, তখন রামের মুখচ্ছবি, হৃদয়ভাব প্রভৃতি অনুভব করিয়া, তাঁহার সঙ্গে দর্শকগণও কান্দিয়া ফেলিলেন। হননের পর, যখন রাম বলিলেন, 'কৃতংরামসদৃশংকর্ম্ম' এইবার রামের মত কাজ হইল, তখন দর্শকগণের উচ্ছলিত হৃদয়বেগ একান্ত দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহারা নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা একপদেই বুঝিতে পারিলেন, যে, সীতাকে নির্ব্বাসিত করিয়া রাম কি সুখে আছেন। শোকের এমন সুসম্পূর্ণ চিত্র সংস্কৃত সাহিত্যে অতি বিরল।

রামের হস্তে নিহত হইয়া, শূদ্রতপস্বী দিব্য-দেহ-ধারণ-পূর্ব্বক অমরধামে যাত্রা করিলেন, নিরানন্দ রাম তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—"তুমি আনন্দময় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হও।" যাত্রাকালে তপস্বী বলিলেন, 'আমার তপস্যা সার্থক, নতুবা কোথায় অযোধ্যা, আর কোথায় এই দণ্ডকারণ্য! তপস্যা না করিলে কি আপনার দর্শনলাভ ঘটিত? আপনি কি এতদূরে আসিতেন?' মুক্ত তপস্বীর বাক্যে রামের চমক ভাঙ্গিল। দণ্ডকারণ্যের নাম শ্রবণেই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন; "এই কি দণ্ডকারণ্য?" বলিয়া রাম উদ্ভ্রান্তনয়নে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। অনেক দিন পরে আজ রাম আবার দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছেন। পূর্ব্ব-পরিচিত স্থানসমূহের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, অথচ সেই পরিচয়ের ছায়া সর্ব্বত্রই ভাসিতেছে, রাম তাই বিস্ময়-স্তিমিত-

নেত্রে চাহিয়া আছেন। এমন সময়ে, সেই মুক্ত তপস্বী আবার বলিলেন—'দেব! এইই দণ্ডকারণ্য, আপনি পূর্ব্বে যখন এই স্থানে বাস করিতেন, তখন, মনে পড়ে কি, সেই প্রচণ্ডপ্রতাপ খরদূষণ প্রভৃতি দুরন্ত রাক্ষসদিগের বিনাশ করিয়া, এস্থানকে নিরাপদ করিয়াছিলেন।' তপস্বীর এই উক্তিতে রাম বুঝিলেন যে, ইহা শুধু দণ্ডকারণ্য নহে, দণ্ডকারণ্যের মধ্যবর্ত্তী, রাম-সীতার বড়প্রিয়, সেই জনস্থানে রাম আসিয়াছেন। অকস্মাৎ খরদূষণের বিনাশকাহিনী স্মারিত হওয়ায়, রাম একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া, শূন্য-নয়নে চারিদিক্ দেখিতে লাগিলেন। অদূরে সেই প্রবলপরাক্রম খর রাক্ষসের আলয় এখনও বিদ্যমান। খর রামের হস্তে নিহত, কিন্তু তাহার নিবাসস্থান এখনও তাহার স্মৃতিচিহ্ন রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাম সে সমস্ত দেখিলেন। তাঁহার নয়নে, সেই অতীত বৃত্তান্ত যেন বর্ত্তমানবৎ ভাসিতে লাগিল। খরের নিধনবার্ত্তার স্মরণের সঙ্গে, আরও অনেক কথা রামের মনে পড়িল। সেই পূর্ব্বের ঘটনা-গুলি, যুগপৎ চিত্তমুকুরে প্রতিভাসিত হইল। রাম একান্ত উন্মনা হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে কহিলেন—'আহা! এই সমুদয় বন আমার সীতার বড়ই প্রিয় ছিল!' এই কথা বলিতে বলিতেই রামের চক্ষে জল আসিল। কত কথা মনে পড়িল। রাম দেখিলেন:—সেই জম্বু-নিকুঞ্জ-মধ্য-বাহিনী উপল-স্খলন-মুখরা নির্ঝরিণী এখনও বহিয়া চলিয়াছে, সেই শ্যামল-বনরাজিরূপ নীলবসন পরিধান করিয়া, কানন-

কুন্তলা প্রকৃতিসুন্দরী এখনও পূর্ব্বের মত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সেই কলবিরাবিণী ময়ূরশ্রেণী, সেই মদবিহ্বলা হরিণ-মণ্ডলী, সেই চিরনূতন বেতস-কুঞ্জ, এখনও তেমনি ভাবে,—রামের জীবনের যে সুখের দিন অতীত হইয়াছে, যে দিন আর আসিবে না, সেই দিনের সাক্ষিরূপে বিরাজ করিতেছে,—ঐ দূরে, নবজলদমালার ন্যায় প্রতীয়মান প্রস্রবণ গিরি, দর্শকের চিত্তে কেমন একটা স্বপ্নময় আবেশময় ভাব জাগাইয়া দিয়া এখনও পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান, আর ঐ তার পাদদেশবাহিনী চির-সুন্দরী গোদাবরী নদী, রজতরেখার ন্যায়, যেন কা'র উদ্দেশে এখনও অক্লান্তগমনে ছুটিতেছে, গতির বিরাম নাই। রাম দেখিলেন, দেখিলেন সে সবই আছে, রামও আছেন, কিন্তু একজন নাই, প্রকৃতির এই প্রাঞ্জলমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া যিনি আনন্দে অধীর হইতেন, প্রস্তর-প্রতিমার ন্যায় নিস্পন্দভাবে, যিনি স্বভাবের এই বিচিত্র লীলানিকেতন বসিয়া বসিয়া দেখিতেন, তিনি নাই, রামের সেই দ্বিতীয়উচ্ছ্বসিতসদৃশী মুগ্ধা জানকী আজ কোথায়? তখন উন্মত্তের ন্যায় উদাস-হৃদয়ে, রাম একাকী বলিতে লাগিলেন—'এই বনেইত সেই পঞ্চবটী, সীতাকে লইয়া কত কুঞ্জে কুঞ্জে শৈলে শৈলে ভ্রমণ করিতাম, কত বিশ্রম্ভালাপ করিতাম, সে ভ্রমণে ক্লান্তি ছিল না, সে আলাপের অন্ত ছিল না, ঐত সেই সমস্ত কুঞ্জবন ও গিরিরাজি এখনও আমাদের সেই সময়ের সাক্ষীর ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। আহা! এই স্থানেই আমার সীতার প্রিয়সখী বনদেবতা বাসন্তী

বাস করেন। এ স্থানে আমাকে কে আনিল রে! হতভাগ্য রামের ভাগ্যে আবার এ বিড়ম্বনা কে ঘটাইল রে! আমার হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে যে বিষব্রণ চিরদিনের জন্য বদ্ধমূল হইয়া আছে, আজ তাহা যেন স্ফুটিত হইতেছে। যে শোকের জ্বালায় দিবানিশি আমি পুড়িতেছি, সে শোকানল আজ নূতন আকারে প্রজ্বলিত হইল। এ সকল কি? আমি কি জাগ্রত না সুপ্ত! প্রকৃতিস্থ না উন্মত্ত! আমার জীবনের ন্যায় এই পঞ্চবটীরও স্থানে স্থানে কত বিপর্য্যয় দেখিতেছি। যখন সীতার সহিত এই বনে বাস করিতাম, তখন যেখানে তটিনী ছিল, আজ তথায় খরস্রোতঃ প্রবাহিত, পূর্ব্বে যেখানে বিশাল প্রান্তর ধূ ধূ করিত, আজ তথায় সুন্দর বনবীথিকা। সেই পূর্ব্ব পরিচিত, আমাদের অতীত জীবনের সাক্ষী পর্ব্বতনিচয় যদি না থাকিত, তাহা হইলে হয়ত এত সত্বর এ স্থান আমি চিনিতেই পারিতাম না। একি সত্যই পঞ্চবটী? না আমার জীবনে যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, সেই বিপর্য্যয়ের প্রভাবে আজ এই সুখময়ী পঞ্চবটীকেও আমি বিপর্য্যস্ত দেখিতেছি? কিছুইত বুঝিতেছি না।'—বলিতে বলিতে রাম অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। একদিন, যে পঞ্চবটীতে সীতার সহিত রাম কত সুখে কাল কাটাইয়াছেন, তখন যে পঞ্চবটীর তুলনায়, রাজপ্রাসাদও রামের আকাঙ্ক্ষিত ছিল না। দিন ছিল না, রাত্রি ছিল না, সতত সীতার সহিত কথোপকথনে যে পঞ্চবটীতে কালহরণ করিতেন, আজ সীতাশূন্য রাম, একাকী, সেই সুখস্বপ্নের একমাত্র সাক্ষি-

রূপিণী পঞ্চবটীতে উপস্থিত। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ উপস্থিত হইলে, যেরূপ যেরূপ ঘটে, যাহা যাহা হয়, রামেরও তাহাই হইল,—রামের হৃদয় দুর্ব্বহ-শোক-ভরে একবারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি কান্দিতে কান্দিতে এক প্রস্তর ফলকে উপবেশন করিলেন। সম্মুখে পঞ্চবটীর নয়নরঞ্জিনী সুষমা নৃত্য করিতে করিতে আসিয়া, যেন কোন যাদুমন্ত্রে, রামকে হতচৈতন্য করিয়া ফেলিল। এরূপ ক্ষেত্রে পড়িলে মানুষ বাঁচে না, মরিয়া যায়। সামাজিকগণের চিত্ত পূর্ব্ব হইতেই রামের প্রতি সমবেদন হইয়াছিল, এইক্ষণ, এই ব্যাপারে, তাঁহারাও রামের কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বুঝিলেন যে, এমন স্থানে আসিতে নাই। রামের ন্যায় প্রেমময় পুরুষের এরূপ স্থানে আসিলে, বিষম 'অত্যাহিত' ঘটিবার সম্ভাবনা। এ আবার কি নূতন বিপদ্! কি আকস্মিক সর্ব্বনাশ!

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ছায়া।

ভবভূতি-প্রণীত নাটকত্রয়ের মধ্যে উত্তরচরিত যেমন সর্ব্বাংশে সর্ব্বোত্তম, তদ্রূপ, উত্তরচরিতের মধ্যে আবার এই ছায়া নামক তৃতীয় অঙ্ক অতি মনোজ্ঞ। মহাকবির এই 'ছায়ার' তুলনা নাই। কত সূক্ষ্মদৃষ্টি সমালোচক এই 'ছায়ার' কত প্রকার সমাধান করিয়াছেন, কত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার দ্বারা এই ছায়ার কতরূপ ছায়া আঁকিয়াছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে মনে বড়ই শঙ্কা হয়। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, ছায়া সম্বন্ধে কিছুই বলিব না। কিন্তু শেষে একজন বঙ্গীয় কবির

"যেখানে তপন ভাসে,
যথায় চন্দ্রমা হাসে,
সে আকাশে ঝিকিমিকি জোনাকি কি জ্বলে না?"

এই সুন্দর উক্তিটি মনে পড়িল। তাই সশঙ্কহৃদয়ে ছায়া লিখিতে বসিলাম। লেখনী ধরিবার পূর্ব্বে একটি প্রশ্ন মনে উদিত হইল। প্রশ্নটি এই=কবির উদ্দেশ্য কি?—অর্থাৎ যাঁহারা সুদৃশ্য নাটক ও সুশ্রাব্য কাব্যের রচনা দ্বারা লোক-শিক্ষা দিতে চাহেন, সৌন্দর্য্যের নয়ন-রঞ্জন বিমগুনে মণ্ডিত করিয়া নানাবিধ পবিত্র মূর্ত্তির প্রদর্শনপূর্ব্বক দর্শকদিগের চিত্ত পবিত্র করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই সমুদয় কবিগণের ঐ লোকশিক্ষা ব্যতীত, অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে কি? কাব্যের উদ্দেশ্য এক, দর্শনশাস্ত্রের

উদ্দেশ্য অন্য,—দর্শনে কাব্যের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, সাধন করিবার প্রয়াস করাও বৃথা, এই প্রকার কাব্য শাস্ত্রের কোমল দেহে, দর্শনের গুরুভার চাপাইয়া দেওয়াও অন্যায়। প্রতিভার প্রভাবে যে কোন মনস্বী হয়ত, যাহা প্রকৃতই যাহা নয়, তাহাকে তদ্রূপে বর্ণনা করিয়া অনেকটা কৃতকার্য্য হইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে সত্য গোপন থাকিবে না, সে আপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। সৌন্দর্য্যের কবি কালিদাস অথবা ভাবের কবি ভব-ভূতির কাব্য নিচয়ের কোন সৃষ্টিতে দার্শনিক ভাবের আরোপ করায়, বা তাঁহাদের কাব্যের প্রত্যেক মূর্ত্তিতে আধ্যাত্মিকতার স্বপ্ন দেখায় কাব্যের তথা কবির বিষম সর্ব্বনাশ। শরতের নয়নরঞ্জন চন্দ্রমার নির্ম্মল চন্দ্রিকা উপেক্ষা করিয়া, তদীয় কলঙ্কের বিশ্লেষণ অন্যায়। সুতরাং ছায়ার কোনরূপ আধ্যা-ত্মিক ব্যাখ্যা, মনে হয়, সমীচীন নহে। তবে আমার এ ধারণা হয়ত ঠিক নাও হইতে পারে।

যেমন কোন একটী কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে, একটি প্রধান কারণ ও অপর কতিপয় সমবায়ী কারণ আবশ্যক, সেই কারণমালার আবার প্রত্যেকে স্ব স্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য করিয়া, যেমন ঐ প্রধান মূলকার্য্যের সহায়তা করে, তদ্রূপ কাব্যের প্রধান যে উদ্দেশ্য, তাহা সাধন করিবার জন্য, কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের অবতারণার প্রয়োজন। ঐ সমস্ত বিষয়েরই মুখ্য কার্য্য হইল ঐ মূল উদ্দেশ্যের সহায়তা-সাধন। কোন একখানি আলেখ্যে অঙ্কিত কোন মূর্ত্তির সৌষ্ঠব-সম্পাদনের জন্য, যেমন

ঐ মূর্ত্তির পশ্চাদ্‌ভাগে ও পার্শ্বদেশে কত প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র বিন্যস্ত করিতে হয়, তদ্রূপ যে বিষয় কাব্যের প্রধান উপজীব্য বা জীবন, অর্থাৎ যাহা সুপ্রতিপন্ন করিবার জন্য কাব্য নির্ম্মাণ, সেই জীবন সঞ্জীবিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য, সেই প্রধান উদ্দেশ্যকে সুপরিস্ফুট করিবার জন্য, কতকগুলি অবান্তর বিষয়ের অবতারণাও একান্ত আবশ্যক। এই কারণেই কাব্যে প্রতি নায়কের সৃষ্টি এবং এই কারণেই কাব্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার গ্রন্থি বিনিবিষ্ট হইয়া থাকে। দেশের নানাস্থানে, কোথাও সরলভাবে, কোথাও বক্রগমনে কত নদী প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু ঐ সকল নদীরই প্রধান গন্তব্য যেমন এক সমুদ্র, তদ্রূপ কাব্যের মধ্যে যত প্রকার ভাল মন্দ ঘটনাই থাকুক না কেন, ঐ সমস্ত ঘটনারই প্রতিপাদ্য কিন্তু ঐ এক,—মুখ্য উদ্দেশ্যের সাধন। একটু নিবিষ্ট-নয়নে অবলোকন করিলে দেখা যায় যে, কাব্যান্তর্ভূত সমস্ত ঘটনাগুলির মধ্যে একটি সুন্দর সম্বন্ধ বিদ্যমান। একগাছি সূক্ষ্ম শৃঙ্খলে, সূত্রে কুসুমের ন্যায়, কাব্যের সমস্ত ঘটনাগুলি যেন গ্রথিত, আর ঐ গ্রথিত ঘটনামালার ঠিক মধ্যস্থলে, কাব্যের ঐ প্রধান উদ্দেশ্য, কমনীয় হারমধ্যগত মধ্যমণির ন্যায় বিরাজিত। এখন দেখা যাউক, উত্তর-চরিতের প্রধান উদ্দেশ্য কি? এবং সেই উদ্দেশ্যের সহিত এই ছায়ানামক অঙ্কেরই বা কি সম্বন্ধ।

১। উত্তরচরিতের নাটকগত প্রধান উদ্দেশ্য বোধ হয়, দেব দম্পতিকল্প রামজানকীর অলৌকিক প্রণয় বর্ণনা। সেই অপার্থিব

প্রণয়ের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণন করিতে হইলে, সেই প্রণয়রূপ পবিত্র নির্ঝর যে উৎস হইতে উত্থিত, রামজানকীর কেবল প্রেমপূর্ণ, সেই উৎসরূপী অনাবিল হৃদয়ের সম্যক্ পরিচয় প্রথমতঃ অপেক্ষিত। সেই পরিচয়ের প্রধান অভিজ্ঞান হইল এই ছায়া।

২। লাঞ্ছিত ব্যক্তির মনে স্বতই আকাঙ্ক্ষা জন্মে যে, যাঁহার চরণে সে, ভূত, ভবিষ্যৎ, ইহকাল পরকাল, সমস্ত ভুলিয়া, মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল, অপরাধের লেশমাত্রও ছিল না, তবুও যিনি পূর্ব্বাপর—সমস্ত একপদে বিস্মৃত হইয়া, পাষাণে বুক বাঁধিয়া, বিভীষিকাময়ী স্রোতস্বিনীর উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল অতল গর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তিনি এখন কেমন আছেন; যাহাকে সারাজীবন কত আদর করিয়াও আশা মিটিত না, তাহাকে বিড়ম্বিত করিয়া, এখন তিনি কি ভাবে, সুখে না দুঃখে কালযাপন করিতেছেন। লাঞ্ছিতের মনে এ আকাঙ্ক্ষা অস্বাভাবিক নহে। বিশেষতঃ সীতা, যাঁহার হৃদয়ের পৃথক অস্তিত্ব ছিল না বলিলেই হয়; যাঁহার হৃদয়ের রাম ধ্যান, রাম জ্ঞান। পিতা জনক ধনুর্ভঙ্গপণ করিয়া, যাঁহার করে সীতাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন; কি শৈশবে কি যৌবনে, কি রাজপ্রাসাদে কি গহন-অরণ্যে, ছায়ার ন্যায়, যে সীতা রামের সহচরী ছিলেন; সেই সীতা,—রামের সেই আদর, সেই সন্তর্পণ, সেই সীতা-সর্ব্বস্ব হৃদয় যে সীতার মনে সতত জাগিতেছিল,—সেই সীতা তাঁহার প্রাণাধিক কর্ত্তৃক বিনাদোষে নির্ব্বাসিতা। রাজার নন্দিনী,

রাজার মহিষী সীতাকে দুর্ব্বিহ জীবনের অবশিষ্ট কাল, নির্ব্বান্ধব অরণ্যে কাটাইতে হইবে, ইহাতে সীতার যত-না-দুঃখ, যত-না-আশঙ্কা, তাঁহার রাম তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিলেন, ইহাতে ততোধিক দুঃখ, এবেদনার সীমা নাই। সীতার সেই রামের আজ কি দশা, তাহা জানিতে সীতার মনে প্রবল বাসনা জন্মিবার কথা, যদি সে বাসনা না জন্মে, তবে সীতাপ্রতিমার অঙ্গহানি হয়। কবিসৃষ্টিতে দোষ থাকিয়া যায়। সীতার সেই বাসনা, এবং তাহার পূরণ, এই বিষয় সুপরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিবার জন্যই এই 'ছায়া'রূপ আলোকযন্ত্রের প্রয়োজন।

৩। কালিদাসের নির্ব্বাসিতা সীতা, তাঁহার হৃদয়দেবতা রামচন্দ্রের সীতাবিহীন কষ্টময় জীবনের কাহিনী অন্যের মুখে শুনিয়াই, 'দুর্ব্বার পরিত্যাগ-দুঃখ' কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়াছিলেন। আর ভবভূতির সীতা, সীতাশোককাতর, মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিত, দীনাতিদীন রামচন্দ্রের সেই ভীষণ অবস্থা, রামেরই পার্শ্বে থাকিয়া স্বচক্ষে দেখিতেছেন, রামের প্রসাদে প্রসন্ন এবং রামের বিষাদে বিষণ্ণ হইতেছেন। কালিদাসের সেই সুগঠিত প্রতিমার গাত্রে ভবভূতির এই ছায়া এক দিব্য আভরণ-স্বরূপ।

৪। কালিদাসের দুষ্মন্ত যখন শাপমুক্তস্মৃতি হইয়া শকুন্তলার জন্য উন্মত্ত, তখন, শকুন্তলার সখীসদৃশী, অপ্সরা সানুমতী তিরস্করিণী বিদ্যার প্রভাবে, লোকনয়নের অন্তরালে থাকিয়া, দুষ্মন্তের সেই বিরহ, বিলাপ, উন্মাদ প্রভৃতি একে একে

দেখিতেছিল, এবং মনে মনে বলিতেছিল,—স্বামী যা'র এমন অগাধ প্রণয়ের আধার, তা'র নারীজন্ম সার্থক, শকুন্তলার জীবন ধন্য। সে ভাবিতেছিল যে, সে যাইয়া শকুন্তলাকে, রাজার এই বিরহোন্মাদ বিবৃত করিবে। তাহা হইলে, দুষ্যন্তকৃত পরিত্যাগরূপ যে বিষদিগ্ধ শল্যে হতভাগিনী শকুন্তলা মৃতকল্পা, সে শল্য উত্থিত হইবে। দুঃখিনীর দুঃসহ দুঃখের কথঞ্চিৎ লাঘব ঘটিবে। কালিদাসের সীতার ন্যায় কালিদাসের শকুন্তলাও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপন হৃদয়েশ্বরের বিড়ম্বনা প্রত্যক্ষ করিতে আসেন নাই। কালিদাস সৌন্দর্য্যের উপাসক, সুতরাং সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির জন্য যত টুকু প্রয়োজন, তিনি তদতিরিক্ত একবিন্দুও নির্ম্মাণ করেন নাই। কিন্তু ভাবের কবি ভবভূতির কল্পনার গতি অন্য প্রকার। ভাবের সম্যক্‌স্ফুরণের জন্য ভবভূতিকে কালিদাসের প্রতিমার অঙ্গরাগ করিতে হইয়াছে। সৌন্দর্য্য এবং ভাব এক পদার্থ নহে। সৌন্দর্য্যের স্থষ্টিকর্ত্তার যে উপকরণ, ভাবের স্ফুরণ করাই যাঁহার মুখ্য ব্রত, তাঁহার সে উপকরণ নহে। তাই কালিদাসের সীতার বা শকুন্তলার, অন্যের মুখে যাহা শুনিয়া পরিতৃপ্তি, ভবভূতির সীতার তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া পরিতৃপ্তি। এই ছায়া তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত। কালিদাসের অঙ্কিত মূর্ত্তিতে ইহা ভবভূতির বর্ণসংযোগ-স্বরূপ।

বহির্দৃষ্টিতে ছায়ার ঐ কতিপয় কারণ উপলব্ধ হয় বটে, কিন্তু ছায়ার নাটকীয় উপযোগিতা (dramatic effect) কি, অর্থাৎ ছায়া অঙ্কিত না হইলে উত্তর-চরিত-নাটকের প্রধান

প্রতিপাদ্য বিষয়ের কতদূর অঙ্গহানি হইত, এবং ছায়ার বিরচনেই বা তাহার কতটা শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা সম্যক্‌প্রকারে বুঝিতে না পারিলে, মাত্র ঐ কতিপয় কারণ-পরিজ্ঞানে চিত্তের কৌতূহল নিবৃত্ত হইবে না। সুতরাং ইহারও আলোচনা আবশ্যক।

৫। অলীক লোকাপবাদে রাম, তাঁহার হৃদয়ের অধিদেবতারূপিণী শুদ্ধশীলা জানকীকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সীতার চরিত্রে, তাঁহার ক্ষণকালের জন্যও কোনরূপ সংশয় জন্মে নাই। সীতার সহিত বনবাসকালে, রাম যে সমুদয় মনোমোহন স্থানে, কত সুখে কালযাপন করিয়াছেন, এখন সীতাহীন রামের নিকট যাহা স্বপ্নের ন্যায়, আজ এই ঘোর দুঃখের দিনে, রাম একাকী বসিয়া, সেই পূর্ব্বানুভুক্ত যে সকল স্থানের কথা এবং সেই সঙ্গে, সেই সেই স্থানের তদানীন্তন স্থির-সৌদামিনী সীতার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়া-থাকেন, রাম আজ একাকী সেই সকল স্থানে আসিতেছেন। যে লতাগৃহে বসিয়া, রাম, 'কৈ!—সীতা ত এখনও আসিলেন না, আমাকে একাকী ফেলিয়া গোদাবরী তটে তাঁহার কেন এত বিলম্ব?'—ভাবিয়া, উৎকণ্ঠিত-প্রাণে, সীতার পথের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, আর সীতা, 'আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, ঘোর অপরাধ করিয়াছি, আর্য্যপুত্রকে কুটীরে একাকী রাখিয়া, নদীর তটে আমি হাঁসের সঙ্গে খেলায় ভুলিয়াছিলাম, ছি!'—ভাবিয়া সলজ্জ-হৃদয়ে, সুন্দর করচম্পকদ্বয় যুক্ত করিয়া, অপরাধিনীর

ন্যায়, প্রণাম করিতে করিতে রামের সম্মুখীন হইতেন,[১] সীতার সেই ভীত-মুগ্ধা মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, রামের নয়নে যেন, আনন্দে, মোহে, সম্ভ্রমে, কেমন একটা জড়তা জন্মিত, সীতার সেই দিনের সে মূর্ত্তি রাম কখনও ভুলিতে পারেন নাই, পারিবেন না, আজ রাম সেই লতাকুঞ্জে আসিবেন। সীতাকে বনে দিয়া, অযোধ্যার রাজকার্য্যে নিয়ত অন্যমনস্ক থাকিতে চেষ্টা করিয়া এতদিন রাম কোন মতে বাঁচিয়া ছিলেন, কিন্তু আজ—কার্য্যান্তর-নিরপেক্ষ শোকদ্বিতীয় রাম, একাকী গহনবনে আসিয়া, মিলনের সেই সেই সাক্ষিরূপী নিদর্শন দেখিয়া হয়ত একান্ত বিপন্ন হইবেন। সীতার চিন্তায় রামের হৃদয় জীর্ণ, শতচ্ছিদ্র-সমন্বিত, কিন্তু লোকালয়ে তবুও কতক পরিমাণে সে হৃদয়ের বিশ্রাম ছিল ; আজ নির্জ্জন বনে, প্রতিপদে, তরুলতার প্রতিপত্রকম্পনে, বনকুসুমের প্রতিকেশরে সীতার ছায়া প্রতিবিম্বিত হইবে। সেই সুখের দিনের তুলনায়, এই দুঃখের দিন একান্ত দুর্ব্বিহ হইয়া উঠিবে। এরূপ ক্ষেত্রে, ভগ্নহৃদয়, বুঝি বা এজন্মের মত ভাঙ্গিয়া পড়িবে। বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায়, হয়ত হৃদয়কুসুম একেবারে ভূমিসাৎ হইবে।

১—উত্তর-চরিত-৩য় অঙ্ক—

বাসন্তী—অস্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্-মার্গ-দত্তেক্ষণঃ।
সা হংসৈঃ কৃত-কৌতুকা চিরমভূদ্ গোদাবরী-সৈকতে।
আয়ান্ত্যা পরিদুর্ম্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বদ্ধস্তয়া
কাতর্য্যাদরবিন্দ-কুট্মল-নিভো মুগ্ধঃ প্রণামাঞ্জলিঃ॥

সুতরাং ইহার একটা প্রতিপ্রসবের প্রয়োজন। সীতাময়প্রাণ রামের যাহাতে প্রাণের কোনরূপ অত্যয় না ঘটে, তাহা করা একান্ত আবশ্যক।

৬। শম্বূককে মুক্তি দান করিয়া, রাম অগস্ত্যের আশ্রমে গিয়াছিলেন। অগস্ত্যপত্নী বৎসলা লোপামুদ্রা, রামের শোক ক্ষীণ কলেবর ও বিষাদ-মলিন মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন। স্নেহময়ীর হৃদয়ে রামের সম্বন্ধে কত অমঙ্গলের আশঙ্কা উদিত হইয়াছিল। সেই আশঙ্কায় তাঁহার শরীর কণ্টকিত ও নয়ন অশ্রু-ধারাপ্লুত হইয়াছিল। রামের প্রত্যাবর্ত্তন পথে পঞ্চবটীবন। সেই বনে প্রবেশ করিলে, রামের কষ্টের আর অবধি থাকিবে না। সীতাশোকে একেই ত রামের দেহের এই অবস্থা, তার পর যদি আবার, পঞ্চবটীবনে, সীতা-সহবাসের সাক্ষিরূপী প্রদেশসমূহ রামের দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তখন আর বিপদের শেষ থাকিবে না। প্রতিপদেই চরম অমঙ্গলের সম্ভাবনা। তাই মাতৃরূপিণী লোপামুদ্রা, মুরলার মুখে, গোদাবরীকে পূর্ব্বাহ্নেই বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, গোদাবরি! সাবধান। পঞ্চবটীবনে, রামের ক্ষণে ক্ষণে মোহ ঘটিবার কথা। যদি ঘটে, তবে তুমি কখন শীকরবাহী সুশীতল তরঙ্গ-বায়ুর দ্বারা, কখন বা কমল-পরাগ-সুরভি মৃদুল সমীর দ্বারা, রামভদ্রের জীবনের তাপ প্রশমিত করিও।—যদিও রাম স্বভাবতই ধীর, কিন্তু পঞ্চবটীবনে সীতার সহিত যে সকল স্থানে স্বচ্ছন্দ বিহার করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থান-দর্শনে

রামের সে ধীরত্ব বিলুপ্ত হইবে। পঞ্চবটী দর্শনজনিত দুঃসহ আবেগের গুরুভারে সীতাবিয়োগকাতর রামের হৃদয় একান্ত বিধুর হইয়া পড়িবে। সাবধান। লোপামুদ্রার এই আশঙ্কা-জনক আদেশ লইয়া মুরলা সম্ভ্রান্ত-হৃদয়ে চলিয়াছেন, পথিমধ্যে তমসার সহিত সাক্ষাৎ হইল। মুরলার মুখে তমসা সমস্ত শুনি-লেন। শুনিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, রামের জীবনরক্ষার উপায় চারিদিক হইতেই সন্নিহিত হইতেছে। রাম শম্বূক বধ করিয়া পুনরায় জনস্থানে আসিতে পারেন,—এই কথা সরযূর মুখ হইতে শুনিয়া, সৌরকুলহিতৈষিণী দেবী ভাগীরথীও লোপা-মুদ্রার ন্যায়, রামের নানাবিধ বিপদের আশঙ্কা করিয়াছেন। এবং সেই আপতিষ্যমাণ বিপদের প্রতিবিধান-মানসে, কৌশল-পূর্ব্বক, সীতাকে পঞ্চবটীবনে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। লক্ষ্মণ গর্ভভরালসা সীতাকে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনের সন্নিকটে বনবাস দিয়া গিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে, যখন প্রসববেদনা উপস্থিত হইল, তখন নিরাশ্রয়া, দুঃখিনী, রাজনন্দিনী সীতা, হৃদয়ের আবেগে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া, গঙ্গাপ্রবাহে ঝাঁপ্‌ দিয়াছিলেন। সৌরকুল-পাবনী সেই ভাগীরথীর গর্ভে সীতার দুইটী পুত্র জন্মে। তখন সীতার জননী পৃথিবী এবং পতিকুল-দেবতা জাহ্নবী—উভয়ে সাগ্রহে পুত্রবতী জানকীকে পাতালে লইয়া যান্‌। স্তন্যত্যাগের পরই গঙ্গাদেবী, সীতার সেই কুমারযুগলকে, মহর্ষি বাল্মীকির নিকটে, নিজে যাইয়া রাখিয়া আসেন। আজ সেই কুমারদ্বয়ের দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম

পূর্ণ হইবে, আজ জন্মতিথি-পূজার দিন। তাই ভাগীরথী সীতাকে বলিয়াছেন, 'মা! আজ তোমার পুত্রদের জন্মদিনোৎসব, তোমার শ্বশুরকুলের আদিদেবতা, মনুবংশীয় রাজর্ষিগণের প্রসবিতা, নিখিলকলুষহারী সূর্য্যদেবকে, তুমি স্বয়ং কুসুমচয়ন-পূর্ব্বক আজ অর্চ্চনা করিও। তুমি যখন অবনিপৃষ্ঠে বিচরণ করিবে, তখন, আমি বলিতেছি, বনদেবতাগণ পর্য্যন্তও তোমাকে দেখিতে পাইবেন না, মানুষের ত কথাই নাই।' ভাগীরথীর আদেশে সীতা কুসুমচয়ন করিতে আসিয়াছেন, সঙ্গে তাঁহার রসাতলসঙ্গিনী তমসা।—সীতা তমসা হইতে কিছু দূরে আছেন, এমন সময়ে মুরলার সহিত তমসার সাক্ষাৎ হইল। তমসা রামের জীবনরক্ষার্থিনী গঙ্গার কৌশল মুরলাকে বলিয়া দিলেন। পঞ্চবটীবনে আসিয়া রাম ঘোর বিপদে পড়িবেন, প্রতিক্ষণে সীতার ছবি, সীতার কার্য্য, সীতার কথা, মনে পড়ায় রামের সংজ্ঞালোপ ঘটিবে। সেই নির্জ্জনবনে তখন কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে, কে তাঁহার শুশ্রূষা করিবে? জগন্মঙ্গল রামের জীবিতসর্ব্বস্ব সীতার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই, কেননা, রামের অনুমতি ব্যতীত সীতা রামের সম্মুখীন হইবেন না, তাই ছায়াময়ী সীতার দ্বারা শোকানল-দগ্ধ রামের হৃদয়ে কুলদেবতা জাহ্নবী, শান্তিপ্রলেপ দেওয়াইলেন।—পঞ্চবটীতে রামের প্রাণাত্যয়ের সম্ভব ছিল, ছায়াময়ীকে পাঠাইয়া, জাহ্নবী সে বিপদ্ নিবারণ করিলেন। কি সুন্দর চিত্র! সীতা জানেন না,—আজ কোথায় যাইতেছেন, কাহার মূর্ত্তি

দর্শন করিতে পাইবেন ? রাম জানেন না,—কে আসিতেছে, কাহার করস্পর্শে আজ নবজীবন লাভ করিবেন ? কবিকল্পনার ইহা চরম উৎকর্ষ। পঞ্চবটীতে রামের জীবনধ্বংসের যে সম্ভাবনা ছিল, সেই সম্ভাবনা দূর করিবার জন্যই এই ছায়ময়ী সীতার সৃষ্টি। এই অংশেই ছায়ার নাটকীয় উপযোগিতা বলিয়া মনে হয়। তবে কবির কবিত্ব সম্বন্ধে কোন ধারণা দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করা অন্যায়, তাই ভয়ে ভয়ে এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই বিরত হওয়া সঙ্গত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

জাগ্রতের স্বপ্ন।

অগস্ত্যের আশ্রম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে, রাম পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিয়াছেন, এ দিকে, পুত্রদ্বয়ের দ্বাদশবার্ষিক জন্মতিথিপূজার জন্য স্বহস্তে কুসুমচয়ন করিতে, ভাগীরথীর আদেশমতে, ছায়াময়ী সীতাও তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার তমসা। সীতার সে অলৌকিক দেহজ্যোতিঃ মলিন হইয়াছে। দুঃখিনীর হৃদয়নিহিত দারুণ শোকানলে তাঁহার সে সুন্দর কপোলভিত্তি যেন দগ্ধ হইতে হইতে পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। সেই জলদকৃষ্ণ কেশকলাপ, সংস্কারের অভাবে,

রূক্ষ কণ্টকের আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, সে অম্লান মুখপঙ্কজ, সে নির্ম্মল শারদচন্দ্রমা যেন কাল রাহুর গ্রাসে বিড়ম্বিত হইতেছে! বুঝি মূর্ত্তিমতী করুণা বা শরীরিণী বিরহবেদনা আজ পঞ্চবটীবনে, নির্জ্জনে প্রাণ ভরিয়া কাঁন্দিবার জন্য উপস্থিত।[১] অন্যে সীতাকে দেখিতেছে না, কিন্তু তমসা দেখিতেছেন, এবং দেখিয়া দেখিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন।

সেই পঞ্চবটীর,—যেখানে জানকী-জীবনের কত সুখের স্বপ্ন, কত আনন্দের চিত্র এখনও বিদ্যমান; যেখানে সীতার জীবনের চরম পরিতৃপ্তি ঘটিয়াছিল, আবার যেখানে চরম সর্ব্বনাশেরও সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই পঞ্চবটীর;—আজ সীতার এই যে দুর্দ্দশা, এই যে নির্ব্বাসন, যে পঞ্চবটীতে ইহার বীজ বপন হইয়াছিল, স্বর্ণ মৃগের ছলনায় ভুলিয়া, সীতা যে পঞ্চবটী হইতে দুরন্ত রাক্ষসপতি কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিলেন, সেই পঞ্চবটীর;—যেখানে পর্ণকুটীরে, রামের সহিত বাস করিয়া, সীতা অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ বিস্মৃত হইয়াছিলেন, যেখানে রামের আদরে, রামের স্নেহে, সীতা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়াছিলেন, যেখানে বনদেবতা বাসন্তীর ভালবাসায়, সীতা জগতে নিঃস্বার্থ ভালবাসা শিখিয়া-

১—উত্তর-চরিত, ৩য় অঙ্ক :—

পরিপাণ্ডুদুর্ব্বলকপোলসুন্দরং
দধতী বিলোল-কবরীকমাননম্।
করুণস্য মূর্ত্তিরিব বা শরীরিণী—
বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী॥

ছিলেন, সেই পঞ্চবটীর ;—সংসারে বালিকাগণ, কত পুতুল লইয়া খেলা করে, পরিণত বয়সে যে বাস্তব খেলায় জীবনের কটি পরিমিত দিন কাটাইবে, সেই খেলা খেলে, কোন বালিকা পুত্ররূপী পুতুলের সঙ্গে, অন্যের দুহিতৃরূপী পুতুলের বিবাহ দেয়, বাসরসজ্জা করে, বরবধূকে বরণ করিয়া লয়, বালিকা জীবনের এ বড় মধুর খেলা, সংসারের এ বড় সম্মোহন চিত্র! সীতার ভাগ্যে সংসারে এ খেলা খেলিবার শুভ মুহূর্ত্ত আ'সে নাই; কিন্তু যে পঞ্চবটীতে সীতা বনফুলের সহিত নবকিসলয়ের বিবাহ দিয়া, বনকরিণীর নবজাত শিশুকে পুত্রের মত আদর করিয়া, শালের কচি কচি পল্লব তাহার অজাতদন্ত মুখে পূরিয়া দিয়া, কত প্রকারে খাওয়াইয়া, কোমল দূর্ব্বাগুচ্ছের দ্বারা গাত্রমার্জ্জনা করিয়া,—সেই সংসারের খেলার অধিক খেলা খেলিতেন,—হরিণবধূর গাত্র কণ্ডূয়ন করিয়া দিয়া, তাহার সহিত সখিত্ব স্থাপন করিতেন, সেই পঞ্চবটীর ;—যে পঞ্চবটীতে, মাতৃহীন ময়ূরশিশুকে সীতা বুকে করিয়া লালনপালন করিতেন, বৃক্ষচ্যুত পিকশাবককে নিয়ত কোলে কোলে রাখিয়া আদর করিতেন, গর্ভভরমন্থরা হরিণীর কুশসূচি-ক্ষত চরণে ইঙ্গুদীতৈলের প্রলেপ দিয়া তাহাকে সুস্থ করিতেন, তৃণকবল মুখে তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে খাওয়াইতেন, সেই পঞ্চবটীর ;—যে পঞ্চবটীতে স্বহস্তে বৃক্ষরোপণ করিয়া, প্রত্যহ, সীতা কলস কলস জল সেচনপূর্ব্বক, তাহাদিগের জীবন রক্ষা করিতেন, লতাবধূর সহিত স্বহস্ত-বর্দ্ধিত তরুপোতকের বিবাহ দিতেন, এবং তাহাদের কুসুমে মালা গাঁথিয়া, তাঁহার

কণ্ঠহারসদৃশ রামচন্দ্রের কণ্ঠে হাসিতে হাসিতে পরাইয়া দিতেন, রাম আবার তাহা তাঁহার সীতার গলায় দোলাইয়া করতালিকা সহকারে আনন্দ করিতেন, সেই পঞ্চবটীর প্রসূন স্বহস্তে চয়ন করিয়া পুত্রদ্বয়ের মঙ্গল-পূজা করিতে হইবে, ভাগীরথীর এই আদেশ,— সীতা সেইজন্য পঞ্চবটীতে উপস্থিত। বড় কঠিন সমস্যা! যখন সীতা রামের সহিত পঞ্চবটীতে ছিলেন, তখন ছিলেন তিনি অজাতপুত্রা, আর এখন তিনি পুত্রবতী। জীবনের সে এক দিন, আর এ এক দিন। উভয়ে অনেক প্রভেদ। স্নেহময়ী সীতার হৃদয়ে, বাল্যে সরস্বতীপ্রবাহের ন্যায়, যে অপত্য-স্নেহ লুক্কায়িত ছিল, এখন তাহা দামোদরের স্রোতের ন্যায় খর প্রবাহিত। পুত্রবতীর আজ যে দিন উপস্থিত, যদি রামের সহিত বিয়োগ না ঘটিত, তবে এ দিনের আর তুলনা থাকিত না। বক্ষের শোণিতদ্বারা যাহাদিগকে মানুষ করিতে হয়, তাহাদের মুখ-চন্দ্র যদি তাহাদের পিতা না দেখিলেন, যদি পিতার আদরে তাহারা বঞ্চিত রহিল, তবে নারীজন্মই বৃথা। রাজার নন্দিনী, রাজার কুলবধূ, রাজার মহিষী সীতার পুত্র জন্মিল, সংসারে যাঁহারা আপন, তাঁহাদের কেহই তাহা দেখিলেন না! যাহাদের জন্মে রাজ্যের সর্ব্বত্র আনন্দ-উৎসবের অবধি থাকিত না, দুর্গম বনজাত প্রসূনের ন্যায়, তাহারা লোকনয়নের অন্তরালেই রহিল! সকল দুঃখেরই একটা শেষ আছে, কিন্তু এ দুঃখের,—দুঃখিনী ললনার এ বেদনার শেষ নাই। সব থাকিতে সীতার কেহই নাই। তাই অন্তঃকরণের দুর্ব্বহ দুঃখভারে যেন

একান্ত নিষ্পীড়িত হইয়া, অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট দেহে, জানকী পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিলেন, এবং কোন দিকে না চাহিয়া, পূর্ব্ব পরিচিত তরুলতাকে পর্য্যন্ত আর মুখ দেখাইবেন না—ভাবিয়া, অবনত মস্তকে ও ত্বরিতকরে কুসুম চয়ন করিতে-লাগিলেন। ইচ্ছা, কোনমতে পূজার উপযোগী কুসুম সংগৃহীত হইলেই অন্তর্হিত হইবেন। অধিক সময় এস্থানে থাকিবেন না। আর থাকা যায়ও না।

পাঠক! একবার চিন্তা করুন,—সেই বাল্যে, যে বাল্যকালের স্মৃতিকে এই পরিণত বয়সেও প্রতিনিয়ত মনের মন্দিরে কত উপকরণে পূজা করেন, সেই বাল্যে, যেস্থানে সঙ্গিগণের সহিত কত নিরাবিল আমোদে কাল কাটাইয়াছেন, হিংসা দ্বেষ, উচ্চা-কাঙ্ক্ষা প্রভৃতি প্রবল মন্ত্রিগণের সহিত আলাপ না থাকায়, কত প্রীতির সহিত জীবনের সেই শুভমুহূর্ত্ত অতিবাহিত করিয়া-ছেন, আজ যে মুহূর্ত্তের স্মরণ মাত্রেই, আপনার নয়নে জলবিন্দু উদ্ভূত হয়, সেই বাল্যকালের সেই সকল স্থানের,—জীবনের সেই সকল অতীত স্বপ্নের সাক্ষিগণের পুনর্দর্শনে মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়া থাকে! তার পর যৌবনে, যে গৃহে, যে জনপদে, যে স্বর্গে আপনার জীবনের কত সুখের চিত্র অঙ্কিত আছে, আজ যে চিত্রাবলীর দিকে চাহিলে নয়নের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হয়, হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে, মস্তক ঢলিয়া পড়ে, আজ এই প্রৌঢ়ের নিঃসহায় হৃদয়ে, সেই গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক, আপনি কি অশ্রুবিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারেন?, যে তটিনীর কুলকুলগীতিকা

সেই যৌবনে, আপনার কর্ণে কি মধুর অমৃত ধারাই না বর্ষণ করিত, আজ সে তটিনীর সে কুলকুলধ্বনি শ্রবণে আপনার হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে কি অসহ্য বেদনাই না জন্মে! যখন প্রেমরূপ দিব্য অমৃতের মৃতসঞ্জীবন রসে বঞ্চিত থাকিয়াও, আমাদের ন্যায় নীরস পাষাণেরও এই অবস্থা ঘটে, তখন, সীতার মত প্রেমমাত্রময়ী রামময়জীবিতা দেবীর হৃদয়ের অবস্থা আজ পূর্ব্বানুভূত পঞ্চবটী বনে যে কিরূপ ভীষণতমা হইবার কথা, তাহা একবার চিন্তা করুন। তাই সীতা ত্বরিতকরে কুসুমচয়নে অভিনিবিষ্টা, সত্বর পঞ্চবটী পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্পা।

সীতা যখন কুসুমচয়নে অভিনিবিষ্টা, তখন, হঠাৎ দূরে, নিবিড় বনে 'সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশ'—বলিয়া কে যেন অতি করুণ-কণ্ঠে কান্দিয়া উঠিল। সামান্য ভূকম্পনেও যেমন জীর্ণ অট্টালিকার ভিত্তি আহত হয়, স্খলিত হয়, তদ্রূপ, বনমধ্যোত্থিত, প্রতিধ্বনিদীর্ঘ এই 'সর্ব্বনাশ' শব্দে, ভগ্নহৃদয়া, শোকাকুলপ্রাণা, নির্ব্বাসিতা সীতার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। 'সর্ব্বনাশ' সীতার চিরপরিচিত। সেই স্বয়ংবরের পর হইতে এ পর্য্যন্ত সীতার কত প্রকারে কত 'সর্ব্বনাশই' না ঘটিয়াছে! সীতার কোমল, পরিপূর্ণ হৃদয়খানি বল্মীকগর্ভগত মৃৎপঞ্জরের ন্যায়, 'সর্ব্বনাশে' শতচ্ছিদ্র হইয়া আছে,—'সর্ব্বনাশের' স্বরূপ, 'সর্ব্বনাশের' প্রভাব সীতা মর্ম্মে মর্ম্মে জ্ঞাত আছেন, তাই 'সর্ব্বনাশ'-শব্দে তাঁহার শীর্ণ দেহলতিকা কণ্টকিত হইল। মুগ্ধা জানকী কাণ পাতিয়া সেই শব্দ শুনিলেন। কাহার 'সর্ব্বনাশ'? কে 'সর্ব্বনাশ' করিল?—

সীতা ইহার কিছুই স্পষ্টতঃ ধারণা করিতে পারিলেন না, তবে এইটুকু বুঝিলেন যে, এ ধ্বনি যে করুণ কণ্ঠ হইতে বিনিঃসৃত, সে কণ্ঠ সীতার সম্পূর্ণ অপরিচিত নহে, বরং সুপরিচিত। পঞ্চবটী বনে, গুচ্ছ গুচ্ছ বনকুসুম আহরণ করিয়া, যে তাঁহাকে কত প্রকারে, কত মনোহর বেশে বিভূষিত করিত, নবকিসলয়ের অবতংস করিয়া কাণে পরাইয়া দিত, কুসুমরাশির মধ্যে বসাইয়া যে তাঁহাকে বনদেবী বলিয়া ডাকিত, সীতার সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধান ব্যতীত, যাহার প্রায় অন্য কার্য্য ছিল না, এ কণ্ঠ, সীতার সেই দ্বিতীয়উচ্ছ্বসিতকল্পা, প্রিয়সখী, বনদেবতা বাসন্তীর। সীতার শরীর শিহরিয়া উঠিল। দুঃখিনী ভূতাবিষ্টার ন্যায় আকর্ণবিস্ফারিতনেত্রে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে, দূরে আবার শব্দ হইল---'সর্ব্বনাশ' 'সর্ব্বনাশ'।—"সীতাদেবি স্বহস্তে কচি কচি পল্লব চয়ন করিয়া যে করি-শাবকের মুখে তুলিয়া ধরিতেন, মাতার ন্যায় যত্নে যাহাকে পালন করিতেন, আজ সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, সে তাহার প্রিয়তমার সহিত জলে খেলা করিতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর উদ্দাম মত্তহস্তী কোথা হইতে আসিয়া সীতার সেই পুত্রকল্প করী ও করিবধূকে আক্রমণ করিয়াছে! তাহাদের বুঝি প্রাণ যায়! সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!"[১]

১—উত্তরচরিত, ৩য় অঙ্ক—

নেপথ্যে—সীতাদেব্যাঃ স্বকরকলিতৈঃ শল্লকীপল্লবাগ্রৈ

রগ্রে লোলঃ করি-করভকো যঃ পুরা পোষিতোঽভূৎ।

অদূরে লতাচ্ছন্ন কুঞ্জের অন্তরাল হইতে এই শব্দ উত্থিত হইল। সীতা শুনিলেন। তাঁহার প্রাণ কান্দিল। চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। পুত্রবতী সীতা অপত্যস্নেহে যেন আত্ম-হারা হইয়া ভূত-ভবিষ্যদ্-বর্ত্তমান ভুলিয়া গেলেন। দ্রুতপদে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, 'আর্য্যপুত্র! আমার পুত্রকে রক্ষা করুন'—বলিয়া ভগ্নকণ্ঠে কান্দিয়া উঠিলেন। কিন্তু নিমেষমাত্র পরেই লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়া আসিল,—সীতা বুঝিলেন যে, কোথায় তাঁহার আর্য্যপুত্র, আর আজ তিনিই বা কোথায়! যখন রামের সহিত এই পঞ্চবটীতে বাস করিতেন, তখন সীতার কোন প্রিয় বন্য প্রাণীর কোনরূপ বিপদ ঘটিলে, তৎক্ষণাৎ রাম যাইয়া প্রতিবিধান করিতেন। কত অনাথা কামিনীরা নিশাচরগণ কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া সীতার শরণ লইত, আর সীতার অনুরোধ-মতে, সীতানাথ রাম ঐ কামিনীগণের বিপদ নিবারণ করিতেন। সে এক দিন ছিল! আজ কোথায় সে রাম, আর কোথায় এই সীতা! পঞ্চবটীবনের সেই চিরপরিচিত স্থানে সীতা আজ উপস্থিত, সম্মুখে ঐ বিপদ, তাই সেই চিরপরি-চিত 'আর্য্যপুত্র'-ধ্বনি তাঁহার ভগ্নকণ্ঠ হইতে নির্গত হইল! বিস্মৃতিময়ী জানকী যেন সেই অতীত সময়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন;—কিন্তু স্মৃতির পুনরুদয়মাত্রেই তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া

বধ্বা সার্দ্ধং পয়সি বিহরন্ সোঽয়মন্যেন দর্পাৎ
উদ্দামেন দ্বিরদ-পতিনা সন্নিপত্যাভিযুক্তঃ॥

পড়িল। 'হা আর্য্যপুত্র!'—বলিয়া দুঃখিনী মূর্চ্ছিত হইয়া, স্বর্গচ্যুতা দেবতার ন্যায়, প্রভঞ্জন-দলিতা লতিকার ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। অদূরবর্ত্তিনী তমসা ত্বরিতচরণে আসিয়া সেই ভূতল-লুণ্ঠিতা স্বর্ণপ্রতিমাকে ধরিয়া তুলিলেন, আশ্বস্ত করিলেন। আলুলায়িতকুন্তলা মলিন-কান্তি সীতা তমসার দেহ আশ্রয় করিয়া বাতেরিত কমলদলবৎ থর্ থর্ কাঁপিতে লাগিলেন। উভয়েই নীরব। এমন সময়ে নেপথ্যে আবার কে যেন কথা কহিলেন। সে কথা,—সে কণ্ঠস্বরও সীতার চিরপরিচিত। সেই নবজলসম্ভৃত জলদ-গর্জ্জনবৎ স্নিগ্ধ এবং গম্ভীর নির্ঘোষে সীতার কর্ণকুহর ভরিয়া গেল। বিষাদিনী উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে উঠিয়া বসিয়া, কাণ পাতিয়া রহিলেন। কেন সীতাকে ভাগীরথী আজ পঞ্চবটীতে পাঠাইয়াছেন,—সৌরকুলপাবনী ভাগীরথীর প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা দেবী তমসা বিশেষরূপে বিদিত ছিলেন,—ঐ অদূর-শ্রুত স্নিগ্ধ-গম্ভীর ধ্বনি যে কাহার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত, কে যে সে মহাপুরুষ, কেনই বা আজ তিনি এই পঞ্চবটীতে আগত, তমসা তাহাও জানিতেন, কিন্তু তিনি জানিয়াও না জানার ভান করিলেন। তবে ভগ্নহৃদয়া জানকীর ত্রাস-চঞ্চলা মুখচ্ছবি দেখিয়া তাঁহার চক্ষে জল আসিল, তিনি স্নেহসিক্ত কণ্ঠে কহিলেন, "মা জানকি! দূরাগত নবজলদ-গর্জ্জনে ময়ূরীর ন্যায়, এই অব্যক্ত ও অপরিচিত স্বরে কেন তুমি চমকিয়া উঠিলে? কেন এত উৎকণ্ঠিত হইলে? কারণ কি?"—তমসার 'অব্যক্ত'—এই কথায় সীতা বিস্মিত হৃদয়ে কহিলেন "ভগবতি! এই কি অব্যক্ত

স্বর! আমার মনে লইতেছে, ইহা নিশ্চয় আমার আর্য্যপুত্রের কথা।" তমসা বলিলেন, "শুনিয়াছি, শূদ্রতপস্বীর দণ্ডবিধানের নিমিত্ত, ইক্ষ্বাকুকুলের সেই রাজা জনস্থানে আসিয়াছেন।"—তমসা রামের নামটি পর্য্যন্ত করিলেন না, যেন চিনেনই না! তমসার কথা-শ্রবণে সীতাও নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন—"আহা, সে রাজা সত্যই 'অপরিহীন-রাজধর্ম্ম,' অর্থাৎ রাজধর্ম্মের মর্য্যাদা সেই রাজা কখনও লঙ্ঘন করেন না। একথা সীতার মুখের নহে, প্রাণের কথা। একবার রাজধর্ম্মের পালন করিতে যাইয়া, যে রাজা তাঁহার চিরসঙ্গিনী, শুদ্ধশীলা, নিরপরাধা বনিতাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, আজ আবার, রাজধর্ম্ম-পালনের জন্যই, নিরপরাধ শূদ্রতপস্বীর দণ্ডবিধান করিতে সেই রাজা পঞ্চবটীতে আগত, ধন্য রাজধর্ম্ম! ততোধিক ধন্য তাহার এতাদৃশ প্রতিপালক! এমন সময়ে নেপথ্যে আবার শব্দ হইল, সীতা চকিত-নয়নে সেই দিকে চাহিয়া শুনিলেন,—"যে স্থানের কত তরুলতা, কত মৃগ, এক সময়ে আমার পরম বন্ধু ছিল, আমার সেই প্রিয়তমার সহিত, যেস্থানে কতদিন বাস করিয়াছি, কত নির্ঝরে নির্ঝরে, কন্দরে কন্দরে, উভয়ে বেড়াইয়াছি, এই কি সেই স্থান? এই কি গোদাবরীর তটবর্ত্তী সেই পর্ব্বত? হা অদৃষ্ট!"—সীতা দেখিলেন,—দেখিলেন, প্রভাতের চন্দ্রমণ্ডলবৎ পাণ্ডুবর্ণ, ক্ষীণ, দুর্ব্বল এবং পতনোন্মুখ দেহের ভরে যেন একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া মন্দ মন্দ পদসঞ্চারে রামচন্দ্র আসিতেছেন, রামের তাদৃশী শোচনীয় দশার দর্শনে সীতা এক-

প্রকার জ্ঞানশূন্য হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তমসার দেহ আশ্রয় করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। তমসার পরিচর্য্যায় ছায়াময়ী সীতার সংজ্ঞা লাভ ঘটিল বটে, কিন্তু তিনি অপ্রবুদ্ধভাবে সেই অস্ত-গমনোন্মুখ সৌরকুলচন্দ্রমার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। একি জাগরণ না স্বপন, বাস্তব না মোহ, সীতা প্রকৃতরূপে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

রাম আজ একাকী নির্জন বনে উপস্থিত, রামের পক্ষে আজ বড় সুদিন, শুভক্ষণ। জনাকীর্ণ রাজপ্রাসাদে, লোক-লজ্জা-ভয়ে, নরনাথ মনের যে প্রবল অনল মনোমধ্যেই চাপিয়া রাখেন, আপন বুকের আগুনে আপনিই দগ্ধীভূত হয়েন, আজ সেই আগুনের শিখায় এই গহন বনের অচেতন তরুতলার প্রাণ পর্য্যন্ত পুড়িবে। রাম আজ প্রাণ ভরিয়া দুটো কথা বলিতে পাইবেন, মনের ক্ষোভ মিটাইয়া 'সীতা সীতা' বলিয়া কান্দিতে পারিবেন, যাহাদের গঞ্জনায় রাম, অযোধ্যার অদৃষ্টদেবতা-রূপিণী কলঙ্কলেশশূন্যা সীতার বর্জ্জন করিয়াছেন, এখানে তাহারা নাই, যে রাজ্যে সীতার ন্যায় দেবতার ঐরূপ অদ্ভুত অর্চ্চনা, এ স্থান সেই রাজ্যের অন্তর্ভূত নহে, এস্থানে রাম, মনের সাধ মিটাইয়া আজ কান্দিতে ও বিলাপ করিতে পাইবেন, শোকাকুল রামের পক্ষে এ বড় কম সুখের কথা নহে। সীতা ত এজন্মের মত বিলুপ্ত, তাঁহাকে পুনরায় পাইবার দুরাশা রামের নাই, এখন যে কয় দিন এই বিড়ম্বিত জীবনের অবসান না হয়, সেই কয় দিন, যদি এইরূপে প্রাণ ভরিয়া কান্দিবার অবসরও মধ্যে মধ্যে

ঘটে, তবে তাহাই রামের পক্ষে পরম লাভ। তাই রাম আজ, এতদিন যাহা পারেন নাই, তাহা করিতেছেন, প্রাণ ভরিয়া, হা সীতে! হা জানকি! হা দণ্ডকারণ্যবাস-প্রিয়সখি! হা বিদেহ-রাজ-পুত্রি!—বলিয়া তারস্বরে রোদন করিতেছেন। সেই নিস্তব্ধ বনভূমিতে শোকোন্মত্ত রামচন্দ্রের বিলাপ প্রতিধ্বনিত হইয়া, সেই শোকগাথার অসহনীয়তা যেন শতগুণ বাড়াইয়া তুলিতেছে। রামের শোকে, বুঝি বায়ু পর্য্যন্ত বিমূঢ়, তাই বনের একটি পল্লবও কাঁপিতেছে না, একটী জীর্ণ পত্রও বৃন্তচ্যুত হইতেছে না। সমগ্র বনস্থলী নীরব, নিস্পন্দ। শ্যামায়মানা বনকান্তি, শোকের কালিমায় যেন আরও কৃষ্ণতরা বলিয়া প্রতীত হইতেছে। রামের আর্ত্তনাদে, পুনঃপুনঃ সীতা নামের উচ্চারণে, সীতার চিরপরিচিত সেই শুক, শারিকা, পিক, হংস, ময়ূর, হরিণী, করি-করিণী—সব কাণ উচু করিয়া, বিলপমান, ধূসর-শ্রী, সজলনয়ন, রুক্ষকেশ রামের দিকে চাহিয়া আছে, মুখের তৃণ কবল ফেলিয়া দিয়া চিত্র লিখিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। আর তাহাদের মধ্যে, রামচন্দ্র, অগ্ন্যুদ্গারী আগ্নেয়-গিরির ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া, দুঃসহ বিলাপানল বর্ষণপূর্ব্বক, ঐ বন্য প্রাণিগণের প্রাণের সহিত কাননস্থলী পর্য্যন্ত প্রকম্পিত করিতেছেন। আর ঐ দিকে, ঐ অদূরে চিরধ্যেয় হৃদয়েশ্বরের তাদৃশ শোচনীয় পরিণাম দর্শনে, পতিপ্রাণা ছায়াময়ী সীতা মূর্চ্ছিতা, ভগবতী তমসা সেই লুপ্তসংজ্ঞা রঘুকুলবধূকে কোলের উপর রাখিয়া, তাঁহার মূর্চ্ছাম্লান মুখচ্ছবির দিকে স্থির-নয়নে চাহিয়া আছেন,

তাঁহার কপোলবাহিনী অশ্রুধারায়, তদীয় অঞ্চল-শায়িতা সীতার মুখপঙ্কজ নিরন্তর অভিষিক্ত হইতেছে! কি মর্ম্মবিদারী চিত্র! পাঠক! ভাষায় এ চিত্রের ভাবস্ফুরণ করিতে সে সামর্থ্যের প্রয়োজন, এ অকিঞ্চনের তাহা নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে, ঐ যে 'জানকি! জানকি!' বলিয়া, পর্ব্বতপাদে ছিন্নতরুর ন্যায়, রামচন্দ্র বার বার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, আর রামের সেই অবস্থার দর্শনে, সীতা উন্মাদিনী হইয়া, তমসার চরণে ধরিয়া, রামকে পুনরুজ্জীবিত করিতে অনুরোধ করিতেছেন,—ঐ যে, তমসার আদেশে, সীতা নিজেই তাঁহার ছায়াময় করপঙ্কজ প্রসারণপূর্ব্বক, ভূতলশায়ী রঘুকুলচন্দ্রমা রামের ললাট স্পর্শ করিতেছেন, আর সেই চিরবিদিত, চিরকাঙ্ক্ষিত করস্পর্শে মূর্চ্ছিত রামের শরীর কণ্টকিত হইতেছে, রাম চমকিয়া উঠিতেছেন,—ঐ যে সীতার করস্পর্শে রামের মূর্চ্ছার অপনোদন হইলেও, আনন্দময়ীর ঐ চিরানন্দময় স্পর্শে রামের আর এক প্রকার নূতন মূর্চ্ছার, নূতন জড়তার আবির্ভাব হইতেছে,—ঐ যে 'সীতা সীতা' বলিয়া রাম তাঁহার মানসী প্রতিমাকে ধরিবার জন্য করপ্রসারণ করিতেছেন, আর নির্দ্দোষ-নির্ব্বাসিতা ছায়াময়ী আবার অভিমানভরে ঈষৎ সরিয়া যাইতেছেন,—তাহা আপনাদিগকে আঁকিয়া দেখাইতে পারিতাম। পাঠক! যে পাথেয় সম্বল করিয়া কত মহাজন অমরতার রাজ্যে প্রস্থান করিয়াছেন, যদি সেই পাথেয়ের কণিকামাত্রও আমার থাকিত, তাহা হইলে, ঐ যে অকারণ পরিত্যাগী রামের মুখে,

"প্রসাদ ইব মূর্ত্তস্তে স্পর্শঃ স্নেহার্দ্রশীতলঃ।
অদ্যাপ্যেবার্দ্রয়তি মাং ত্বং পুনঃ ক্বাসি নন্দিনি!

উক্তি শুনিয়া, নির্ব্বাসিতা জানকী, একসময়ে তাদৃশ পতির দাসীত্ব করিতে পারিয়াছেন,—ভাবিয়াও, আপনাকে ধন্য ভাবিতেছেন, নারীজন্মধারণ সার্থক মনে করিতেছেন,—ঐ যে ছায়াময়ী জানকী অন্ততঃ একবারের জন্যও তাহার হৃদয়সর্ব্বস্বের পুনর্দর্শন পাইল, অভাগিনী জনকদুহিতার অকারণ পরিত্যাগরূপ দারুণ শেলবিদ্ধ হৃদয়ে ক্ষণেকের জন্যও তৃপ্তি জন্মিল,—ভাবিয়া, বৎসলা তমসাদেবী অদূরে দাঁড়াইয়া স্নেহাশ্রুবর্ষণ করিতেছেন,—তাঁহার প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়া আপনাদিগকে দেখাইতে পারিতাম। কিন্তু আমি সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত। আমার পক্ষে সে আশা দুরাশা মাত্র। পাঠক! করুণাময়ী বীণাপাণির প্রসাদ-নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণপূর্ব্বক, মহাকবি ভবভূতি স্বকীয় বীণায় যে ঝঙ্কার করিয়াছেন, ভাষান্তরে তাহার পূর্ণ প্রকাশ মাদৃশ নিষ্কিঞ্চনের সাধ্যাতীত। যদি শোকের প্রকৃত চিত্র দেখিতে চান, যদি দিব্য প্রণয়ের অবিকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চান, যদি সংস্কৃত ভাষার মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অভিলাষী হয়েন, আর সেই সঙ্গে, যদি প্রেম, দয়া, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদের অনাবিল উৎস দর্শনপূর্ব্বক কৃতার্থ হইতে চান, তবে, এ দীনের অনুরোধ, একবার সংস্কৃত সাহিত্যের কোহিনুর উত্তরচরিতের ছায়া পরিচ্ছেদ পাঠ করুন। মহাকবি ভবভূতির

"কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী'—এই সবেদন উক্তির প্রতি কর্ণপাত করুন।

রামের মূর্চ্ছাপগমের পর, ছায়াময়ী সীতা ঈষৎ দূরে সরিয়া গিয়াছেন। যাঁহার করস্পর্শে, যে চিরপরিচিত, চিরকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির স্পর্শে শোকবিমূঢ় রামচন্দ্রের চৈতন্যপ্রাপ্তি ঘটিল, রাম তাঁহাকে চারিদিকে, বিকারগ্রস্তের ন্যায় আকর্ণবিস্ফারিত-নেত্রে ও আকুল-প্রাণে অনুসন্ধান করিতেছেন, একাকী কত-কি-ই-না প্রলাপ করিতেছেন। রামের সে অবস্থা,—তদানীন্তন ভয়াবহ মুখ-চ্ছবি দর্শন করিয়া, অদৃশ্যা জানকী বাণ-বিদ্ধা কুররীর ন্যায়, শেল-বিদ্ধা হরিণীর ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন, ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিতা হইতেছেন, আর জননীরূপিণী তমসা প্রেমার্দ্রকরে তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন করিতেছেন। সীতার অবস্থা রাম কিছুই দেখিতে-ছেন না, দেখিলে বুঝি, রামের দশা আরও শোচনীয়তর হইত, রামেব হয়ত প্রাণাত্যয় ঘটিত, তাই কবি দর্শকদিগকে সে চরম দুঃখের ছবি দেখাইলেন না।

সঙ্কল্পিত সীতার অন্বেষণে রাম যখন এইরূপে উন্মত্তপ্রায়, তখন অকস্মাৎ তথায় বনদেবতা বাসন্তী ত্বরিতচরণে উপস্থিত হইলেন। বাসন্তীর ত্রাসাকুল নয়ন ও সম্ভ্রান্ত মুখচ্ছবি দর্শনে রাম সত্যই যেন জড়ীকৃত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। সেই পূর্ব্বের তত পরিচয় সত্ত্বেও, রাম সহসা বাসন্তীকে 'বাসন্তী' বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। বাসন্তী উপনীত হইয়াই, 'এ কি ? রঘুনাথ ? জয় হউক,' বলিয়া অযোধ্যার প্রজা-রঞ্জন

নূতন রাজার রাজোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। পূর্ব্বে যখন রাম সীতার সহিত এই দণ্ডকারণ্যে বাস করিতেন, তখন, সীতার প্রাণ-সমা সখী বনদেবতা বাসন্তী রামকে সখার ন্যায় দেখিতেন। আত্রেয়ীর মুখে, রামকর্ত্তৃক সীতানির্ব্বাসনের ব্যাপার আদ্যন্ত শ্রবণ করার পর হইতে, বাসন্তীর চিত্তে বিষম আঘাত লাগিয়াছে। বাসন্তী যদি দেবী না হইয়া মানবী হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহার সমধর্ম্মা নারীর প্রতি রাম যে রাজনীতি-সঙ্গত ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে, হয়ত রামের সহিত আর কথাটিও কহিতেন না। কিন্তু তিনি দেবী, রামের হৃদয় তিনি জানেন, সীতার হৃদয় তিনি জানেন, রামসীতার প্রতি তাঁহার নিজের হৃদয়েরও যে কি ভাব, তাহাও তিনি বুঝেন, সীতা বাসন্তীর সর্ব্বতোভাবে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা হইলেও, সীতা যে রামের সর্ব্বাংশে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা, ইহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না, তাই বনদেবী, দেবীর ন্যায়, স্নেহ-বশে রামের সম্মুখীন হইয়া প্রথমেই আলাপ করিলেন। তবে, তিনি যে, ঐ রাজার রাজ্যপালনী নীতির সমস্ত কথাই শুনিয়াছেন, ইহা সহসা প্রকাশ করিলেন না বটে, কিন্তু সখীর ন্যায় সম্বোধন না করিয়া, তটস্থার ন্যায়, রাজাকে রাজার প্রাপ্য সম্মান ও অভ্যর্থনা প্রদান করিলেন। অদূরে ছায়াময়ী সীতা স্থিরনেত্রে সমস্ত দেখিতেছেন, বাসন্তীকে দেখিয়া, তিনি তমসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভগবতি! সত্যই কি বনদেবতারাও আমাকে দেখিতে পাইবেন না? তমসা বলিলেন, "বাছা! মন্দাকিনী দেবীর ক্ষমতার তুলনা নাই,

তাঁহার কথায় অবিশ্বাস কেন? তোমাকে বনদেবতারাও দেখিতে পাইবেন না।” তখন অশরীরা সীতা ধীরে বাসন্তী ও রামের আরও একটু নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন।

বাসন্তীর মুখে ‘জয় হউক’ কথা শুনিয়া, সজ্ঞান-মূর্চ্ছিত রামের সংজ্ঞা-লাভ হইল। তিনি তখন, স্থির-লোচনে সেই অভ্যাগতার শিশিরমথিত পদ্মবৎ পরিম্লান মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কহিলেন—‘তাইত, আমার দেবীর প্রিয়-সখী বাসন্তী না?’ অমনি বাসন্তীও বলিলেন, ‘দেব! আর সময় নাই, ত্বরায় চলুন, ঐ যে জটায়ু-শিখরি নামক পর্ব্বত দেখিতেছেন, ঐ পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে সীতাতীর্থ নামে যে সোপানবদ্ধ ঘাট আছে, যে ঘাটে সীতাদেবী প্রত্যহ স্নান করিতেন, সেই ঘাট দিয়া গোদাবরীতে অবতীর্ণ হইয়া সীতার পুত্রকে রক্ষা করুন, বিলম্ব করিবেন না।’

বাসন্তীর এই কথাগুলিতে, রামের মর্ম্মস্থলে, যেন যুগপৎ শতবৃশ্চিক দংশন করিল।—এতক্ষণ রাম, এ যে কোন্ স্থান, তাহা ঠিক চিনিতে পারেন নাই, মাত্র দণ্ডকারণ্য এইটুকু বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু এতক্ষণে চিনিলেন যে,—ঐ সেই জটায়ুশিখরী পর্ব্বত, মহাত্মা জটায়ু যে পর্ব্বতের উপরে, সীতাপহারী রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সীতার রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন,— ঐ সেই পর্ব্বত। ঐ সেই সীতাতীর্থ,—দেবী জানকী প্রতিদিন যে ঘাটে স্নান করিতেন, যে ঘাটে গোদাবরী-বিহারিণী মরালশ্রেণীর সহিত কত-ই-না কৌতুকক্রীড়া করিতেন,

সীতা স্নান করিতেন বলিয়া, যাহার নাম সীতাতীর্থ হইয়াছে, কত শতসহস্র যাত্রী যে তীর্থে এখনও অবগাহন করিয়া ধন্য ও পূতম্মন্য হয়, ঐ সেই সীতাতীর্থ,—আর অদূরে ঐ সেই গোদাবরী, যে গোদাবরীর কথা রামের চিরদিন মনে থাকিবে, যে গোদাবরীকে রাম মনের মধ্যে যে মন, তাহাতে অঙ্কন করিয়া রাখিয়াছেন, যে গোদাবরীর তীরে, রাম "কত মধুযামিনী" নিমিষের মত কাটাইয়াছেন,—

অত্রানুগোদং মৃগয়ানিবৃত্ত
স্তরঙ্গবাতেন বিনীত-খেদঃ।
রহস্তদুৎসঙ্গ-নিষণ্ণমূৰ্দ্ধা
স্মরামি বানীরগৃহেষু সুপ্তঃ।—

বলিয়া,—রাম, যে গোদাবরী তাঁহার শুভ্রকান্তি সীতাকে আকাশপৃষ্ঠচারী বিমান হইতে দেখাইয়াছিলেন, জীবনের সেই প্রধান স্মরণীয় গোদাবরী ঐ অদূরে বিদ্যমান, আর ঐ সেই গোদাবরীর জলে, সীতার স্বহস্ত-চয়িত শল্যকীপল্লবে সংবৰ্দ্ধিত, পালিত পুত্র করিপোতক; হায়, তখন,—সেই মিলনের দিনে, যাহা যাহা ছিল, সীতার বড় ভালবাসার যে যে দ্রব্য ছিল, সে সব ঠিক প্রায় তেমনই আছে, নাই কেবল সীতা! এক সীতার অভাবে, আজ এ সমস্তই রামের চক্ষে প্রতিমাশূন্য পঞ্জরের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে! রাম সাগর বন্ধন করিয়া, বৈরি-কঙ্কালে কত খাত পূর্ণ করিয়া, যে অনর্ঘ রত্নলাভ করিয়াছিলেন, অদৃষ্টক্রমে, সে বন্ধন শিথিল ও সে রত্ন কোথায় বিসর্জ্জিত হইয়াছে!

বনবাসে, সীতার বিরহে বড় কাতর হইয়াই রাম, রাবণাদির নিধন-পূর্ব্বক, সীতার সহিত পুনর্মিলিত হইয়াছিলেন, পিপাসিত প্রাণে জলদের আশ্রয় লইয়াছিলেন, হায়, কর্ম্মদোষে, তাঁহার শিরে বজ্রাঘাত হইল! তিনি অঙ্কগতা লক্ষ্মীকে স্বহস্তে বিদায় দিয়া, আজ পথের ভিখারী হইয়াছেন! সংসারে তাঁহার বেদনার তুলনা নাই। তাঁহার এখন,—

'আপন শূল হাম আপনি চাঁচমু
দোখ দেয়ব অব কাঁহি।'

চিন্তা-ভর-পীড়িত রাম, বনদেবতার সঙ্কেতে, ভূতাবিষ্টের ন্যায় অপ্রবুদ্ধভাবে, সীতার সেই পালিত পুত্রক, যৌবন-শ্রী-সমুজ্জ্বল, কান্তা-সখ করীর নিকটে ঝটিতি উপস্থিত হইলেন। ছায়াময়ী সীতাও অদৃষ্টদেবতার মত, পরোক্ষে রামের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। সেই করি-যুবককে দেখিয়া রামের একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল,—তিনি অর্দ্ধ-রুদ্ধ-কণ্ঠে ও সজল-নয়নে বলিলেন—'দীর্ঘজীবী হও'। সীতার পালিত-পুত্রদর্শনে, রামের মনের তদানীন্তন অবস্থা যে কীদৃশী হইয়াছিল, তাহা রামের মুখচ্ছবি ও কণ্ঠস্বর শুনিয়া, পতি-প্রাণা জানকী সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছিলেন। তাই রামের চক্ষে জল দেখিয়া, অজ্ঞাতসারে তিনিও সজলনয়না হইয়াছিলেন। সেই কৈশোরের ক্রীড়া-পুত্রকের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সীতা কহিতে লাগিলেন—'আহা, সেই ততটুকু শিশু এখন এত বড় হইয়াছে!' —এই কথা যখন সীতা মুখে বলিতেছিলেন, তখন, তাঁহার মনের মধ্যে, বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায়, মিলনকালের সেই স্মৃতি,

নিমিষের মধ্যে একবার তখন হইতে এইক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাবলী দেখাইয়া দিল। সীতা বেদনার গুরুভারে একান্ত কাতরা ও শিথিলকায়া হইয়া পড়িলেন। এমনই সময়ে, দুঃখিনী সীতার মনঃক্লেশের এইরূপ চরম মুহূর্ত্তে, রাম ঐ পালিত-তনয়ের দিকে চাহিয়া সীতাকে উদ্দেশ করিয়া বাষ্প-গদগদকণ্ঠে কহিলেন,—"দেবি। কোমল লবলীলতিকার নবীন কিসলয়ে তুমি কর্ণে যে অবতংস পরিতে, তোমার সেই অবতংস, যে শিশু, তাহার অচিরোদ্গত মৃণালপল্লবের ন্যায় স্নিগ্ধ এবং সুন্দর কচি কচি দন্তের দ্বারা টানিয়া লইত, তোমাকে কত প্রকারে ভাল-বাসা জানাইত, একবার আসিয়া দেখ, তোমার সেই পালিত-তনয় করিশিশু আজ মদবর্ষী বারণদিগকেও জয় করিতে পারে, তরুণ বয়সে যে যে সম্পদ একান্ত অভিপ্রেত, সীতে! তোমার এই পুত্রের সে সমস্তই হইয়াছে!"

সীতাময়-প্রাণ রাম জানেন না যে, যাঁহাকে দেখাইবার জন্য তাঁহার এত উৎকণ্ঠা, তিনি তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী। রামের কথায় সীতার চিত্ত আরও আকৃষ্ট হইল, তিনি চিত্রপুত্তলিকাবৎ নিমেষ-বিধুর-নয়নে সেই কৃত্রিম পুত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়খানি, কতপ্রকার চিন্তায়, কতপ্রকার ঘটনার স্মরণে, কত রকমে, কত-কি-ভাবে বিভোর হইতে লাগিল। পালিত-পুত্রের দিকে চাহিতে চাহিতে, দুঃখিনীর আপন পুত্রের কথা মনে পড়িল। তখন অশ্রুসিক্তমুখী জানকী তমসাকে কহিলেন, "ভগবতি! এই শিশু এত বড় হইয়াছে, না জানি আমার

কুশলব এতদিনে কত বড় হইল! হায়, আমি এমনই হত-ভাগিনী যে, আমার কপালে বিধাতা কেবল আর্য্যপুত্রবিরহ লিখেন নাই, পুত্রবিরহও লিখিয়াছেন! ভগবতি! আমার ন্যায় মন্দভাগিনী রমণীর জীবনে ধিক্, আমার পুত্রদ্বয়ের সেই অমল-কোমল মুখপদ্মযুগল আর্য্যপুত্র দেখিলেন না, সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তাসন্নিভ দশন-পংক্তি, সেই অবাক্ত মধুর কাকলী, সেই নিয়ত সস্মিত বদন, সেই গদ-গদ ভাষ,—কিছুই আমার আর্য্যপুত্রের গোচর হইল না! দেবি, আমার এ প্রসবে লাভ কি?”—বলিতে বলিতে সীতার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, ক্ষীণ দেহলতিকা থর্ থর্ কাঁপিতে লাগিল।—তখন অবশ-হৃদয়া, আজন্মদুঃখিনী রাজকুমারী দরদরিত ধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দয়াময়ী তমসা তখন স্নেহপূর্ণকণ্ঠে কহিলেন,—“জানকি! দেবতার প্রসাদে সব হইবে, তুমি স্থির হও। বাষ্পা-কুললোচনা, রূক্ষকুন্তলা সীতা অতিকষ্টে হৃদয়ের আবেগ কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া, তমসার মুখের দিকে চাহিয়া আবার কহিলেন,“ভগবতি! হতভাগিনী আমি এই, আর ঐ আমার আর্য্যপুত্র, যদি এই সময়ে, আমার লবকুশ এখানে থাকিত, তাহা হইলে, জীবনে ক্ষণকালের জন্যও একবার সংসারিণী কামি-নীর ন্যায় হইতে পারিতাম!—হায়, আমি এমন কপাল লইয়াই ভূতলে আসিয়াছিলাম যে, আমার সব থাকিতেও বস্তুতঃ কিছুই নাই! দেবি, বল দেখি, আমার ন্যায় দুর্ভাগ্যবতী রমণী জগতে আর কে আছে? যদি মুহূর্ত্তের নিমিত্তও, আমার পুত্রদ্বয়ের

মুখকমল একবার আর্য্যপুত্র দেখিতে পাইতেন, এ জীবন সার্থক হইত!" সীতা এবং তমসার এইরূপ নানাপ্রকার কথোপকথন হইতেছে,—দুঃখময় জীবনের কথার শেষ নাই, তাই আবেগ-ভরে, জানকী কথার উপর কথা, তাহার উপর কথা, তাহার উপর কথা বলিতেছেন ও কত কান্দিতেছেন। আর অদূরে তাঁহার চিরপ্রার্থিত হৃদয়েশ্বর, ঐ তাঁহারই চিন্তায় আকুল হইয়া, কখন বাসন্তীর কথা শুনিতেছেন, কখন আবার অন্যমনস্কভাবে, অন্যদিকে চাহিতেছেন, কখন বা অম্বুত্তরঙ্গ জলনিধির ন্যায়, অন্তঃস্তম্ভিতবৃষ্টি অম্বুবাহের ন্যায়, নিবাতনিষ্কম্পা প্রদীপের ন্যায় স্থির ও গম্ভীর হইয়া কি যেন ভাবিতেছেন। এখন রামের সেই লক্ষ্যহীন নয়ন ও বেদনা-বিবর্ণ বদনের দিকে ছায়াময়ী সীতা এক একবার চাহিতেছেন, আর অমনি শিহরিয়া উঠিতেছেন, আশঙ্কায় নয়ন মুদ্রিত করিয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে মুখ ফিরাইতেছেন। কি অনুপম চিত্র! কখন বনদেবতা রামচন্দ্রকে সীতার স্বহস্তসংবর্দ্ধিত সেই কদম্বতরু দেখাইতেছেন, রাম অনিমেষনেত্রে, পূর্ব্বপরিচিত, মিলনের সাক্ষী সেই কদম্বর্বৃক্ষের প্রতি চাহিয়া আছেন। রামের সে নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতে, সেই বন-বাসকাল হইতে, সীতানির্ব্বাসন পর্য্যন্ত সময়ের সমগ্র ঘটনাবলী যেন প্রতিবিম্বিত হইতেছে। পাণ্ডুরকপোলা জনকদুহিতা, প্রস্তর-প্রতিমাবৎ সেই প্রতিবিম্বন দেখিতেছেন, আর তমসা, স্পন্দনরহিতা সীতার সংজ্ঞালোপ ঘটিল কি না, তাহা জানিবার জন্য, কদাচিৎ দুই একটি কথা বলিতেছেন। বিষাদের এমন

চিত্র, বৈচিত্র্যের এমন সম্মিলন, ভাবের এমন পরিস্ফুরণ, সংস্কৃত সাহিত্যে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বিষণ্ণ রামচন্দ্র এইভাবে লক্ষ্যহীন নয়নে, যখন সীতার সেই কদম্বতরুর দিকে চাহিয়া আছেন, তখন বনদেবতা কহিলেন,—"দেব, দেখুন, দেখুন, অতিশয়িত হর্ষভরে নৃত্য করিতে করিতে, যেন ঈষৎ ক্লান্ত হইয়াছে, সীতার সেই পালিত পুত্র শিখণ্ডী তাহার প্রিয়তমার সহিত ঐ কদম্বতরুশাখায় বসিয়া কেকা রবে কানন মুখরিত করিতেছে, তাহার নবীন মনোহর কলাপ-নিচয় কেমন থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিতেছে, আহা, কি সুন্দর! মনে হইতেছে যেন, প্রকৃতিদেবী মনোমোহন মণিময় মুকুট পরিয়াছেন,—একবার এইদিকে দৃষ্টিপাত করুন।" রাম দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অবধানের সহিত তাহা দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার অনেক কথা মনে পড়িল :—সেই যে বনবাস সময়ে, সায়ংকালে, কুটীরের সম্মুখে বাসযষ্টির উপরে এই ময়ূরশিশু আসিয়া প্রত্যহ বসিত, অস্ফুট কেকারবে জানকীর কর্ণে মধুবর্ষণ করিত, আর মুগ্ধা জানকী করতালি দিয়া দিয়া, তাহাকে নাচাইতেন,—সেই যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচাইবার সময়ে, ঊর্দ্ধমুখী জানকীর ভ্রমর-কৃষ্ণ নয়নতারকাযুগল কি সুন্দর নৃত্য করিত, স্থূল স্নিগ্ধ ভ্রূলতার আকুঞ্চন-প্রসারণে তদীয় বদন-পঙ্কজের কি অনির্ব্বচনীয় শোভা জন্মিত,—রাম কুটীরদ্বারে বসিয়া, উদ্ভ্রান্ত-হৃদয়ে ও বিস্মিতনয়নে, তাহা দেখিতেন,—আজ সেই সব একে একে রামের মনে জাগিতে লাগিল।

তাঁহার শোকানলতপ্ত হৃদয়ের শোণিত-প্রবাহবৎ অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল। এমন সময়ে বাসন্তী আবার কহিলেন, "দেব, এই খানেই বসুন, এই সেই কদলী-কুঞ্জ, এই কুঞ্জের মধ্যে যে শিলাতলে সখী জানকীর সহিত আপনি বিশ্রাম করিতেন, ঐ দেখুন, ঐ সেই শীতল শিলাফলক। এই স্থানে থাকিয়া, সীতা হরিণরাজিকে স্বহস্তে কত তৃণকবল প্রদান করিতেন, তাই অদ্যাপিও হরিণগণ এ স্থানে সতত যাতায়াত করে, ঘিরিয়া বসিয়া থাকে, একবার এই দিকে নিরীক্ষণ করুন।"—বাসন্তীর নির্দ্দেশমতে রাম চাহিলেন, কিন্তু চাহিয়াই, 'না, আর পারি না' বলিয়া মুখ ফিরাইয়া, কান্দিতে কান্দিতে অন্যদিকে উপবেশন করিলেন।

অদূর-বর্ত্তিনী ছায়াময়ী জানকীর আর সহ্য হইল না, তিনিও সজলনয়নে কহিলেন,—"সখি বাসন্তি, শোকাকুল আর্য্যপুত্রকে এই সকল দেখাইয়া, কেন আর অধিকতর দুঃখভাগী করিতেছ? হা ধিক, হা ধিক, সেই আর্য্যপুত্র, সেই পঞ্চবটীবন, সেই প্রিয়-সখী বাসন্তী, সেই অতীত মিলনের সাক্ষিরূপী গোদাবরী-তটবর্ত্তী কানন-শ্রেণি, সেই পুত্রকল্প মৃগ, পক্ষী এবং পাদপ-রাজি,—সব দেখিতেছি, কিন্তু সে সকলেই আমি এখন বঞ্চিত, হায়, জীবলোকের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!"—বলিতে বলিতে, দুঃসহ দুঃখের গুরুভারে, আজন্মদুঃখিনী জানকীর স্কন্ধমূল, সর্পদষ্ট ব্যক্তির ন্যায়, সহসা ঢলিয়া পড়িল। তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিলেন। ছায়াময়ী সীতা যে সমীপে উপস্থিত,

বনদেবতা ত তাহা বিদিত নহেন, তাই তিনি, শোকক্ষীণ রামচন্দ্রের শোচনীয় দশার দর্শনে একান্ত ব্যথিত হইয়া, সীতার উদ্দেশে কহিলেন—"সখি সীতে! কোথায় তুমি, একবার আসিয়া তোমার রামের অবস্থা দেখ। যাহাকে দিবারজনি, অনিমেষনয়নে দেখিয়াও তোমার তৃপ্তি হইত না, যাহার নীলোৎপলসদৃশ স্নিগ্ধ কলেবর সতত দর্শন করিয়াও তোমার নয়নের আশা মিটিত না, একবার আসিয়া দেখ, তোমার সেই চিরানন্দময় হৃদয়েশ্বরের আজ কি দশা ঘটিয়াছে! তোমার শোকে আজ তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ শিথিল, বদন পাণ্ডুবর্ণ, নয়ন নিষ্প্রভ, দেহ পতিতপ্রায়। জানকি! একবার দেখা দিয়া তোমার জীবিতেশ্বরের জীবন রক্ষা কর।"

আনত-বদনা ও অশ্রুপূর্ণ-নয়না সীতা, বাসন্তীর কথায় মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক চিত্রালিখিতার ন্যায় রামের দিকে চাহিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, হায়, আমাদের উভয়ের যে এই পরিণাম ঘটিবে, ইহা ত কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নাই। এই শেষ, এজন্মে হয়ত আর আর্য্যপুত্রের দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিবে না। সুতরাং একবার মুহূর্ত্তের জন্য, প্রাণ ভরিয়া, জন্মের মত, আমার ইহ-পরকালের দেবতাকে দেখিয়া লই। যখন সীতা এই ভাবে চাহিয়া আছেন, তখন স্নেহময়ী তমসা সাশ্রুনয়নে সীতাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিলেন,—"মা! যুগপৎ,—প্রিয়দর্শন-নিমিত্ত আনন্দে এবং প্রিয়-বিরহ-নিমিত্ত শোকে, তোমার নয়ন হইতে প্রবল ধারায় অশ্রু-

বিগলিত হইতেছে। তোমার আকর্ণ-দীর্ঘ নয়নদ্বয় অতিতৃষ্ণা-নিবন্ধন আরও দীর্ঘতর হইয়াছে, সীতে, তোমার স্নেহ-নিস্যন্দিনী, দুগ্ধধবলা, মনোহারিণী দৃষ্টি তোমার হৃদয়েশ্বরকে যেন অমৃতময় স্নেহরসে অভিষিক্ত করিতেছে। মা, চিত্ত স্থির কর, উৎকণ্ঠা নিবৃত্ত কর, ক্ষান্ত হও।"

সেই কদলী-কুঞ্জের অনতিদূরে, রাম এবং বাসন্তী উপবিষ্ট,—উভয়েই নীরব। রাম শিশিরমাসের তুষারবর্ষী চন্দ্রমার ন্যায় বাষ্প-পূরিত-নয়ন, আর বাসন্তীও মেঘাচ্ছন্ন দিবসের স্থলকমলিনীর ন্যায় নিষ্প্রভ, মলিন-কান্তি। কিয়ৎ-ক্ষণ এইভাবে থাকিবার পর, বাষ্পস্খলিতাক্ষরা বনদেবতা জিজ্ঞাসিলেন, 'মহারাজ! কুমার লক্ষ্মণের মঙ্গল ত?'—অন্যমনস্ক রাম তাহা শুনিতে পাইলেন না, অথবা, পাছে সীতার বনবাসের কথা উঠে, এই আশঙ্কায়, বুঝি শুনিয়াও শুনিলেন না। কিন্তু বাসন্তী আবার কহিলেন,—'মহারাজ! আমার জানিতে বাসনা, কুমার লক্ষ্মণের মঙ্গল ত?'—বলিতে বলিতে বাসন্তীর কণ্ঠরোধ হইল। অতিকষ্টে হৃদয়বেগ সংযত করিয়া, তিনি মস্তক আনত করিলেন। রাম বিষম প্রমাদ গণিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, তাইত, 'মহারাজ'—এই প্রণয়হীন সম্বোধন এবং কুমার লক্ষ্মণের নামমাত্রেই কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ,—ইহার তাৎপর্য্য কি? বোধ হয় বাসন্তী সীতার বনবাস-বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন। এখন উপায়।—সীতাবিয়োগ-কাতরা বাসন্তী মনের আবেগ রুদ্ধ করিতে পারিলেন না, তিনি

সজলনয়নে ও কম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন—‘দেব! কি করিয়া এত দারুণ হইলে?’—

ছায়াময়ী সীতার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল,—বাসন্তী যদি ঐ বনবাস-প্রসঙ্গের উত্থাপন করেন, তবে রামের কষ্টের আর অবধি থাকিবে না। একেইত তাঁহার দেহের এই অবস্থা, তাহার উপর, এই কথোপকথনে, তিনি হয়ত আরও কাতর হইয়া পড়িবেন,—ভাবিয়া, মুগ্ধা, পতিব্রতা জানকী নিজে নিজে বলিলেন,—‘সখি বাসন্তি, আজ কেন তুমি এমন কঠোর হইলে? আর্য্যপুত্র ত সকলেরই প্রীতিভাজন, বিশেষতঃ আমার প্রিয়-সখী তোমার, তবে কেন তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ ব্যথা দাও!” ছায়াপ্রতিমার কথা বাতাসে মিলিয়া গেল, বাসন্তীর কর্ণে তাহা প্রবেশ করিল না। ভাগীরথীর বরে, সীতা সর্ব্বতোভাবে সকলের ইন্দ্রিয়াতীতা।

বিকারগ্রস্তার ন্যায়, উন্মাদিনীর ন্যায়, অসংযতকুন্তলা বাসন্তী বলিতে লাগিলেন—“তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় উচ্ছ্বসিত স্বরূপ, তুমি আমার নয়নের চিরানন্দদায়িনী কৌমুদী, তুমি আমার দেহের অমৃত-লেপসদৃশী,—এইরূপ শত শত প্রিয়বাক্যে একদিন যে সরলার চিত্ত বিমুগ্ধ করিয়াছিলে, দেব! তাহাকেই কি না,”—বাসন্তী আর বলিতে পারিলেন না। “ত্যাগ করিয়াছ” একথা সীতা-সখী বাসন্তীর মুখ দিয়া বাহির হইবার পূর্ব্বেই, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া প্রভঞ্জন-দলিতা লতিকার ন্যায়, স্বর্গচ্যুতা দেবতার ন্যায়, ভূতলে পতিত

হইলেন! বনদেবতার এই আকস্মিক মোহে, রামের দেহে যেন জীবন আসিল, তিনি নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বাসন্তীর বিলাপকালে, সীতা-নির্ব্বাসন-কর্ত্তা অযোধ্যাপতি রাম, অগ্ন্যুদ্গমের পূর্ব্বে আগ্নেয়গিরির ন্যায়, প্রবল ঝটিকার পূর্ব্বে প্রকৃতির ন্যায়, উত্তাল তরঙ্গোত্থানের পূর্ব্বে অম্বুরাশির ন্যায়, প্রশান্তভাবে সেই করুণ-বিলাপিনী বনদেবতার মুখের দিকে চাহিয়া, আত্মকৃত প্রজারঞ্জনের নবীন ইতিবৃত্ত শুনিতেছিলেন, আর বজ্রদগ্ধ বনস্পতির ন্যায়, অনল-গর্ভ শমীতরুর ন্যায়, আপন বুকের আগুনে আপনি পুড়িতেছিলেন। বাসন্তীর বিলাপের প্রত্যেক অক্ষর বিষদিগ্ধ শেলের ন্যায়, রামের জীর্ণ বক্ষে বিঁধিতেছিল। মূর্চ্ছিতা বনদেবতার এবং স-জ্ঞান-মূর্চ্ছিত হৃদয়েশ্বরের দিকে চাহিতে চাহিতে, তমসার অঞ্চলে সীতাও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জনস্থানে যেন মূর্ত্তিমান বিষাদ আবির্ভূত হইয়া, সমগ্র বনস্থলীকে বিষাদিত করিয়া ফেলিল। অবোধ অরণ্যচর প্রাণিনিচয় পর্য্যন্ত, মুখের তৃণকবল ফেলিয়া, ঊর্দ্ধ-নেত্রে ঐ শোকের চিত্র দেখিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, রামের যত্নে বাসন্তীর, ও তমসার সন্তর্পণে কৃশাঙ্গী জানকীর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। প্রলয়ের পর প্রকৃতির যেরূপ অবস্থা, বাসন্তী ও সীতার সেই অবস্থা ঘটিল। বাসন্তীর দিকে রাম, ও সীতার দিকে তমসা চাহিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সীতা-বিয়োগ-বিধুরা, উদ্ভ্রান্ত-লোচনা, আলুলায়িত-কুন্তলা বাসন্তীর দরবিগলিত অশ্রুপ্রবাহে ধীরপ্রশান্ত রামের ধৈর্য্যের সেতু

ভাঙ্গিল। রাম তখন, বাষ্পকম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন—"কোথায় যাই ? কি করিলে আমার এ যাতনার বিরাম হয়! আমার এ—

'হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি
কি দিলে হইবে ভাল।'

হায়, হৃদয়ের এ দুর্ব্বিহ উদ্বেগ ত আর সহ্য হয় না! কেন হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয় না। অবশ দেহ কেন ভূমিসাৎ হয় না? হৃদয়ে নিরন্তর যে প্রবল হুতাশন জ্বলিতেছে, সে কেন আমাকে ভস্মীভূত করে না? মর্ম্মচ্ছেদী বিধাতা কেন আমার জীবনের অবসান করেন না?"—এই প্রকারে রামচন্দ্র কত বিলাপ করিলেন। অযোধ্যার জনাকীর্ণ প্রাসাদে যে হৃদয়কে নানাপ্রকারে সংযত রাখিতেন, আজ এই জনহীন অরণ্যে তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন,—দীর্ঘবন্ধনের পর বিমুক্ত অশ্বের ন্যায়, সে হৃদয়ের বেগ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। রামের অবস্থার দর্শনে স্নেহময়ী তমসার নানারূপ আশঙ্কা হইল। একেইত ঘোর বিপদ, তাহার উপর আবার কোন ঘোরতর বিপদ না ঘটে,—এই চিন্তায় অমল-হৃদয়া তমসা একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। এদিকে বাসন্তীও রামের স্থৈর্য্যসম্পাদনের নিমিত্ত কহিলেন—'দেব! অতীত বিষয়ে ধৈর্য্যাবলম্বনই শ্রেয়ঃ।'—বাসন্তীর এই কথায় রামের হৃদয়বেগ আরও শতগুণ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তখন রাম কহিলেন—

"সখি! কিমত্রোচ্যতে ধৈর্য্যমিতি ?
দেব্যা শূন্যস্য জগতো দ্বাদশঃ পরিবৎসরঃ।
লুপ্তং সীতেতি নামাপি নচ রামো ন জীবতি!!"

"সখি!—কি বলিলে? ধৈর্য্য? সীতাবিরহিত জগতের দীর্ঘতম দ্বাদশবৎসর কাল অতীত-প্রায়, সীতার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত, কিন্তু রাম এখনও জীবিত,—আরও ধৈর্য্য?"—বলিতে বলিতে রামের কণ্ঠরোধ হইল। শোকাকুল রামের এই উক্তিতে, যথার্থই এতদিনে, সীতার হৃদয় হইতে, অকারণ-পরিত্যাগ-রূপ দারুণ বিষলিপ্ত শল্য উত্থিত হইল। দুঃসাধ্য রোগের অবসানে রোগীর দেহের ন্যায়, প্রবল আবেগের অবসানে অলস হৃদয়ের ন্যায়, উৎকট চিন্তার অবসানে চিন্তাশীলের মস্তিষ্কের ন্যায়,—সীতার হৃদয় রামের ঐ কথায় ক্রমে শ্লথ—অবশ হইয়া আসিল। সীতা একান্ত বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। যদিও দণ্ডকায় রামের সহিত সাক্ষাৎকারের পর হইতেই তিনি অনেকটা বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু এখন আরও বুঝিলেন যে, তাঁহার নির্ব্বাসন সার্থক, নারীজন্মধারণ সার্থক।

ক্রমে বনদেবতা বাসন্তীর সহিত রামের কত কথা হইল। রামের সান্ত্বনার জন্য বাসন্তী দণ্ডকারণ্যের কত নয়ন-তর্পণ সুষমা, কত পূর্ব্বপরিচিত দ্রষ্টব্য দেখাইতে লাগিলেন। সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে, পূর্ব্বানুভূত সেই সেই পদার্থের দর্শনে রামের হৃদয়ের অবস্থা আরও শোচনীয় হইল। যখন বাসন্তী কহিলেন:—
'দেব! দেখুন, দেখুন, সীতাপহারী রাবণের যে লৌহনির্ম্মিত রথ জটায়ু চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছিলেন, ঐ সেই রথের ভগ্নাবশেষ, ঐ আপনার সম্মুখে, রাবণের রথবাহী অশ্বসমূহের কঙ্কাল, এই স্থানেই, পাপিষ্ঠ রাক্ষস, বৃদ্ধ জটায়ুর পক্ষ-চ্ছেদনপূর্ব্বক,

তেজস্বিনী সীতাকে সবলে ধারণ করিয়া বিদ্যুদ্-বিলসিত অম্বুদের ন্যায় শূন্যমার্গে আরোহণ করিয়াছিল,'—তখন, বাসন্তীর এই কথার প্রত্যেক বর্ণ, রামের শোকজীর্ণ হৃদয়ের ক্ষতস্থানে বিষদিগ্ধ তীক্ষ্ণ শলাকার ন্যায় বিঁধিতেছিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—'একবার সীতাকে রাবণ হরণ করিয়াছিল, কত উপায়ে, কত কৌশলে সীতার উদ্ধার করিয়াছিলাম, এবার সীতাকে নিজে হারাইয়াছি,—সেই সেই উপায়ে অথবা তদপেক্ষা শতগুণ উপায়েও আর সীতার উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। সেই কপীশ্বর সুগ্রীবের সহিত সখ্য, শূরোত্তম বানরবৃন্দের বীর্য্য,—সেই জাম্ববানের বুদ্ধিকৌশল, হনূমানের অদ্ভুত বিক্রম,—সেই বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নলের সাগরবন্ধন, লক্ষ্মণের বিচিত্র রণকৌশল,—এ সমস্তের সমবায়েও আর সীতাকে ফিরিয়া পাইব না।'—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রঘুপতি দশদিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন, অশ্রু-সিক্ত-কপোলা বাসন্তীও আনত-মস্তকে, চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, রাম রোরুদ্যমানা বনদেবতার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"রামের সহিত সাক্ষাৎকার, এখন, তদীয় সুহৃদ্বৃন্দের নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশেরই কারণমাত্র। সখি বাসন্তি! তোমাকে আর কত কাঁদাইব, যাই,—অশ্বমেধের জন্য আমি যাহাকে সহধর্ম্মচারিণী করিয়াছি, তাহাকে দেখিয়া আমার এ বাষ্পাকুল লোচনের বিশ্রাম করি গিয়া।"—ছায়াময়ী সীতার প্রাণের মধ্যে যে প্রাণ, রামের এই অপরিসমাপ্ত কথা তাহাতে প্রবেশ

করিল, তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া উৎকম্পিত-হৃদয়ে কহিলেন,— "আর্য্যপুত্র! কে সে ভাগ্যবতী?" যখন সীতা এই প্রশ্ন করেন, ঠিক সেই সময়েই রাম, 'সেই হিরণ্ময়ী সীতামূর্ত্তির নিকটে যাই,'—বলিয়া তাঁহার ঐ অসমাপ্ত বাক্যের সমাপ্তি করিলেন। সীতার বুকের উপর হইতে যেন কেহ একখণ্ড বৃহৎ পাষাণ সরাইয়া লইল। তখন সজল-লোচনা সীতা উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কহিলেন—"আর্য্যপুত্র! আর্য্যপুত্র! যাহা শুনিবার, শুনিলাম, তুমি আমায় পরিত্যাগ করিয়াছিলে আজ আবার তুমিই আমার বক্ষঃ হইতে, সেই পরিত্যাগজনিত লজ্জার দারুণ শেল উত্তোলন করিলে! অয়ি হিরণ্ময়ি মূর্ত্তি! ধন্য তুমি, ক্ষণকালের জন্যও যদি আমার আর্য্যপুত্রের নয়নরঞ্জন করিতে পার, তোমার পরম সৌভাগ্য।"—উন্মাদিনী সীতার কথা শেষ হইতে না হইতেই, স্নেহময়ী তমসা আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—"মা! কাহার প্রশংসা করিতেছ? হিরণ্ময়ী মূর্ত্তির? সে যে তোমারই প্রতিকৃতি! এ যে নিজেই নিজের স্তুতি করিতেছ!"—সীতা বিষম লজ্জিত হইলেন। অনেক দিন পরে, সেই বিষাদ-প্রতিমার সংস্কারশূন্য, পাটল অধরপ্রান্তে অপরিচিত হাস্যের রেখা উদ্ভাসিত হইল। তমসা আনন্দ-বিবশ-হৃদয়ে, তাঁহার সীতার সেই সস্মিত মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, সীতার উত্তম্ভিত হৃদয় বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট করিবার জন্য কহিলেন,—"সীতে! একেবারে যে উন্মাদিনী হইলে! অমন করিও না, দীর্ঘজীবী কুশলবের জন্মতিথি-পূজার জন্য যে ভাগী-

রথীর চরণপ্রান্তে যাইতে হইবে, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ? চল।"—ভগবতী তমসার কথায় বিনয়-বিমণ্ডিতা সীতা কোন প্রতিবাদ করিলেন না সত্য,—কিন্তু সীতার প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে তমসার বিলম্ব হইল না। সীতা অনিমেষ-নয়নে, প্রস্থানোদ্যত হৃদয়েশ্বরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তমসা সীতার সেই তৃষ্ণাদীর্ঘ নয়নের তদানীন্তন জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া, মনে মনে সীতাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

রাম শম্বূকবধের নিমিত্ত দণ্ডকায় আসিয়াছিলেন। রামের হস্তে শম্বূক নিহত হইয়া, স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে, রামও মর্ত্তে থাকিয়া এতক্ষণ স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছিলেন।—আজ দণ্ডকায় রাম যদিও নানাবিধ কষ্টভোগ করিয়াছেন, কিন্তু সে কষ্ট কষ্ট নহে, তাপিত জীবনের পক্ষে সে কষ্ট অমৃতলেপসদৃশ। জীবনে সে অমৃত হয়ত আর ঘটিবে না। এই শেষ। বনের দেবতা শ্যামল বনলতার মধ্যে মিশিয়া গিয়াছেন, নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম রাম, এক একবার, পূর্ব্বসংস্কারবশে, সেই বনদেবীকে খুঁজিতেছেন, আবার ভাবিতেছেন,—"একি স্বপ্ন,—না ইন্দ্রজাল! কি দেখিলাম? কোথায় বাসন্তী? কোথায় সীতা?—কোথায় আমি? আমি কি সুপ্ত না জাগ্রত, উন্মত্ত না প্রকৃতিস্থ!"—এই ভাবে কত-কি ভাবিতে ভাবিতে, ধীরোদাত্ত রাম ধীরে ধীরে বক্রগামিনী গিরিনির্ঝরিণীর তট ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন,—এদিকে তমসাও কুসুমহস্তা সীতাকে লইয়া ভাগীরথী-তীরে প্রস্থান করিলেন। সীতা সাচীকৃত-কণ্ঠে তাঁহার

চিরচিন্তিত হৃদয়েশ্বরের দিকে বার বার চাহিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রবাহিণীর বঙ্কিম তট এবং অরণ্যানীর নীলস্নিগ্ধ তরুলতিকায় সীতার দুর্লভতর হৃদয়েশ্বরের দর্শন দুর্লভতম করিল, ঢাকিয়া ফেলিল। সীতা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া, শূন্যমনে ও শূন্যনয়নে, যন্ত্রচালিতা পুত্তলিকার ন্যায়, তমসার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। রাম এবং সীতা—উভয়েরই মনে হইতে লাগিল, যেন এতক্ষণ, তাঁহারা জাগিয়া জাগিয়া কি এক বিচিত্র, ভাবিতেও সুখকর স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। অথবা নিশিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে, হৃদয়ে যে চিন্তার খরস্রোত প্রবাহিত, সেই প্রবল চিন্তা-স্রোতে, তাঁহাদিগকে, ভাসাইতে ভাসাইতে, কোথায়—কোন্ অপরিচিত, এ পঙ্কিল জগতের বহির্ভূত, নূতন শান্তিময় স্থানে লইয়া গিয়াছিল, যে স্থানে মানুষে মানুষের দোষ-অনুসন্ধান করে না, পরের বদন সহাস্য দেখিয়া কাহারও চিত্তে যন্ত্রণা জন্মে না, যে স্থানে, সত্য হউক, মিথ্যা হউক, মানুষ মানুষকে কোনরূপ পরিবাদ দিয়া নির্ব্বাসিত করিতে জানে না, সেই স্থানে লইয়াছিল। সেই স্থানের সে মধুর, আমরণ স্মরণীয় ঘটনালহরী ভাবিতে ভাবিতে রামসীতা চলিয়া গেলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

আগ্নেয়-গিরি।

মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে আজ অধ্যয়নশীল মুনিবালকগণের বড়ই আমোদ। ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে ফিরিবার কালে, বশিষ্ঠ, একবার বাল্মীকির সহিত সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত, তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার ভগবতী অরুন্ধতী এবং কৌশল্যা সুমিত্রা প্রভৃতি। তাঁহাদিগকে দেখিবার মানসে কত তপোবন হইতে কত ঋষিপত্নীরা আসিয়াছেন। কত লোক আসিয়াছে, আশ্রম লোকে লোকারণ্য। সুতরাং আজ আর কাঠের পুতুলের মত স্থির হইয়া, 'স্বাধ্যায়' পড়িতে হইবে না। সমাগত অতিথিদিগকে লইয়াই আচার্য্য ব্যতিব্যস্ত,—পড়াইবেন কখন? তাই তাপসবটুবৃন্দের এত আনন্দ। তাহাদের কেহ বলিতেছে 'আজ শিষ্টানধ্যায়'—বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমনে অধ্যয়ন বন্ধ; কেহ বলিতেছে—"ভাগ্যে এই 'জীর্ণকূর্চ্চগণ' আসিয়াছেন, একদিন তবুও অবসর পাইলাম।" মহাকবি অতি অল্প কথায়, আর্য আশ্রমের কেমন সুন্দর একখানি মূর্ত্তি আঁকিয়া দিলেন। সেই সঙ্গে, মুগ্ধ-প্রকৃতি, নির্ম্মল-হৃদয়, বিদ্যার্থিগণেরও সজীব চিত্র যেন দর্শকগণের সমক্ষে তুলিয়া ধরিলেন। পূর্ব্ব দৃশ্যে, পঞ্চবটীবনে, স্বপ্নের মত আত্রেয়ী, বাসন্তী, রামসীতা, তমসা, মুরলা প্রভৃতি দেখা দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বিষাদের একটা গাঢ় আবরণে সকলেরই হৃদয় আবৃত।—সেই

কথা, সেই শোক, সেই কান্না, সেই বিলাপ, ক্ষণে ক্ষণে, শ্রাবণের ধারার মত, দর্শকগণের চিত্ত আপ্লুত করিতেছে। রামের সেই শোকশীর্ণ পতিতপ্রায় কলেবর, মূর্ত্তিমতী করুণার ন্যায়, শরীরিণী বিরহব্যথার ন্যায়, সীতার সেই শোকপাণ্ডুর আকৃতি, আর সেই সঙ্গে শুভ্রবসনা, সজলনয়না, বিষণ্ণমুখী বনদেবতার সেই করুণমূর্ত্তি—নিমিষে নিমিষে দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে জাগিতেছে। তাহারা যেন জাগিয়া জাগিয়া, স্বপ্নে সেই শোকের চিত্র দেখিতে পাইতেছেন। সকলেই শোকে ও সমবেদনায় একান্ত ম্রিয়মাণ। এভাবে, এমন ঘোরতর বিষাদে, সামাজিকদিগকে দীর্ঘকাল রাখা অসঙ্গত। সুতরাং রসান্তরের প্রয়োজন। তাই ভবভূতি এক অভিনব চিত্র উন্মুক্ত করিলেন। আশ্রম-শিশুদিগের নির্ম্মল মুখ, শরৎ-কমলের ন্যায়, দর্শকবৃন্দের নয়নের জড়তা দূর করিল। বালক যাহারা, দেবতা যাহারা, তাহাদের প্রসন্ন বদন দর্শনে, শোক দুঃখ, ক্ষণেকের জন্যও বিস্মৃত না হয়, এ সংসারে এমন পাষণ্ড কয় জন আছে? দেবতাদর্শনে মনের পাপভার লঘু হয়, দেবতারূপী বালকের দর্শনেও মনের বেদনার ভার, শোকের ভার কমিয়া যায়। ঋষিবালকদিগের দর্শনে এবং অমৃতবর্ষী আলাপনে, দর্শকগণেরও চিত্তের অবসাদ কিয়ৎকালের জন্য মন্দীভূত হইল। দর্শকবৃন্দ, অনিমেষ-নয়নে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহাদের মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে এবং তাহাদের অধ্যয়নের কথা শুনিতে শুনিতে দর্শক-দিগের মনে কত-কি ভাবনা আসিতে-যাইতে লাগিল।

বনদেবতা বাসন্তীর সহিত কথোপকথনকালে, তাপসী আত্রেয়ী সেই যে বলিয়াছিলেন, "বাল্মীকির আশ্রমে এখন আর আমাদের মত জড়বুদ্ধি রমণীর লেখাপড়া চলে না, তথায় অধ্যয়নের নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক। কোথা হইতে এক দেবতা আসিয়া দুইটী শিশুকে মহর্ষির নিকটে রাখিয়া গিয়াছেন। সে শিশুদ্বয়ের সকলই অদ্ভুত। তাহাদের প্রতিভার তুলনা নাই, মাধুর্য্যের সীমা নাই। শুধু ঋষিদিগের নহে, চরাচর সকল প্রাণীর চিত্তই তাহারা বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদিগকে দেখিলে, এমন কেহ নাই, যে স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারে, মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে। তাহাদের একটির নাম কুশ, অপরটীর নাম লব।"--আজ বাল্মীকির আশ্রমের বালকদিগের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, দর্শকগণ, তাপসীর সেই সমস্ত কথা ভাবিতে লাগিলেন।

সেই যে কথা-প্রসঙ্গে, তমসা মুরলাকে কহিয়াছিলেন, "লক্ষ্মণ বাল্মীকির আশ্রমের সন্নিকটে সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার পর প্রসববেদনা উপস্থিত হওয়ায়, মনের দুঃখে একপ্রকার অজ্ঞান হইয়া, দুঃখিনী অনন্যশরণা সীতা গঙ্গার স্রোতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, তথায় গঙ্গার বক্ষেই তাঁহার দুইটি পুত্র জন্মে, সীতার জননী পৃথিবী এবং পতিকুল-দেবতা ভাগীরথী তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া, পুত্রবতী সীতাকে পাতালে লইয়া যান, এবং স্তন্যত্যাগের পর, গঙ্গাদেবী স্বয়ং যাইয়া, সেই পুত্রদ্বয়কে মহর্ষি প্রাচেতসের হস্তে সমর্পণ করিয়া আসেন। নাম তাহাদের

কুশলব, বয়স তাহাদের এখন প্রায় দ্বাদশ বৎসর।”—সেই কথা, সেই বাল্মীকিরই আশ্রমের বালকদিগকে দেখিয়া দর্শকগণের মনে পড়িল। নানাবিধ ভাবের যুগপৎ উদয়ে, তাঁহারা কেমন একটা গোলমালে পড়িয়া গেলেন। কখন হর্ষ, কখন বিষাদ আসিয়া, তাঁহাদিগকে প্রসন্ন ও বিষণ্ণ করিতে লাগিল। অথবা তাঁহারা প্রসাদবিষাদের যেন মধ্যস্থলে উপনীত হইলেন।

সেই যে বাসন্তীর প্রশ্নে আত্রেয়ী বলিয়াছিলেন, ‘সে শিশু দুইটি এখন বেশ বড় হইয়াছে, মুনি স্বয়ং তাহাদিগকে সকল বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন, একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে ক্ষত্রিয়-বিধান-মতে উপনয়ন দিয়া, গুরুদেব বাল্মীকি তাহাদিগকে বেদবিদ্যায় পর্য্যন্ত পারদর্শী করিয়াছেন। তাহাদের মেধা, তাহাদের জ্ঞান,—সকলই বিস্ময়কর। তাহাদের সঙ্গে আমরা পড়িয়া উঠিতে পারি না,’—সেই বাল্মীকিরই আশ্রমে এই অধ্যয়নশীল বালকদিগকে দেখিয়া, দর্শকগণ নিজ নিজ মনে সেই কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। ‘এও ত বাল্মীকির তপোবন, ইহারাও ত বেদাধ্যয়ন-তৎপর, প্রতিভাশালী বিদ্যার্থী, ইহাদের অনেকেরও ত বয়ঃক্রম ১২।১৩ বৎসরের অধিক নহে! এ সব কি?—একি কোন মায়া না মোহ, ইন্দ্রজাল না বাস্তব, কিছুই ত ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।’—এইরূপ নানা বিতর্কে, নানাচিন্তায়, দর্শকগণ ক্রমে একান্ত সন্দিহান হইয়া পড়িলেন।

কি সুন্দর কৌশলে, সৃষ্টিনিপুণ শ্রীকণ্ঠ, ধীরে ধীরে, গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ক্রমে স্ফুটতর করিতে লাগিলেন, এবং সেই সঙ্গে, বেদনা-কাতর সামাজিকসমূহের সবেদন হৃদয়েও আশ্বাসের শীতল প্রলেপ দিলেন, শান্তির জল প্রোক্ষণ করিলেন। দর্শকবৃন্দ ঊষা-সমীর-স্নাত পর্য্যটকের ন্যায় সাকাঙ্ক্ষ-হৃদয়ে ঐ সব দৃশ্য দেখিতে এবং বালকগণের ঐ সুধা-নিস্যন্দিনী বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। যখন কথায় কথায়, তাহাদের একজন বালক বলিল, "ভাই, স্নাতক ব্যক্তি অতিথি-রূপে উপস্থিত হইলে, মাংস-মিশ্রিত মধুপর্কের দ্বারাই তাঁহার অভ্যর্থনার নিয়ম। বশিষ্ঠ প্রভৃতি আসিলেও সেই প্রথা দেখিয়াছিলাম, আজ মহর্ষি জনক আসিলেন, এক্ষেত্রে অন্য প্রকার অভ্যর্থনা কেন? নিরামিষ মধুপর্ক কেন?" তখন সমবেত দর্শকমণ্ডলীর হৃদয়, যেন কোন বৈদ্যুতী শক্তির প্রভাবে, ঐ দিকে ঝটিতি আকৃষ্ট হইল। তাঁহারা চমকিয়া উঠিলেন। জনক? নির্ব্বাসিতা সীতার পিতা জনক? ধনুর্ভঙ্গ-পণ-পূর্ব্বক রামের হস্তে সীতার সম্প্রদান-কর্ত্তা জনক? মিথিলার অধীশ্বর, পুণ্যশ্লোক, দুহিতৃ-গত-হৃদয় জনক? তিনি এখানে? এ না বাল্মীকির আশ্রম? এই আশ্রমের সন্নিধানেই না ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণ, জ্যেষ্ঠের আদেশে, অযোধ্যার মূর্ত্তিমতী কমলাকে ফেলিয়া গিয়াছিলেন? এই আশ্রমেই না ভগবতী জাহ্নবী, সীতাকুমার-দিগকে বাল্মীকির করে সঁপিয়া গিয়াছিলেন? এই আশ্রমেই না ভগবান বশিষ্ঠ, কৌশল্যা সুমিত্রা প্রভৃতির সহিত, কয়েক দিন

হইল, আসিয়া বাস করিতেছেন? এই আশ্রমেই আবার আজ জনকও আসিলেন? ব্যাপার কি? একি বাস্তবিক ঘটনা, না কোন অলীক কল্পনার পরিণাম—স্বপ্ন? এতাদৃশ বিচিত্র সমবায়ের কি কোন কারণ আছে? না ইহা কাকতালীয়?—এইরূপ নানা আন্দোলনে দর্শকগণের হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল। তাঁহারা ভূতাবিষ্টের ন্যায়, বিকারগ্রস্তের ন্যায় তীব্রনয়নে ঐ দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বালকের কথায় অপর একজন বলিল "জান না? মহর্ষি জনক যে অনেক দিন আমিষ ত্যাগ করিয়াছেন, যেদিন দুহিতা সীতার তাদৃশ দৈবদুর্ব্বিপাক শ্রবণ করেন, সেইদিন হইতেই দুহিতৃবৎসল রাজর্ষি বানপ্রস্থ হইয়াছেন। বিশাল সাম্রাজ্য, অতুল বিভব, সব ত্যাগ করিয়া, গত দ্বাদশ বৎসর যাবৎ তিনি চন্দ্রদ্বীপ-তপোবনে তপস্যায় নিরত ছিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহার চিরন্তন সুহৃদ, তাই আজ একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। জনকের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া কুলগুরু বশিষ্ঠ ভগবতী অরুন্ধতীর মুখে কৌশল্যাদেবীকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, মা, তুমি নিজে যাইয়া সর্ব্বাগ্রে মিথিলেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিও। সামাজিকগণের হৃদয়ে এতক্ষণ যে একটা ঘোর উৎকণ্ঠা, একটা প্রবল উদ্বেগ জন্মিয়াছিল, তাহা, জনকের এই পরিচয়শ্রবণে, দারুণ শোকে পরিণত হইল। যাহা নিমিষের জন্য বুঝি বা ভুলিয়াছিলেন, সেই সীতাবিসর্জ্জন-কাহিনী আবার তাঁহাদের মনে পড়িল। রাম যে গুরুতর কর্ম্ম করিয়া বসিয়াছেন, তপঃ-প্রভাব-

সম্পন্ন জনকের সাধ্বী দুহিতাকে নির্ব্বাসিত করিয়া, যে অমার্জ্জনীয় অপরাধে স্বয়ং অপরাধী হইয়াছেন, এবং সমগ্র সূর্য্য বংশকেও অপরাদ্ধ করিয়াছেন, তাহার ক্ষালন কোন দিন না হইলেও, কুলগুরু বশিষ্ঠের কর্ত্তব্য সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য-বিধান। সীতা ত আর ফিরিয়া আসিবেন না। এ জন্মের মত সীতা নাম সংসার হইতে মুছিয়া গিয়াছে। যাহার জন্য রামের সহিত জনকের সম্বন্ধ, তাহার বিলোপ হইয়াছে। দুর্ব্বাসার ন্যায় অপর কোন ঋষি হইলে, হয় ত রামের শকুন্তলার মত দুর্দ্দশার চরম হইত, প্রশান্ত জনকের নিকট তাদৃশ তাপস-বিরোধী ভাবের সম্ভাবনা নাই। সূর্য্য-কুলের রাজকুমার জনকের কন্যার পাণিপীড়ন করায়, সূর্য্যবংশীয়দিগের গৌরব শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে গৌরবের পতাকা প্রবল ঝঞ্ঝায় কোথায় চলিয়া গিয়াছে, পতাকাশূন্য, দুর্দ্দর্শ স্তম্ভের ন্যায়, সে বংশ এখন একান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়া আছে; শোকে, দুঃখে, বিষাদে, নিরন্তর বিড়ম্বিত হইতেছে। যাঁহার অনুগ্রহে একদিন সূর্য্য-বংশের এত গৌরব হইয়াছিল, আজ তিনি,—সেই রাজর্ষি বানপ্রস্থ জনক আসিয়াছেন। সম্পদের যিনি বিধাতা ছিলেন, বিপদের সময়ে তাঁহার নিকটে যাও, তাঁহার সম্মানরক্ষা কর। সীতাকে বনবাস দিয়া রাম যে অপরাধ করিয়াছেন, তাহার অপনোদন না হউক, সে অপরাধের যতদূর সম্ভব, প্রতিপ্রসব কর; দোষী পক্ষেরই অগ্রে আত্মসমর্পণ বিধেয়। তাই কুলগুরু বশিষ্ঠ কৌশল্যাকে অগ্রে জনকের নিকটে

যাইতে অনুমতি করিয়াছেন। কি সুন্দর কল্পনা! কি মর্ম্মস্পর্শী ভাব!

দর্শকবৃন্দ যখন সবেদন-হৃদয়ে এইভাবে বালকগণের দিকে চাহিয়া আছেন, আর তাহাদের ঐ সকল কথাবার্ত্তা শুনিতেছেন, শুনিয়া শুনিয়া এক একবার দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতেছেন, চোক যেন ফাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহা হইতে এক বিন্দুও অশ্রু নিপতিত হইতেছে না, হৃদয়ের দারুণ বেদনায় বুক যেন শুকাইয়া গিয়াছে, সীতার কথা, সেই অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীর বনবাসের কথা ভাবিতে ভাবিতে একান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন;—ঠিক সেই সময়ে. ঐ ঋষিকুমারদিগের একজন বলিয়া উঠিল,—"ঐ দেখ, আশ্রমের বহির্দ্দেশে বৃক্ষের মূলে, ঐ রাজর্ষি জনক একাকী বসিয়া আছেন। আহা, দুঃসহ সীতাশোকে রাজর্ষির দেহের কি শোচনীয় দশাই না ঘটিয়াছে! দেখিলে মনে হয়, যেন বনস্পতি অন্তর্জ্জ্বলিত অনলে অহর্নিশ দগ্ধ হইতেছে, হয়ত অচিরেই ভস্মীভূত হইবে।"[১]

শোকাকুল দর্শকমণ্ডলী উন্নতকণ্ঠে সেই দিকে চাহিলেন।—দেখিলেন. যথার্থই জনক। অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্বে আগ্নেয়গিরির ন্যায়, শিলাবৃষ্টির পূর্ব্বে অন্তঃস্তম্ভিতবর্ষণ বারিবাহের ন্যায়, সীতা-বৎসল রাজর্ষি বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল প্রশান্ত, গম্ভীর,

---

১- উত্তর চরিত—চতুর্থ অঙ্ক,—

হৃদি নিত্যানুষক্তেন সীতাশোকেন তপ্যতে।

অন্তঃপ্রদীপ্তদহনো জীর্ণন্নিব বনস্পতিঃ॥

নয়ন যেন বহির্দর্শনে নিবৃত্ত হইয়া, কোনও অন্তঃপদার্থ-নিরীক্ষণে নিহিত। ললাটফলক আকুঞ্চিত, রেখামণ্ডিত ; ধূসর কায়, ধূসর কান্তি। তুষারমণ্ডিত নগপতির ন্যায়, সেই ধীর প্রশান্ত চিন্তাকুল রাজর্ষির দিকে দর্শকবৃন্দ একলক্ষ্যে চাহিয়া রহিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

সুপ্রভাত।

আশ্রমে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে, দুহিতৃ-শোক-কাতর জনক তাই বাহিরে তরুমূলে বসিয়া আছেন ; নির্জ্জনে, একাকী বসিয়া, নিজের মনে বলিতেছেন,—'দুহিতা সীতার প্রতি যে ভয়ঙ্কর পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কৈ এতকাল হইল, কিছুতেই ত তাহা ভুলিতে পারিলাম না! যত দিন যাইতেছে, তত নিত্য নূতন আকারে সে শোক আমার মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছে! এই প্রবল জরা, দুঃসহ দুঃখ, অতিকৃচ্ছ্র তপশ্চরণ প্রভৃতিতে দেহ তৃণাপেক্ষাও দুর্ব্বল হইয়াছে, কৈ? এখনও ত ইহার ধ্বংস হইল না! যাহারা আত্মঘাতী, অনন্তনরকে তাহাদের গতি। জীবনের ভারও ত আর বহন করিতে পারি না। মা জানকি! তোমার এমনই দুরদৃষ্ট, অথবা তোমার কেন, আমার অদৃষ্ট এমনই মন্দ যে, লোকলজ্জায় তোমার জন্য স্বচ্ছন্দে কাঁদিতেও পারি না। বৃথাকলঙ্কে তোমার নাম পর্য্যন্ত কলঙ্কিত করিয়াছে। মা,—

যখন শিশু ছিলে,—সেই যে অহেতুক রোদন, অকারণ হাসি, কুন্দকুট্মলনিভ শুভ্র দশন-মুক্তা, সেই অশ্রুবিন্দু-শোভিত সহাস্য বদনপঙ্কজ, সেই অর্দ্ধোচ্চারিত গদগদ মধুর ভাষ, সাতে! আর ত ভাবিতে পারি না! ভগবতি পৃথিবি! তুমি যাহার পবিত্রতায় তাদৃশী কন্যার জননী বলিয়া, আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিতে, বিশ্ব-পাবক বৈশ্বানর, ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা, দেবী অরুন্ধতী, অথবা অধিক কি, রঘুকুলের আদিদেবতা স্বয়ং ভাস্কর পর্য্যন্ত, যাহার মাহাত্ম্য বিদিত ছিলেন, বিদ্যার জননী সরস্বতীর ন্যায় তুমি যাহার জননী, তোমার সেই সাধ্বী তনয়ার প্রতি তাদৃশ অত্যাচার! বলিতে বুক ফাটিয়া যায়, পূর্ণগর্ভাবস্থায় অরণ্যে পরিত্যাগ! মা হইয়া, তুমি কি করিয়া সহ্য করিলে! তুমি যথার্থই সর্ব্বংসহা।'

পালিততনয়া শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠাইবার সময়ে সেই একবার, মহাকবি কালিদাসের করুণ বাঁশরীতে মুক্তপস্বী কণ্বের ক্রন্দন শুনিয়াছিলাম, সেই—

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া,
অন্তঃস্তম্ভিত-বাষ্পবৃত্তি-কলুষং চিন্তাজড়ং দর্শনং।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ ॥[১]

[১]—উত্তর চরিত—শকুন্তলা আজ চলিয়া যাইবে,—ভাবিতে ভাবিতে আমার হৃদয় উৎকণ্ঠায় ভরিয়া গিয়াছে। অন্তঃকরণের অবরুদ্ধ আবেগভরে নয়নের দৃষ্টিশক্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। আমি বনবাসী, আমারই চিত্তের যখন এই

প্রভৃতি বিষাদগীতিকার শ্রবণে প্রেমিক কবির সহিত আমাদেরও চক্ষে জল আসিয়াছিল। আর আজ ভবভূতিরও করুণকণ্ঠে দুহিতৃশোকোন্মত্ত জনকের ক্রন্দন শুনিলাম। আজ আর মাত্র চক্ষে জল আসা নহে, তারস্বরে কান্দিতে ইচ্ছা করিল। কালিদাসের কবিতায় যে বাষ্প অন্তরে স্তম্ভিত ছিল, তাহা আজ নয়ন ভেদ করিয়া বাহিরে আসিল।

জনকের আর্ত্তনাদ শেষ হইবার পূর্ব্বেই তথায় অরুন্ধতী দেখা দিলেন, সঙ্গে তাঁহার কৌশল্যা। জনক দেখিলেন,—দেখিলেন, দশরথের জীবিতকালে যিনি অযোধ্যার রাজসংসারের মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী ছিলেন, আজ তাঁহাকে চিনিতেও কষ্ট হয়! সে শ্রী, সে উল্লাস, সে দেহজ্যোতিঃ কোথায় গিয়াছে! 'সোণার বরণ কালি' হইয়াছে! সখা দশরথের মহিষীর সে দুঃখের দশা, জনক বেশী ক্ষণ দেখিতে পারিলেন না, সজলনয়নে মুখ ফিরাইলেন। যাঁহার দর্শন জনকের পক্ষে পূর্ব্বে মূর্ত্তিমান মহোৎসবের তুল্য ছিল, আজ সেই কৌশল্যার দিকে চাহিতেও বুক ফাটিয়া যায়, যেন ক্ষত স্থানে অসহ্য ক্ষারবর্ষণ হয়।

জনকের পুরোভাগে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, সীতানির্ব্বাসন-কাতরা কৌশল্যা বজ্রাহতার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, আর চলিতে পারিলেন না। 'নিজে যাইয়া বিদেহপতিকে দর্শন করিবে, এই তোমার গুরুদেবের আদেশ, তবুও' প্রতিপদে

অবস্থা, তখন না জানি যাহারা গৃহী, দুহিতার নববিচ্ছেদে তাহাদের কত পীড়াই জন্মে!

কেন এমন করিতেছ, যাহা হইবার হইয়াছে, চিত্ত স্থির কর, অগ্রসর হও'---বলিয়া দেবী অরুন্ধতী আগ্রহ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে তাঁহারা সম্মুখে উপস্থিত হইলে, পরস্পরের কুশল প্রশ্নের পর, রাজর্ষি জনক অরুন্ধতীকে জিজ্ঞাসিলেন---"দেবি! প্রজানুরঞ্জন-তৎপর অযোধ্যাপতির জননীর মঙ্গল ত?"---জনকের প্রশ্নের প্রতিঅক্ষর যে শোকোদ্দীপক ও তিরস্কার-সূচক, প্রাচীন কঞ্চুকীর ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি অযোধ্যার রাজবংশের সুখদুঃখের, সম্পদ্-বিপদের সাথী, মর্য্যাদারক্ষায় ব্রতী। জনকের ঐ শ্লেষাত্মিকা তিরস্কার বাণী বিষাক্ত বাণের ন্যায় তাঁহার বক্ষে বিঁধিল, তিনি অমনি দলিত ভুজগের ন্যায় গ্রীবা উন্নত করিয়া কহিলেন, 'রাজর্ষে! সীতা-পরিত্যাগ-নিবন্ধন মনের দুঃখে জননী কৌশল্যা জ্যেষ্ঠ পুত্র রামের মুখদর্শন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন, অহর্নিশ কান্দিয়া কান্দিয়া চক্ষুর দীপ্তি হারাইয়াছেন, তাঁহার প্রতি এরূপ উক্তি আপনার মুখে শোভা পায় না। বৎস রামেরই বা অপরাধ কি? পৌরগণ নানাদিকে নানাবিধ বীভৎস কিংবদন্তীর সৃষ্টি করিতে লাগিল, ক্ষুদ্র তাহারা, সুদূর লঙ্কা-নগরীর সেই অগ্নি-পরিশুদ্ধিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না, তাই এই দারুণ ব্যাপার ঘটিয়াছে। আপনি ত সবই জানেন।' জনকের তপঃপ্রভাবোজ্জ্বল নয়ন কঞ্চুকীর বাক্যে ধক্ ধক্ জ্বলিতে লাগিল। "কি বলিলে! আমার দুহিতার পরিশোধনের কর্ত্তা অগ্নি? ধিক্, রাম আমার যে অপমান করিয়াছেন, এই সকল দুর্ব্বাক্যে তাহা শতগুণ বর্দ্ধিত হইতেছে

মাত্র।"—বলিতে বলিতে শোকে, ক্ষোভে, দুঃখে, মহাত্মা মিথিলাপতির স্বর জড়ীভূত হইয়া আসিল। ক্ষণেকের মধ্যেই তিনি আত্মধারণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার তপঃক্ষাম কলেবর, মন্ত্র-রুদ্ধ-বীর্য্য ভোগীর ন্যায় থর থর কাঁপিতে লাগিল। অরুন্ধতী আরও সম্মুখে গেলেন এবং শিষ্যা সীতার চরিত্রের উৎকর্ষ ও গুণের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া কহিলেন, "মা জানকি! তুমি শিশুই হও আর শিষ্যাই হও, আমার ভক্তির পাত্র, অথবা আমার কেন, ত্রিজগতের তুমি আরাধ্যা :—

'গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু নচ লিঙ্গং নচ বয়ঃ॥"—

বলিতে বলিতে কণ্ঠের কথা কণ্ঠেই স্খলিত হইল। সাশ্রুনয়না অরুন্ধতী অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অরুন্ধতীর কণ্ঠ-রোধের সঙ্গে সঙ্গেই এদিকে কৌশল্যা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। কৌশল্যার মূর্চ্ছায় সকলেই একান্ত অধীর হইলেন। জনকও বুঝিলেন যে ব্যথার উপর ব্যথা দেওয়া ভাল হয় নাই। তিনি কমণ্ডলু হইতে শান্তিবারি লইয়া হতচৈতন্যা মহাদেবী কৌশল্যাকে অভ্যুক্ষিত করিলেন। দুঃখের প্রবল বেদনার যদি কোন প্রতিকার থাকে, তবে তাহা মূর্চ্ছা। মূর্চ্ছাপগমে কৌশল্যা আকুলহৃদয়ে ও সজলনয়নে জনকের মুখের দিকে,—তাঁহার বড় সাধের পুত্রবধূ, বিসর্জ্জিতা স্বর্ণপ্রতিমা সীতার পিতার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সেই যে, হরধনুঃ ভঙ্গ করিয়া রাম ঘরে ফিরিয়াছেন, কিন্তু ফিরিবার পূর্ব্বেই, বায়ুভরে নৃত্য করিতে করিতে যেন রামের যশো-

গীতিকা আসিয়া জননী কৌশল্যার কর্ণে সুধাধারা বর্ষণ করিয়াছিল; আর মাতা কৌশল্যা উল্লাসিতপ্রাণে সুমিত্রা কৈকেয়ী প্রভৃতির সহিত, পুত্র ও পুত্রবধূদিগকে বরণ করিয়া লইতেছিলেন: সেই যে ক্ষীরের পুতুলের মত, কোমলতাময়ী বালিকা সীতাকে কোলে কোলে রাখিয়া, দর্শনার্থিনী কামিনীদিগকে দেখাইতেছিলেন; সেই যে মহারাজ দশরথ স্নেহে অন্ধ হইয়া সর্ব্বদা কহিতেন "দেবি! রঘুকুলের অন্যান্য পূজনীয়গণ, সীতাকে বধূর মত দেখিতে হয় দেখুন, আমরা কিন্তু ভাবিব, সীতা আমাদের দুহিতা;"—সেই সব আজ কৌশল্যার মনে, স্বপ্নের মত ভাসিয়া উঠিল। তিনি ধূলায় পড়িয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। গুরুদেবী অরুন্ধতী নিস্পন্দনয়নে করুণবিলাপিনী রামজননীর দিকে চাহিয়া আছেন, বিলাপে বাধা দিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই। তিনি প্রবীণা।—সংসারের কুটিল আবর্ত্তের, শোকদুঃখের দুর্ব্বার আঘাতের স্বরূপ তিনি জানেন। তিনি জানেন যে—

পূরোৎপীড়ে তড়াগস্য পরীবাহঃ প্রতিক্রিয়া।
শোকক্ষোভে চ হৃদয়ং প্রলাপৈরেব ধার্য্যতে॥[১]

তিনি বুঝেন যে,—

সন্তান-বাহিন্যপি মানুষাণাং
দুঃখানি সদ্বন্ধু বিয়োগজানি।

১—উত্তরচরিত, ৩য় অঙ্ক। ২০৪পৃঃ ফুটনোট দেখ।

দৃষ্টে জনে প্রেয়সি দুঃসহানি
স্রোতঃসহস্রৈরিব সংপ্লবন্তে ॥[১]

তাই তিনি, নীরবে বিলপমানা কৌশল্যার দিকে চাহিয়া আছেন। আর জনক,—তাঁহার হৃদয়কন্দর, অন্তশ্চর জলজন্তুর আস্ফালনে নদী-গর্ভের ন্যায়, দুর্ব্বার দুহিতৃশোকে আন্দোলিত হইতেছে। তিনি রণান্তে অবসন্ন মদবর্ষী নাগের ন্যায়, শিথিল দেহে বসিয়া বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। মুখে কথাটিও নাই। আর ঐ অদূরে জরানমিতকায় বৃদ্ধ কঞ্চুকী যষ্টিভরে দাঁড়াইয়া এই শোকের চিত্র দেখিতেছে। তাহার ভগ্নদেহ, বার্দ্ধক্যে, শোকে, বাতেরিত কদলীপত্রের ন্যায় কাঁপিতেছে। শান্তিময়, সত্ত্বপ্রধান, বিষাদলেশ-শূন্য আদি কবি বাল্মীকির আশ্রমে আজ শোকের, দুঃখের, মর্ম্মবেদনার যেন শতমুখ উৎস উত্থিত। তথায় আজ সত্যই যেন—

করি শিশিরের ছল
বরষিছে আঁখিজল
শাখী, দেখ, পাখীকুল স্তব্ধ মূক-প্রায়!

১—উত্তর-চরিত, ৩য় অঙ্ক :—বর্ষার জলপ্লাবন হইতে তড়াগ রক্ষা করিতে হইলে যেমন, তড়াগের তটের কোন স্থল দিয়া একটি প্রবাহ বাহির করিয়া দিতে হয়, তদ্রূপ শোক এবং ক্ষোভের সময়ে হৃদয়ে গুরুভার একমাত্র প্রলাপের দ্বারাই কতকটা লঘু করা যায়।

বন্ধুবিরহে মানুষের যে অবিচ্ছিন্ন ও অসহ্য, দুঃখ জন্মে, তাহা, আত্মীয়স্বজনের দর্শনে শতগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

নীরবে কাঁদিছে শিখী
ঐ দেখ, থাকি থাকি
মৃগকুল যায়, আর ফিরে ফিরে চায়!
দারুণ শোকের ঘায়
যেন মর্ম্মবেদনায়—
একটি পল্লব নাহি করে দলমল!
বহে না সমীর সেথা
ঝরে না একটি পাতা
তরুলতা সব যেন শোকে অচঞ্চল!!

আশ্রমের বহির্দ্দেশে যখন, এইরূপে মর্ম্মবিদারী শোকের দারুণ অনল জ্বলিতেছিল, ঠিক তেমনই সময়ে, দূরে, দৃষ্টির অগোচরে, কল কল করিয়া কতকগুলি বালক কলরব করিল। সে কলরবধ্বনিতে,—না না সে অমৃত-বর্ষণে, জনক-কৌশল্যা প্রভৃতির দগ্ধহৃদয় ক্ষণেকের জন্য জুড়াইয়া গেল! দেখিতে দেখিতে, বর্ষার পল্লীপ্লাবী জলস্রোতের ন্যায়, বালকের দল তাঁহাদের সমক্ষে আসিল; তাহাদের প্রত্যেকেই যেন আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি। আজ অনধ্যায়, তাই আহ্লাদের সীমা নাই। প্রকৃতির বিকৃতি করিয়া, আজ আর বসিয়া বসিয়া অধ্যয়ন করিতে হইবে না। নন্দনকাননে আজ আর কিংশুকরোপণ করিবে না। প্রাণ ভরিয়া, আজ তাহারা একটু খেলা করিতে পাইবে, তাই এত উৎসব। তাহাদের আগমনে, হঠাৎ বনস্থলী যেন হাসিয়া উঠিল। উদ্বেগকর শীত সমীরণের মধ্যে যেন বসন্তের তন্দ্রা-

জনক মধুর বায়ু বহিল। সে বায়ুতে অবসন্ন দেহে নবজীবন আনিল। বালকবৃন্দ কুসুমস্তবকের ন্যায় হাসিতে হাসিতে জনক-কৌশল্যা প্রভৃতির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, পরক্ষণেই আবার, খেলিতে খেলিতে একটু দূরে সরিয়া গেল। তাহাদের সস্মিত বদনপদ্ম, সুখস্বপ্নের ন্যায়, জনককৌশল্যাদির মানসনয়নে ভাসিতে লাগিল। কিছু দূর যাইয়া বালকবৃন্দ আবার ফিরিল। আবার নিকটে আসিল। কেহ বা মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া ঐ অতিথি-দিগকে দেখিল, আবার চলিয়া গেল। কৌশল্যার ত কথাই নাই, জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসী জনক পর্য্যন্ত এ মায়ার খেলায় বিমুগ্ধ হইলেন। এত সুন্দর মুখের যিনি রচয়িতা, আহা, তিনি না জানি কত সুন্দর, কত মনোরম,—ভাবিতে ভাবিতে জনকের শোকাশ্রু-সিক্ত গণ্ডে প্রেমাশ্রুধারা বহিল। দর্শকগণের চিত্তে এতক্ষণ বিষণ্নতার যে ঘনকৃষ্ণ আবরণ পড়িয়া ছিল, তাহারও ঝটিতি অপসারণ হইল। শিশুগণের সেই নিষ্কলঙ্ক বদনেন্দুমালা দেখিতে দেখিতে তাঁহারা প্রসন্নতার ক্ষীর-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। শোকী, তাপী, সুখী, দুঃখী—কাহারও দিকে না চাহিয়া, কাহারও অপেক্ষা না করিয়া, সুধাকর আকাশে উদিত হয়েন, উদয়-মাত্রেই জগত হাসিয়া উঠে। রাজার ঐশ্বর্য্য-দৃপ্ত প্রাসাদ আর দরিদ্রের নিঃসম্বল পর্ণকুটীর, সর্ব্বত্র সমভাবে চন্দ্রমার সে হাসি নৃত্য করে। তুমি সহিতে পার-না-পার, তাহাকে চাও-না-চাও, তোমাকে সে চায়। সে হাসি পরের হৃদয় আপন করিতে চায়। আজ মুহূর্ত্তের মধ্যে আসিয়া, বালকগণ মুগ্ধ-মুখ-শশীর

বিমল জ্যোৎস্নায় সকলকে আলোকিত করিল। যাহারা পর ছিল, তাহাদিগকে আপন করিয়া লইল। জনক, কৌশল্যা, অরুন্ধতী, কঞ্চুকী প্রভৃতির ন্যায় সমবেত সামাজিকবৃন্দও আত্মহারা হইয়া, সব ভুলিয়া, ঐ ভূতলচন্দ্রমাদিগকে অনিমেষনেত্রে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না যে, এ কি কোন স্বপ্ন, না তাঁহাদের বেদনা-দীর্ঘ দুরতিক্রম বিষাদ-রজনীর সুপ্রভাত!

সপ্তদশ অধ্যায়।

লব।

প্রফুল্ল শরৎকমল-পুঞ্জের ন্যায় বালকবৃন্দ শ্রেণিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া জনকাদিকে দেখিতেছে,—তাহারা জানে না যে, ইঁহারা কে, কোন্ তপোবনে ইঁহাদের আশ্রম? অথবা এ'ত জানিবার প্রয়োজনও তাহাদের নাই। ইঁহারা যেই হউন, যে তপোবনেরই হউন, বালকদিগের তাহাতে কোন লাভালাভ নাই। নবাগত বলিয়া একটু দেখিতেছে, এখনই চলিয়া যাইবে।

সব নীরব। জনক, কৌশল্যা, অরুন্ধতী, কঞ্চুকী, সামাজিক-বৃন্দ,—সকলেই নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপবৎ স্থির, স্পন্দনরহিত। সম্মুখে বনকুসুম-সন্নিভ ঋষিকুমারগণ নীরবে দণ্ডায়মান, যেন চিত্রলিখিত। বালকগণের মধুর সারল্যে, সৌন্দর্য্যে, সৌকুমার্য্যে,

যেমন বয়োবৃদ্ধগণ বিস্মিত, তাঁহাদের কৌতূহল-দীর্ঘ দৃষ্টিতে, স্নেহবর্ষী আকার ইঙ্গিতে তেমনই ঋষিবালকেরাও মুগ্ধ,—এমনই সময়ে প্রথমে কৌশল্যা কথা কহিলেন। শোকাতুরা মহারাণীর তাপক্লিস্ট হৃদয়ে, বালকগণের মধুরদর্শনজনিত অমৃত ধারায় ক্ষণ-কালের নিমিত্ত যে শান্তি বর্ষণ করিতেছিল, তাহাতে একটু সুস্থ হইয়া, যেন নিমেষের জন্য শোকতাপ সব ভুলিয়া, কৌশল্যা বলিলেন, "আহা, কি সুন্দর মূর্ত্তি! ইহারা সকলেই যেন এক একটি স্নেহের পুতুল! ইহাদের মধ্যে আবার ঐ যে প্রস্ফুটিত নীল কমলের ন্যায় সুন্দর শিশুটি, উহার নাম কি? উটি কোন্ ভাগ্যবতীর অঞ্চলের রত্ন? মৃদুতা, মনোহারিতা এবং চারুতার এমন একাধার ত আর দেখি নাই। আমার রামও বাল্যকালে ঠিক এমনিই সুন্দর, এমনিই মনোমোহন ছিল।"—সকলেই তিলার্দ্ধের জন্য চমকিয়া উঠিলেন। মহারাণীর কথায় সকলেই একদৃষ্টে সেই বালকটীর দিকে চাহিলেন। যে প্রসঙ্গ ক্ষণ-কালের জন্য সকলে ভুলিয়াছিলেন,—তাহা যেন নূতন আকারে আসিয়া মনে আধিপত্য করিয়া বসিল। সেই রাম, সেই সীতা, সেই সীতাকুমারযুগল মনে পড়িল। সেই জাহ্নবীজীবনে জানকীর আত্মবিসর্জ্জন, প্রসব, তারপর পৃথিবী ও ভাগীরথী কর্ত্তৃক সেই কুমারদ্বয়ের বাল্মীকির করে সমর্পণ, সেই আত্রেয়ী-কথিত বৃত্তান্ত, সেই শিশুদ্বয়ের নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা, একাদশবর্ষ বয়ঃক্রমে উপনয়ন, বেদাভ্যাস, সেই সর্ব্বজনমনোরঞ্জিনী মূর্ত্তি, অনুপম প্রতিভা, অসাধারণ বুদ্ধি—প্রভৃতির বিষয় মনে পড়িল।

এও ত বাল্মীকির আশ্রম, এই খানেই ত সীতাকুমারগণ আনীত, শিক্ষিত ও রক্ষিত হয়েন। লব কুশ—যাহাদের নাম, তাহারাও ত এই আশ্রমেই থাকে, ইহার মধ্যে কি তাহাদের কেহ আছে? অথবা ঐ শিশুটি কে? মহারাণী ত ঠিকই বলিয়াছেন, উহার দেহের ছায়া ত রামেরই অনুরূপ; যেন রামেরই বাল্যকালের প্রতিমূর্ত্তি!—এইরূপ কত কি বিতর্কে দর্শকবৃন্দ একান্ত উন্মনা হইয়া উঠিলেন। সীতার পুনর্দ্দর্শনের আশা আর নাই, আত্রেয়ী বলিয়াছেন, সীতার সংবাদ তিনি জানেন না। যদি সীতাকুমার-যুগলের কাহাকেও একবার দেখিতে পাইতেন, দর্শকবৃন্দের সীতা-শোক-কাতর হৃদয়ের কতক সান্ত্বনা হইত। অযোধ্যার প্রজারঞ্জন নরপতির পুত্র, কোশল-সাম্রাজ্যের ধর্ম্মাসনের ভাবী অধিকারী, মিথিলাপতির দৌহিত্র, অদৃষ্টবশে আজ অরণ্যচর মুনিবালকবৃন্দের অন্যতমরূপে পরিণত! নবমল্লিকাপ্রসূন কঠিন শিলাফলকে নিক্ষিপ্ত! নিয়তির কি বিচিত্র লীলা!—ভাবিতে ভাবিতে কৌশল্যা-প্রদর্শিত বালকের দিকে সকলে সাগ্রহে চাহিয়া রহিলেন।

নিপুণদৃষ্টি প্রবীণ জনকও দেখিলেন,—দেখিলেন, তাঁহার রাম যেন পুনরায় শিশুর আকার ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সমস্ত মুনিকুমারগণ, ঐ দ্বাদশবর্ষীয় বালকের নেতৃত্বে পরিচালিত। বালক যে দিকে চায়, সে দিকটাই যেন অমল দুগ্ধ-ধারায় অভিষিক্ত হয়। যখন কথা বলে, যেন অমৃতবর্ষী মুক্তারাশির বৃষ্টি হয়। বালকের পৃষ্ঠদেশের উভয় পার্শ্বে দুইটী

তূণীর প্রলম্বিত, তাহাতে কঙ্ক-পক্ষশোভিত সুন্দর সুন্দর বাণ, মস্তকের অযত্নবর্দ্ধিত কেশ-কলাপ দুলিয়া দুলিয়া সেই বাণের উপর পড়িতেছে, উড়িতেছে, সরিতেছে। কি সুন্দর দৃশ্য! বালকের সমুন্নত ও সুকোমল বক্ষঃস্থলে ভস্মের বিলেপন। তাহার উপর মৃগচর্ম্মের উত্তরীয়। কটিদেশে আবার লতানির্ম্মিত শ্যামল মেখলায় মঞ্জিষ্ঠা-রাগ-রঞ্জিত অধোবাস আসঞ্জিত। আর বালকের আতাম্র-কর-পল্লবে সুদৃঢ় শরাসন ও বলয়াকার অক্ষসূত্র! জনক নির্বিষ্টনয়নে দেখিলেন,—দেখিয়া দেখিয়া, বিস্মিতকণ্ঠে অরুন্ধতীকে কহিলেন—'ভগবতি! দেখিতেছেন না? কি অনুমান হয়? কে এ বালক?' অরুন্ধতী আনন্দাশ্রুর সংবরণ-পূর্ব্বক বলিলেন—'আমরা ত মাত্র আজ আসিয়াছি।'—অরুন্ধতী সমস্তই জানিতেন। ভাগীরথী তাঁহাকে সমস্ত রহস্য বলিয়াছিলেন। অরুন্ধতী প্রথমে, বালকবৃন্দের দর্শন মাত্রেই, ভাগীরথীর নিবেদিত কথা স্মরণ করিয়াছিলেন, এবং ঐ বালকটিই যে সেই সীতাকুমারযুগলের অন্যতর, তাহাও বুঝিয়াছিলেন, তবে ও যে কোনটি, কুশ না লব, তাহা ঠিক চিনিতে পারেন নাই। ভগবান্ বাল্মীকি যে অদ্ভুত উপায়ে রামসীতার পুনর্মিলন করিতে উদ্যত, তাহার রহস্য পূর্ব্বে ভেদ করা সর্ব্বথা অনুচিত, তাই বশিষ্ঠপত্নী, জনকের প্রশ্নের অন্যরূপ উত্তর দিলেন। প্রষ্টব্য বিষয়ের প্রকৃত উত্তরে উদাসীন থাকিয়া, 'মাত্র আজ আসিয়াছি'—বলিলেন। মহাতপাঃ জনক তপঃপ্রভাবেই অবাধে সমস্ত জানিতে পারিতেন। কিন্তু এই

তুচ্ছ বৈষয়িক ব্যাপারে তপঃক্ষয় করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তথাপি প্রতিভালোকে তিনি যেন অনেকটা আভাস দেখিতে পাইলেন। কৌতূহলে প্রাণ ভরিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "কঞ্চুকিন্! বড়ই কৌতুক হইতেছে। একবার যান, ভগবান্ বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করুন গিয়া, আর ঐ বালকটাকেও বলুন—যে, কয়েক জন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি তোমাকে দেখিতে চাহিতেছেন"। জনকের কথায়, সীতাবিসর্জ্জন-বিমূঢ়া বিষাদিনা কৌশল্যার প্রাণে একটু হর্ষের উদয় হইল, কিন্তু পরক্ষণেই, "ডাকিলেও যদি বালক নিকটে না আসে," ভাবিয়া আবার তিনি বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। সামাজিকগণের হৃদয়ের যে আকাঙ্ক্ষা, তাহা যেন মহর্ষি জনক ধ্যানবলে জানিয়াছেন। বালক আসিতেছে—ভাবিয়া তাঁহারাও উৎফুল্ল হৃদয়ে ও উন্নত কণ্ঠে, তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ঋষিকুমার-বেশী বালক সম্মুখে আসিয়াই মহা বিভ্রাটে পড়িল। তাঁহাদের একজনকেও চিনে না, কোনও পরিচয় জানে না, কি প্রণালীতে তাঁহাদের অভিবাদন করিবে—ভাবিয়া একটু চিন্তিত হইল,—সে সময়ে তাহার সেই মুখের যে প্রসন্ন-গম্ভীর ভাব, তাহা দেখিয়া তত্রত্য সকলেই যার পর নাই প্রীত হইলেন। বালক মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া, বিনীতভাবে আরও একটু অগ্রসর হইল ও অবনত-মস্তকে কহিল,—"লব আনতমস্তকে আপনাদিগকে যথাযোগ্য প্রণাম করিতেছে"। সকলেই আশীর্ব্বাদ করিলেন। অরুন্ধতী বুঝিলেন যে, এইটিই লব, কুশ এখনও আইসে

নাই। সামাজিকমণ্ডলীও চিনিলেন যে, এই সেই আত্রেয়ী-কথিত সীতাকুমার। কিন্তু জনক কৌশল্যা প্রভৃতির কেহই জানিলেন না যে,—কে লব? কাহার সন্তান? কোন্ রত্নগর্ভা এহেন অনর্ঘ রত্নের জননী? সৌরকুলের চিরহিতৈষিণী গুরুপত্নী অরুন্ধতী আর কালক্ষেপ করিতে পারিলেন না। তিনি—"এস বাবা"—বলিয়া লবকে কোলে করিয়া, মনে মনে কহিলেন,—"আহা, বুক জুড়াইয়া গেল, দীর্ঘ কালের বাসনা এতদিনে পরিপূর্ণ হইল।" শোকজীর্ণ-হৃদয়া কৌশল্যারও বিলম্ব সহিল না। 'এস বৎস! একবার আমার কোলে এস—' বলিয়া লবকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। অরুন্ধতীর জানিয়া আনন্দ, কৌশল্যার না জানিয়াও দেখিয়া আনন্দ। নবদূর্ব্বাদলশ্যাম লবকে কোলে বসাইয়া, মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কৌশল্যা উন্মাদিনীর মত কত কথা কহিলেন। শুনিলে মনে হয়, যেন সে কথা কত অসংবদ্ধ। তাঁহার রামের মত গঠন, রামের মত কণ্ঠস্বর, রামের মত কান্তি। রামকে কোলে করিলে, শরীর জুড়াইয়া যাইত, আজ ইহাকে কোলে করিয়াও কৌশল্যার বুক জুড়াইল। অনেকদিন যে আগুন জ্বলিতেছিল, তাহাতে জল পড়িল। বালকের চিবুক ঈষদুন্নমিত করিয়া বাষ্পপূর্ণলোচনা মহারাণী জনককে কহিলেন—"রাজর্ষিপ্রবর! একবার মিলাইয়া দেখুন, আমার বধূমাতা সীতার মুখচ্ছবি ইহার মুখে ভাসিতেছে, এ কি!"—কৌশল্যার আর ধৈর্য্য থাকিল না, তিনি বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তোমার মা আছেন?

পিতার কথা মনে পড়ে কি ?" লব ধীরভাবে কহিল—'জানি না' এ প্রশ্নে, সরল শিশুর গণ্ডস্থল, বিষাদে যেন ঈষৎ মলিন হইল। কৌশল্যা আবার কহিলেন,—'তবে তুমি কা'র ?'—লব কহিল—'ভগবান বাল্মীকির।' জনক, কৌশল্যা, কঞ্চুকী—এই তিন জন বিনা আর সকলেই আনন্দে আপ্লুত হইলেন। তাঁহারা জানেন যে, কে লব, কা'র লব, কেনই বা বাল্মীকির আশ্রমে অবস্থিতি। কৌশল্যা আবার জিদ্ করিলেন, কহিলেন, "বল বৎস! জিজ্ঞাসার উত্তর দাও"। বালক আবার বলিল, 'যাহা জানি, বলিলাম, আর জানি না।' কি সুন্দর চিত্র! একদিকে সরলতার প্রতিমূর্ত্তি লব, অন্যদিকে নিরবচ্ছিন্ন স্নেহের, অকৃত্রিম প্রেমের অধিদেবতারূপিণী মহাদেবী কৌশল্যা! স্নেহ বলিতেছে 'কে তুমি, একবার পরিচয় দাও, তোমাকে বুকের মধ্যে রাখি।' সারল্য বলিতেছে—'পরিচয় জানি না, আত্মাদর জানি না, প্রলোভন বুঝি না, রাখিতে হয় রাখ, না হয় বিদায় দাও।' বুঝি অমরার তাবৎ অমৃত একত্র সংগ্রহ করিয়া, অথবা শারদচন্দ্রমার স্নিগ্ধ চন্দ্রিকার নির্য্যাস করিয়া, তদ্দ্বারা মহাকবি ভবভূতি, তাঁহার এই সকল অনিন্দ্যসুন্দরী, স্বপ্নময়ী, আবেশময়ী মূর্ত্তির গঠন করিয়াছেন। বুঝি প্রবঞ্চনা-বহুল স্বার্থ-তিমিরাচ্ছন্ন জগতে প্রকৃত স্নেহ, প্রকৃত সরলতা দেখাইবার জন্য, তাঁহার বশবর্ত্তিনী বীণাপাণির অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে এই সকল সমুজ্জ্বল রত্ন সঞ্চয় করিয়াছেন। এই সকল দেখিলে, প্রাতঃস্মরণীয় ভাবুকপ্রবর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুরে বলিতে ইচ্ছা করে—

ধন্য ভবভূতি! ধন্য তোমার কল্পনা! ধন্য তোমার হৃদয়!! প্রলয়ের পূর্ব্বে তোমার বিলয়ের সম্ভাবনা নাই!!!

অষ্টাদশ অধ্যায়।

রহস্য।

স্নেহার্দ্রহৃদয়া কৌশল্যার সহিত লবের যখন পরিচয়-প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে কতকগুলি সৈনিক পুরুষ অদূরে তারস্বরে বলিল—'কুমার চন্দ্রকেতুর আদেশ, কেহ যেন আশ্রমের কোনরূপ উপরোধ করিও না'—অরুন্ধতী, জনক প্রভৃতির অপার আনন্দ জন্মিল। কেননা তাঁহাদের লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু আজ অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বরক্ষার প্রসঙ্গে আসিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন। 'লক্ষ্মণের পুত্রের আদেশ'—এই কথা, কৌশল্যার কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ করিল। লক্ষ্মণ বিশ্ব-বিজয়ী বীর হইলেও, কৌশল্যার নিকটে তিনি বালক, স্নেহের পুতুল; তাঁহার পুত্র আবার 'আদেশ' করিতেছে, রাজার ন্যায় আজ্ঞা প্রচার করিতেছে, জননী কৌশল্যার পক্ষে ইহার চেয়ে সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? এ দিকে সামাজিকগণেরও পরম আহ্লাদ। তাঁহারা জানেন, এ অশ্ব কোন্ অশ্বমেধ যজ্ঞের। আত্রেয়ী-বাসন্তী-সংবাদে তাঁহারা শুনিয়াছেন, সেই প্রজারঞ্জন রাজা সোণার সীতা গড়াইয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞে সহধর্ম্মচারিণী করিয়া-

ছেন। কঠোরতার সহিত কোমলতার সমাধান করিয়াছেন। সোণার সীতার সংবাদে তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, এ যজ্ঞ অযোধ্যা-পতির শুধু সার্ব্বভৌমত্বের পরিজ্ঞাপক নহে, এ অশ্ব শুধু প্রজারঞ্জনতৎপর ভার্য্যানির্ব্বাসক রাজার বিজয়-প্রশস্তি নহে, এ যজ্ঞ এবং এই অশ্ব, সেই নির্দ্দোষ-নির্ব্বাসিতা, দেবদ্বিজ-সন্তুষ্টা, শুদ্ধশীলা জানকীর পাতিব্রত্যের এবং নিষ্কলঙ্কত্বের নিকষ পাষাণ, এ যজ্ঞ এবং এই অশ্ব অযোধ্যাপতির নহে, ইহা সেই সীতাপতি রামচন্দ্রের। সুতরাং এই অশ্বমেধ নামোচ্চারণে সামাজিকগণেরও আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

'চন্দ্রকেতুর আদেশ'—এই কথায় কিন্তু ক্ষাত্রতেজোদৃপ্ত বীরপুত্র লবের মনে একটা কেমন ভাব জন্মিল। কে এ চন্দ্রকেতু? 'আদেশ' করিতেছে ইহার অর্থই বা কি? 'আদেশ' করিতে পারে এমন লোক ত দেখি না—প্রভৃতি নানা আলোচনায় লব একটু বিমনা হইলেন। এ আলোচনার প্রযোজিকা বাঙ্কসী হিংসা নহে, এবংবিধ আলোচনার প্রযোজিকা তেজস্বীর আত্মাভিমানরূপিণী দেবতা। আত্মাভিমান নিন্দনীয় নহে, দুরভিমান নিন্দনীয়; একটিতে মানুষকে সমুন্নত করে, উচ্চাভিলাষ জন্মাইয়া দেয়। অপরটিতে মানবকে দানব করে, তৃণাদপি লঘু করিয়া ফেলে। একটু চিন্তা করিয়াই শৌর্য্যসম্পন্ন লব জনককে জিজ্ঞাসিলেন—'আর্য্য! কে এ চন্দ্রকেতু?' জনক কহিলেন "দশরথাত্মজ রামলক্ষ্মণের নাম শুনিয়াছ?" লব অমনিই সস্মিতবদনে বলিলেন 'ও! সেই রামায়ণকথার প্রধান পুরুষ-

দ্বয় ?'—লবের কথায় জনকের কৌতূহল আরও বাড়িল। তিনিও হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—'তবে বৎস, লক্ষ্মণের পুত্র যে চন্দ্রকেতু, তাহা জান না কেন ?' 'বটে ! তবে ত দেখিতেছি, ইনি উর্ম্মিলার পুত্র এবং মিথিলেশ্বর রাজর্ষি জনকের দৌহিত্র' —বলিয়া লব প্রত্যুত্তর দিলেন। লবের উত্তরে রাজর্ষির বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, এতটুকু বালকের এত অভিজ্ঞতা ! আশ্চর্য্যের বিষয় ! এই প্রসঙ্গে লবের সহিত জনকের কত কথা হইল। তুমি যে রামায়ণের নাম করিলে, তাহাতে সূর্য্যবংশের কতদূর বর্ণিত হইয়াছে, কতদূরই বা রামায়ণের প্রণীত হইয়াছে, কত এখনও অবশিষ্ট,—ইত্যাদি নানাবিষয়ে জনক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। বালক লব সকল কথাব উত্তর দিতে পারিলেন না। তবে এইটুকু বলিলেন যে, সে গ্রন্থের শেষ-ভাগটা আমরা অবগত নহি, কবি আমাদিগকে দেখিতে দেন নাই। শেষ ভাগ নানাবিধ রসের আকর এবং অভিনয়ের যোগা করিয়া, কবি স্বহস্তে লিখিয়াছেন, ও নাট্যসূত্রকার ভরতমুনিকে অভিনয়ের নিমিত্ত অর্পণ করিয়াছেন। শুনিয়াছি, মুনিবর ভরত, অচিরেই অপ্সরাদিগের দ্বারা সেই অংশের অভিনয় করাইবেন। সে অংশে ভগবান্ বাল্মীকির বড়ই আস্থা, বড়ই যত্ন। যখন একজন শিষ্যের দ্বারা রামায়ণের সেই গোপনীয় অংশ ভরতের আশ্রমে প্রেরণ করেন, তখন গুরুদেব, আমার ভ্রাতা কুশকেও ঐ প্রেরিত শিষ্যের রক্ষকরূপে পাঠাইয়াছেন।— এইরূপ নানা কথায় ক্রমে জনক কৌশল্যা প্রভৃতি জানিলেন

যে, লব একক নহেন, তাঁহার এক ভ্রাতাও আছেন, তিনি আবার লবের কয়েক মূহূর্ত্তের বড়। উঁহারা যমজ। জনকের কৌতূহল আরও বাড়িল। তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস! সেই প্রবন্ধের কতদূর তোমরা দেখিয়াছ,"—জনকের কথা শেষ হইতে না হইতেই লব মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "তবে শ্রবণ করুন, অলীক পৌরপ্রবাদে একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রাজা, লক্ষ্মণের দ্বারা, পুণ্যশীলা জনক-তনয়াকে নির্ব্বাসিত করিলেন, আর লক্ষ্মণ সেই আসন্ন-প্রসববেদনা সীতাকে গহনবনে পরিত্যাগ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন,—এই পর্য্যন্ত আমরা দেখিয়াছি।"

লবের কথায় পিতা জনক, দুহিতা জানকীর সেই ভীষণ অবস্থা যেন চক্ষুর উপর দেখিতে পাইলেন, এবং সীতার নাম করিয়া সজলনয়নে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে কৌশল্যাও পুত্রবধূর গহন অরণ্যে প্রসববেদনাকালীন সেই শোচনীয় দশার বিষয় চিন্তা করিয়া, বিলাপ করিতে করিতে একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। লব প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, অপ্রতিভের একশেষ হইলেন, এবং অনুচ্চস্বরে অরুন্ধতীকে ইঁহাদের দুই জনের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। 'ইনি কৌশল্যা আর ইনি জনক'—অরুন্ধতীর মুখে এই কথা শুনিয়া লব নীরবে ও নির্নিমেষ-নেত্রে সেই রামায়ণ-বর্ণিত জনক কৌশল্যার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সম্মান, খেদ, সমবেদনা প্রভৃতি নানা ভাবের তরঙ্গে কুমারের পবিত্র হৃদয় একেবারে ভরিয়া গেল। এমন সময়ে, কঞ্চুকী বাল্মীকির নিকট হইতে

ফিরিয়া আসিলেন। জনক জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, 'কে এ শিশু'.—বাল্মীকি কঞ্চুকীর মুখে বলিয়া দিয়াছেন, 'একটু কাল-প্রতীক্ষা করিতে হইবে, অচিরেই সকল রহস্য প্রকাশ পাইবে।' জনক বাল্মীকির কথায় আরও সন্দিহান হইলেন। শোকের সহিত সংশয় মিশিয়া তাঁহার বেদনাকাতর চিত্তের কাতরতা আরও বাড়াইয়া দিল। ইতিমধ্যে কতকগুলি ঋষিবালক আসিয়া এক অদ্ভুত পশুর বর্ণন করিল। সেরূপ পশু তাহারা আর কখন দেখে নাই, বড়ই বিচিত্র প্রাণী। তাহারা দেখিল, আর তাহাদের লব দেখিল না, তাই লবকে তাহারা ডাকিয়া লইয়া গেল। লবের তিরোধানে তত্রস্থ সকলেই একান্ত বিমর্ষ হইলেন। ব্যাপার কি, বাল্মীকিই বা বালকের পরিচয় গোপন করিলেন কেন? 'অচিরেই সকল রহস্য প্রকাশ পাইবে'—ইহারই বা তাৎপর্য্য কি?—ইত্যাদি নানা চিন্তায় জনক একান্ত আকুল হইয়া উঠিলেন। এবং অবিলম্বেই অরুন্ধতী, কৌশল্যা, কঞ্চুকী প্রভৃতির সমভিব্যাহারে, রহস্য বিদিত হইবার মানসে, বাল্মীকির আশ্রমে প্রস্থান করিলেন।

সামাজিকমণ্ডলীও কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। পূর্ব্বাপর সমস্তই তাঁহাদের গোলমাল হইয়া গেল। কিসের অভিনয়? কেন অভিনয়? কি বৃত্তান্ত?—কিছুই তাঁহারা ধারণা করিতে পারিলেন না। কেবল এইটুকু বুঝিলেন যে, জনক যখন স্বয়ং গিয়াছেন, তখন অচিরেই সমস্ত রহস্য উদঘাটিত হইবে। সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিলেন যে, মহর্ষি বাল্মীকি যে

অভিনয়ের উপদেষ্টা এবং ভরত যে অভিনয়ের প্রযোক্তা, তাহা অলীক অথবা মাত্র আপাতরম্য নহে, তাদৃশ অভিনয়ের চরম ফল অতি সুস্বাদু হইবারই কথা। তাই তাঁহারা স প্রত্যাশ-হৃদয়ে কালের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই নেপথ্যে কে যেন বীরদর্প করিল,—বীরাত্মজ লবের তাহা শেলের ন্যায় বুকে বিঁধিল। লব সেই পরোক্ষদর্পীকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করিলেন। দেখিতে দেখিতে এক প্রলয় উপস্থিত হইল। অবশেষে যজ্ঞের অশ্বরক্ষক চন্দ্রকেতুর সেনাগণের সহিত লবের পারিষদবর্গের বিষম যুদ্ধ বাধিল। চন্দ্রকেতুর যজ্ঞতুরঙ্গ, ঋষিকুমারবৃন্দ, এক অদ্ভুদপ্রাণিবোধে অবরুদ্ধ করিয়াছিল, তাই এই যুদ্ধ। সেনাগণ স-শস্ত্র, আর ঋষিবালকদিগের আয়ুধ লোষ্ট্র। সিংহশাবককল্প অমিততেজা লব আর থাকিতে পারিলেন না, প্রতিপক্ষীয় সৈনিকদিগের বিজয়পতাকা অব্যর্থ শরনিক্ষেপে ভূতলসাৎ করিয়া, স্বয়ং সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। কোথায় মধুর রামায়ণের অভিনয়, আর কোথায় বিশ্ববিকম্পী যুদ্ধ! শর-তের নির্ম্মল গগনে যেন দেখিতে দেখিতে, প্রলয়দ্যোতক দুর্দ্দর্শ অগ্নিবর্ণ আবর্ত্তকের আবির্ভাব! সকলেই চমকিয়া উঠিলেন। সামাজিকদিগকে, যে কবি, এইরূপ ইচ্ছামত পথে,—কখন সুখে, কখন দুঃখে, কখন হর্ষে, পরক্ষণেই আবার বিষাদের সূচিভেদ্য অন্ধকারে নিমজ্জিত করিতে পারেন, রস হইতে রসান্তরে লইয়া যাইতে পারেন, সামাজিকের স্বাধীন চিত্ত আপনার অধীন করিতে পারেন, তাঁহার ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা

সর্ব্ববাদিসম্মত। সামাজিকদিগের চিত্তের উপর এই প্রকার আধিপত্য-বিস্তারে, অনার্য কবিকুলের মধ্যে, কালিদাসের পর শ্রীকণ্ঠ ভবভূতিরই নিপুণতা উপলব্ধ হয়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

রণক্রীড়া।

উভয়পক্ষে প্রবল যুদ্ধ হইয়াছে। ঋষিবালকগণের কোনরূপ অত্যাহিত ঘটে নাই, কিন্তু চন্দ্রকেতুর সেনাগণের বিড়ম্বনার একশেষ হইয়াছে। চন্দ্রকেতুর রথে সুমন্ত্র সারথি ছিলেন, তিনি মহারাজ দশরথের বয়স্যস্থানীয়, সুতরাং কুমার চন্দ্রকেতুর পরম সম্মাননীয়। আর সুমন্ত্রেরও কুমার প্রাণাধিক প্রিয়তর। লবকুশের অব্যর্থ শরসন্ধানে কোমলকায় লক্ষ্মণাত্মজের সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, শোণিতস্রাবে দেহ প্লাবিত হইতেছে, ইহাতে সুমন্ত্রের যদিও দুঃখের পরিসীমা নাই, কিন্তু সে দিনের লক্ষ্মণ, তাহার পুত্র চন্দ্রকেতু যে এমন রণদক্ষ শূরের ন্যায় সুকৌশলে যুদ্ধ করিতে পারিয়াছে, বীরবংশের বীরব্রতে দীক্ষিত হইয়াছে, অদ্ভুত রণ-পাণ্ডিত্য শিখিয়াছে, তজ্জন্য, হিতৈষী সারথির আনন্দও অপরিসীম। লব এবং চন্দ্রকেতু—উভয়ের বীরত্বে গুণজ্ঞ সুমন্ত্র মুগ্ধ

হইয়াছেন। তাই তিনি চন্দ্রকেতুকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—

জাতস্য তে পিতুরপীন্দ্রজিতো বিজেতুঃ
বৎসস্য বৎস! কতি নাম দিনান্যমূনি?
তস্যাপাপত্যমনুগচ্ছতি বীরবৃত্তং
দিষ্ট্যা গতং দশরথস্য কুলং প্রতিষ্ঠাং॥১

উদারহৃদয় চন্দ্রকেতুও অমনি বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তিরূপে খিন্ন হৃদয়ে বলিলেন—

অপ্রতিষ্ঠে রঘুজ্যেষ্ঠে কা প্রতিষ্ঠা কুলস্য নঃ?

'রঘুকুলশ্রেষ্ঠ স্বয়ং যখন নিঃসন্তান, আর্য্য! তখন আমাদের বংশের প্রতিষ্ঠা কোথায়?—'কি সুন্দর ভাব! বালক চন্দ্রকেতুর এই কথায় অতিবড় প্রবীণেরও হৃদয় দ্রবীভূত হয়। মাধুর্য্যের সহিত গাম্ভীর্য্যের এমন সম্মিলন বড়ই প্রীতিপ্রদ। চন্দ্রকেতুর ঐ সখেদবচনে সুমন্ত্র অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। যুদ্ধকালে, যখন লব আকর্ণ শিঞ্জিনী-কর্ষণ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী চন্দ্রকেতুর শৌর্য্যদৃপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া বাণক্ষেপ করিতেছিলেন, তখন লবের সেই নীলকমলবৎ বদনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সুমন্ত্র কত-কি ভাবিয়াছিলেন! লবের তখনকার মূর্ত্তি, তখনকার দেহভঙ্গি দেখিতে দেখিতে, সারথির নয়নে সমর

১—উত্তর-চরিত—ইন্দ্রজিতের নিধনকর্ত্তা হইলেও লক্ষ্মণ সে দিনকার শিশু, তা'র পুত্র আবার মহাবীর হইয়াছে! কি আনন্দ! দশরথের বংশ এতদিনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল!!

প্রিয় বালক রামচন্দ্রের মূর্ত্তি ছায়ার ন্যায় ভাসিতেছিল। সেই চোক, সেই মুখ, সেই স্বর, সেই ভঙ্গি, সব মিলিতেছিল। সুমন্ত্র দেখিতেছিলেন, স্নেহপূর্ণ-হৃদয়ে সেই ননীর পুতুলের রণক্রীড়া দেখিয়া মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িতেছিলেন। যদি জানকী অন্ততঃ বাঁচিয়াও থাকিতেন, তাহা হইলেও, সুমন্ত্রের অনুমান কতকটা সত্য হইতে পারিত। কিন্তু সীতা ত নাই! অনেক দিন হইল, সে লতিকার মূল পর্য্যন্ত ছিন্ন হইয়াছে, তবে আর তাহার প্রসূনের আশা কেন?—ভাবিতে ভাবিতে প্রেমিক সুমন্ত্র অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন। যুদ্ধ কিয়ৎকালের জন্য স্থগিত হইয়াছে, পরিশ্রান্ত সিংহশিশুদ্বয় যেন ক্ষণেকের জন্য বিশ্রাম করিতেছে, অথবা নবীন উদ্যমে যুঝিবার নিমিত্ত বদ্ধ-পরিকর হইতেছে। এই অবসরে, প্রেমিক সুমন্ত্রের লোলুপ নয়ন আবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাইয়া লবের উপর পড়িয়াছে। সারথির বাসনা যে, লবের সহিত একটু অলাপ করেন। বাসনা অপূর্ণ রহিল না। লব সন্নিহিত হইলে, সুমন্ত্র কত কথা কহিলেন! লবের নিকট কত প্রশ্ন করিলেন। কথায় কথায় সুমন্ত্র যখন বলিলেন, "বৎস! তোমার ন্যায় শৌর্য্যাসমলঙ্কৃত বালককে যদি ইক্ষ্বাকু-কুল-কেশরী রামভদ্র একবার দেখিতেন, তবে না জানি তাঁহার কতই আনন্দ হইত!"—তখন সরল লব অমনি কহিলেন,—'আর্য্য, শুনিয়াছি, সে রাজর্ষি নাকি সৌজন্যের সাগর,'—বলিতে বলিতে লজ্জায় কুমারের মুখ ঈষৎ আনত হইল। অমন

রামের যজ্ঞীয় অশ্বের অবরোধ করা সঙ্গত হয় নাই—ভাবিয়া, লব ক্রটি-স্বীকার-মানসে আবার কহিলেন—'আমাদের অশ্ব-অবরোধের বাসনা আদৌ ছিল না; সেই ইক্ষ্বাকু কুলোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের গুণে কে বিমুগ্ধ নহে? কে তাঁহাকে সম্মান না করে? কিন্তু গর্ব্বিত তুরঙ্গরক্ষিগণের অবজ্ঞাসূচিকা, ওজস্বিনী বচনপরম্পরা, আমার কর্ণে যেন অনলতপ্ত সীসক-স্রাব করিতেছিল। অবশ্য রামচন্দ্রের বীরত্ব-শ্লাঘায় আমাদের কোনরূপ অসূয়ার কারণ নাই, শুনিয়াছি, তাঁহার ন্যায় নিরহঙ্কার মহানুভাব অতি বিরল, তিনি নিজেও কখন কোনরূপ দর্প করেনই না, তদীয় প্রজাপুঞ্জের মধ্যেও কেহ কখন বৃথা দর্প করিতে জানে না, এরূপ স্থলে, তাদৃশ রামচন্দ্রের পরিচারক-বৃন্দ কেন বৃথা অহঙ্কার করিয়া, নির্ম্মল রাম-নামে কলঙ্কলেপন করে? ঋষিগণ বলেন যে, উন্মত্ত অর্থাৎ সদসদ্‌বিবেক-বিমূঢ় এবং গর্ব্বিত,—এই দুইয়ের বাক্য অকল্যাণের নিদান, সর্ব্ববিধ শত্রুতার কারণ, এবং জগতের পরম অশান্তির উৎপাদক। রামচন্দ্রের প্রতাপ-গাথায় আমরা বিরক্ত নহি, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, রাম একজন মহাবল বীর হইতে পারেন, তা' বলিয়া কি এই বিশাল পৃথিবীতে আর বীর থাকিতে নাই? বীরধর্ম্ম কি কোনও নির্দ্দিষ্ট পাত্রেই নিহিত? পৃথিবীতে যদি আর কোনও ক্ষত্রিয় জীবিত না থাকিত, তবে রামানুচরবর্গের এ সকল দৃপ্তবচনে আমার তত বলিবার ছিল না, কিন্তু পৃথিবী ত এখনও নিঃক্ষত্রিয় হয়েন নাই, রাম ব্যতীত

এখনও অনেক ক্ষত্রিয় ধরাতলে বিদ্যমান আছেন, ইহা বিবেচনা করিয়া গর্ব্ব করিলেই ভাল হইত।"

রামের প্রতি এইরূপ কটাক্ষ করায়, সুমন্ত্র একটু বিরক্ত হইলেন, এবং কহিলেন, "লব, বিরত হও, কোন বিষয়েই অতিপ্রসঙ্গ প্রশংসনীয় নহে। চন্দ্রকেতুর কতিপয় সৈন্যের ঔদ্ধত্য নিবারণ করিয়া তুমি একটু আত্মবিস্মৃত হইয়াছ, দেখিতেছি। নতুবা জামদগ্ন্যের যিনি দমনকর্ত্তা, তাঁহার প্রতি এই প্রকার শ্লেষ কদাচ করিতে না।"—সুমন্ত্রের বাক্য সমাপ্তির পূর্ব্বেই লব বাধা দিয়া কহিলেন,—'সে কথা ঠিক, ব্রাহ্মণের বীরত্ব বাক্যে, বাহুতে নহে, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। জামদগ্ন্য ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়-গ্রাহ্য শস্ত্র ধারণ করিতেন, তাঁহাকে জয় করায় রামের যে পৌরুষ কতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।' লবের কথায় চন্দ্রকেতু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। দুই শিশুতে অনেক বাগ্‌-বিতণ্ডা হইল, পরিশেষে আবার তুমুল যুদ্ধ বাধিল। কুমার-দ্বয়ের অত্যদ্ভুত রণপাণ্ডিত্যে বিমানচারী বিদ্যাধরবৃন্দ পর্য্যন্ত চমৎকৃত হইলেন। লব এবং চন্দ্রকেতু উভয়েই উভয়ের রণকৌশলে পরম আপ্যায়িত এবং বিস্মিত। উপযুক্ত প্রতি-দ্বন্দ্বি-লাভে উভয়েরই অপরিসীম আনন্দ। সস্মিত-বদনে চন্দ্র-কেতু কখন আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছেন, আর অমনি লবের প্রযুক্ত বারুণাস্ত্রের সহস্রধারায় সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতেছে। কুমারদ্বয়ের রণ-কৌতূহল ক্রমেই বাড়িতেছে।

সারথি সুমন্ত্র আলেখ্যলিখিতের ন্যায়, কুমার-যুগলের এই রণক্রীড়া দেখিতেছেন। বিদ্যাধরমিথুনেরা দলে দলে আসিয়া, আকাশে, রণভূমির উপরিদেশে শ্রেণিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাদের দিব্য দেহজ্যোতিতে শূন্যতল উদ্ভাসিত হইতেছে, ঝলমল ঝলমল করিতেছে। আকাশ যেন আজ কেবল-প্রভায় বিরচিত চন্দ্রাতপ পরিয়াছে। প্রবীণ সুমন্ত্র অনেক যুদ্ধে সারথ্য করিয়াছেন, অনেক স্থলে যক্ষ-রক্ষো-গন্ধর্ব্বের সমবায় দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু এমন শোভা, এত সৌষ্ঠব জীবনে আর কখনও দেখেন নাই।

কুমার-যুগল যখন যুদ্ধে এইরূপে অভিনিবিষ্ট, সেই সময়ে, দূরে আকাশে, একখানি পুষ্পকরথের ন্যায় কি একটি পদার্থ দেখা গেল। উভয় পক্ষের সৈনিকগণ ঊর্দ্ধনেত্রে সেই দিকে চাহিল, তাহাদের বিস্ময়ের সীমা নাই। পুষ্পক ক্রমেই অবতরণ করিতেছে। বিদ্যাধরবৃন্দ এদিকে ওদিকে একটু সরিয়া গেলেন। পুষ্পক রণভূমির ঠিক উপরিভাগে আসিয়া, শূন্যমার্গে বায়ুভরে ধীরে ধীরে দুলিতে লাগিল। পুষ্পকের সমুজ্জ্বল প্রভায় সকলের চোক ঝলসিয়া গেল। বিদ্যাধরবৃন্দও ক্ষণকালের জন্য যেন নিষ্প্রভ হইলেন। দেবতাগণ, যেন নন্দনের রাশীকৃত কুসুমস্তবক, বিচিত্রবীর্য্য কুমার-যুগলকে উপহাররূপে পাঠাইয়াছেন, রণোন্মত্ত বীরশিশুদ্বয়ের মস্তকের উপরিভাগে সে কুসুম-গুচ্ছ ঐ উপনীত, অচিরেই অজস্রধারে উহার বৃষ্টি হইবে। পুষ্পক যখন এইভাবে ঈষৎ হেলিয়া দুলিয়া তত্রত্য জন-

গণের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে, তাহার মধ্য হইতে গম্ভীর কণ্ঠে কে যেন কহিলেন,—'স্থির হও।' নবজলসম্ভৃত জলদগর্জ্জনবৎ সেই স্নিগ্ধ এবং গম্ভীর নির্ঘোষে নিমেষের জন্য সকলেই চমকিয়া উঠিলেন। 'এ মেঘমন্দ্র-ধ্বনি কার কণ্ঠের, কে সে মহাপুরুষ?'—দেখিবার জন্য সকলেই উন্নতমস্তকে পুষ্পকের অভ্যন্তর প্রদেশে দৃষ্টিযোজনা করিলেন। 'স্থির হও' শব্দে পুষ্পক স্থির হইল, রণভূমির মাত্র কতিপয় অঙ্গুলি উর্দ্ধে আসিয়া দাঁড়াইল, ভূমিস্পর্শ করিল না। পুষ্পকের সে কম্পন নিমেষের মধ্যে কোথায় লুকাইল। সকলেরই মনে হইল, যেন আকাশ-গাত্রে, কোন অলোক-সামান্য চিত্রকর আসিয়া একখানি বিশ্ববিমোহন চিত্র অঙ্কিত করিয়া গেল! এদিকে 'স্থির হও' শব্দে বিনয়ের প্রতি-মূর্ত্তিরূপী বীরশিশু লব এবং চন্দ্রকেতুও বাণক্ষেপে বিরত হইলেন। চন্দ্রকেতু বুঝিয়াছিলেন যে, এ কা'র কণ্ঠস্বর, তাই তিনি তৎক্ষণাৎ শরাসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। লবও 'ইনি কোন মহাপুরুষ হইবেন'—ভাবিয়া শান্তভাব অবলম্বন করিলেন। কুমার-দ্বয় যতই বীর্য্যসম্পন্ন বা রণপণ্ডিত হউন না কেন, সম্মানভাজনের নিকটে বিনয় প্রকাশে তাঁহারা চিরাভ্যস্ত। চরিত্রের সে সৌকুমার্য্যে তাঁহারা অলঙ্কৃত। মহাপুরুষের সমক্ষে বনের শার্দ্দূল পর্য্যন্ত অবনত হয়, শার্দ্দূল-শিশুকল্প লবও অবনত হইলেন। লব বিস্মিতনেত্রে একবার নতশির চন্দ্রকেতুর দিকে, একবার পুষ্পকমধ্যস্থিত, নীলজলধি-

হৃদয়বৎ প্রশান্ত, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম মহাপুরুষের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

বিংশ অধ্যায়।

অপরিচিত।

প্রণত চন্দ্রকেতু মস্তক উত্তোলন করিবার পূর্ব্বেই পুষ্পকের অভ্যন্তরস্থিত সেই শ্যামলকায় মহাত্মা অবতরণ করিয়া, 'সৌর-কুলের অলঙ্কার, এস', বলিয়া চন্দ্রকেতুকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। লব আরও বিস্মিত হইলেন। ব্যাপার কি, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি চিত্রপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। চন্দ্রকেতু যখন কহিলেন, "তাত! আমাকে যে ভাবে দেখেন, সেই ভাবে,—সেইরূপ স্নেহের চক্ষে, আমার প্রাণ-প্রিয় বন্ধু, বীর লবকেও দেখিবেন"—এবং অঙ্গুলি-সঙ্কেতে লবকে দেখাইলেন, তখন লব যথার্থই একেবারে অবাক্ হইলেনও মনে মনে ভাবিলেন যে, চন্দ্রকেতুকে ত পূর্ব্বেই চিনিয়াছি, কিন্তু চন্দ্রকেতু যাঁহাকে 'তাত' সম্বোধন করিলেন, ইনি আবার কে?—এমন গম্ভীর আকৃতির পুরুষ ত আর দেখি নাই। কে এ মহাপুরুষ? ইঁহার আকারে অভয় এবং বাৎসল্য যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে, ইঁহাকে দেখা অবধি, আমার প্রাণ ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হইয়াছে। সাক্ষাৎ ধর্ম্মই কি আজ এই মহা-

পুরুষের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উপনীত হইলেন ? এরূপ ত আর কখনও দেখি নাই, ইঁহার আগমন মাত্রেই মনের বিদ্বেষ, রণ-স্পৃহা লোপ পাইয়াছে, কেমন একটা প্রীতির উৎসে হৃদয়-কন্দর ভরিয়া গিয়াছে, চরিত্রের ঔদ্ধত্য সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রমেই মনে লইতেছে যে, ইঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে বুঝি নিঃশ্বাসটিও ছাড়া গর্হিত। তীর্থস্থলে উপনীত হইলে প্রাণের যে অবস্থা ঘটে, ইঁহার দর্শনে আমারও সেই দুর্লভ অবস্থা ঘটিয়াছে, মনঃপ্রাণ এক-পদে নির্বৃতিরসে অভিষিক্ত হইতেছে। চন্দ্রকেতু ভাগ্যবান্, তাই এমন মহাপুরুষের অঙ্গস্পর্শ করিতে পাইল, 'তাত' সম্বোধন করিয়া কণ্ঠের সার্থকতা করিল। এরূপ সৌভাগ্য সকলের ঘটে না। লব ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারেন নাই যে, ইনিই সেই রামায়ণের মহাপুরুষ রাম, ইনিই সেই লঙ্কাধিপতি দশাননের বধকর্ত্তা রাম। লব যখন ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে লক্ষ্যহীন-নয়নে রামের দিকে চাহিয়া ছিলেন, তখন রামও লবকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিতেছিলেন যে, কে এ বালক? এ ত কেবল চন্দ্রকেতুর প্রাণ-প্রিয় নহে, আমার প্রাণও ত এ শিশু হরণ করিল, দেখিতেছি। যে জ্বালা দিবানিশি হৃদয়ে চিতানলের ন্যায় জ্বলিতেছে, ইহার মুখদর্শনে, তাহারও ক্ষণেক বিরতি হইয়াছে। সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়া যে আগুনে নিয়ত দগ্ধীভূত হইতেছি, ইহার অবলোকনে সে আগুনে যেন নিমেষের জন্য জল পড়িল। হৃদয় স্নেহে ভরিয়া গিয়াছে। কে এ শিশু ? আর ত কখনও ইহাকে দেখি নাই, তবুও কেন ইহার

দর্শনে প্রাণ উন্মত্ত হইল। যাহাকে চিনি না, কখনও দেখি নাই, হয়ত বা আর দেখিবও না, তাহার জন্য এমন উন্মাদ, এত উৎকণ্ঠা? শুনিয়াছি স্নেহ নিমিত্তাপেক্ষী, পদার্থের প্রকৃত পরিচয় ব্যতিরেকে স্নেহের উদ্রেক হয় না, এখন দেখিতেছি, সে বিষম ভ্রমের কথা। হৃদয়ের কি একটা অপরিজ্ঞেয় সম্বন্ধ অতি অপরিচিতকেও স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ করে, পরকে আপন করিয়া দেয়। লৌকিক সম্বন্ধ বা লৌকিক পরিচয়ই প্রীতির কারণ নহে, আরও কিছু আছে, যাহা মানুষ বুঝিতে পারে না; প্রাক্তন সংস্কারের ন্যায়, মানুষের মনের মধ্যে যে মন, তাহার মধ্যে সে লাগিয়া থাকে, বাহিরে আসিতে চায় না। নতুবা কোথায়, কতদূরে সূর্য্য, আর কোথায় পদ্মিনী, কোথায়—চন্দ্র, আর কোথায়ই বা চন্দ্রকান্তমণি?—কে বলিতে পারে যে, ইহাদের মধ্যে কি সম্বন্ধ, কে কাহার নিকট কি ভাবে পরিচিত?”—

মহাকবি ভবভূতি, রামের মুখ দিয়া, তাঁহার নিজের কবিত্ব-পূর্ণ হৃদয়ের অনেক কথা প্রকাশ করিয়া দিলেন। উষার মৃতসঞ্জীবন করস্পর্শে কেন ধরণী পুলকিত হয়, সাগর-গামিনী উন্মাদিনী তটিনীর কুলকুল-গীতিকায়, নিশীথে কেন পর্য্যটকের প্রাণ আকুল হয়, নয়ন মুক্তাবর্ষণ করে, গ্রীষ্মের দিবাবসানে শ্রমক্লান্ত পথিক, প্রান্তর সমীরে আত্মহারা হইয়া, কেন বৃক্ষমূলে বসিয়া সংসারের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়, ভ্রমণপ্রিয় মানব কেন নীলাম্বুরাশির বেলাভূমিতে উপবেশনপূর্ব্বক, আকুল-

প্রাণে তরঙ্গ-সঙ্ঘাত দর্শন করে, আর কেনই বা মৃগয়ুর বংশীরবে আত্মবিস্মৃত হইয়া, হরিণী চিত্রিতার ন্যায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাণবিদ্ধ হয়,—এ সমস্যার সমাধান মহাকবি, রামের মুখ দিয়া অনেকটা করিয়া দিলেন। শরতের মধুর প্রভাতে—যখন দিগ্‌বালিকাগণ কুজ্‌ঝটিকারূপী শুভ্রবসন পরিধান করিয়া, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে শাকসবজির ডালা সাজাইয়া বসিয়া থাকে, যখন শিশির-স্নাত তরুলতারাজি যেন কার প্রেমে বিহ্বল হইয়া ঝর্‌ঝর্ অশ্রুবর্ষণ করে, তখন কেন দর্শক আপনার ভাবে আপনিই বিভোর হইয়া, মনে মনে উন্মত্তের ন্যায়, কত কত কি ভাবেন, কখনও বা ভাবনা-শূন্য-হৃদয়ে ও লক্ষ্যহীন-নয়নে প্রকৃতির এই লীলা-মাধুরী দর্শন করিতে করিতে পুত্রকলত্র, বন্ধুবান্ধব, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কেন ভুলিয়া যান?—কেন তাঁহার বক্ষঃস্থল অজ্ঞাত নয়নাসারে প্লাবিত হয়?—কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীকণ্ঠ, তাঁহার পরমপ্রিয় রামচন্দ্রের দ্বারা সে প্রশ্নেরও কতকটা মীমাংসা করিলেন। আর সেই সঙ্গে, মহাকবি, তদীয় আদর্শ কালিদাসের কবিতারও একটু অঙ্গরাগ করিলেন।

দুষ্মন্ত মারীচাশ্রমে, আত্মজ সর্ব্বদমনকে চিনিতে না পারিয়া, 'কোন্ ভাগ্যবান্ এমন সুন্দর শিশুর পিতা,—ইহাকে যে কোলে করিতে পায়, তাহার জীবন সার্থক, সে ধন্য, হায়, অপুত্রক আমি, আমার ন্যায় অধন্য দ্বিতীয় নাই'—প্রভৃতি কতপ্রকার পরিদেবনা করিয়াছিলেন। সে বড় সুন্দর ভাব। পৌরবশ্রেষ্ঠ দুষ্মন্ত, আত্ম-চ্ছায়াসদৃশী ঋষি-দুহিতা শকুন্তলাকে গর্ভাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া-

ছিলেন,—দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতের মোহে বিমূঢ় হইয়া অতি অবৈধ কার্য্য করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাকে করিতে হইল. নিজের পুত্র সর্ব্বদমনকে চিনিতে পারিলেন না। 'কাহার পুত্র' ভাবিয়া কোলে লইতে সাহসী হইলেন না। যদিও বা একবার "এস বৎস" বলিয়া ধরিতে গিয়াছিলেন, শিশু সর্ব্বদমন অমনি সরিয়া গেল,—দুষ্মন্তকে পিতা বলিয়া স্বীকারই করিল না। কি সুন্দর চিত্র! মহাকবি ভবভূতি অগ্রসর হইয়া এই ভাবটি কুড়াইয়া লইলেন, এবং এই ভাবেরই ফলকে, ইহার চেয়েও সুন্দরতর ছবি আঁকিয়া দিলেন।

সর্ব্বদমন তিন চারি বৎসরের শিশু, দুগ্ধপোষ্য বালক। তাহাকে দুষ্মন্ত চিনিলেন না বা দুষ্মন্তকে সে পিতা বলিয়া স্বীকার করিল না, ইহাতে প্রকৃত পিতার তত ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। দুধের বালকের কথায় আসে যায় কি? কিন্তু যে বালকের বাণের আঘাতে, চন্দ্রকেতু ও তদীয় সেনাগণ 'চিত্রার্পিতারম্ভ,' অজ্ঞান, যে বালকের বীরদর্পে ক্ষত্রিয় নরপতির গৌরবকেতন অশ্বমেধ পণ্ডপ্রায়, 'কিং অক্ষত্রিয়া পৃথ্বী' 'কিং ব্যবস্থিত-বিষয়াঃ ক্ষাত্রধর্ম্মাঃ' বলিয়া যে বালক সিংহবিক্রমে অশ্বমেধের অশ্ব-বন্ধন করিয়াছে, জয়-ঘোষিকা বিজয়-পতাকা ভূতলসাৎ করিয়াছে, সেই বালককে তাহার পিতা রাম চিনিতে না পারিয়া বলিতে-ছেন—"এ কে? কা'র পুত্র? একি—

'ত্রাতুং লোকানিব পরিণতঃ কায়বানস্ত্রবেদঃ?'

না————'সামর্থ্যানামিব সমুদয়ঃ সঞ্চয়ো বা গুণানাং?'

অথবা একি—'ক্ষাত্রোধর্ম্মঃ শ্রিত ইব তনুং ব্রহ্মকোষস্যগুপ্ত্যৈ ?'
না———'আবির্ভূয় স্থিত ইব জগৎ-পুণ্য-নির্ম্মাণ-রাশিঃ ?'[১]
ইহাকে দেখিয়া, আমার যে অবিরাম দুঃখ, তাহারও আজ একটু বিরাম হইতেছে! কেন এমন হয়? কোনই ত কারণ দেখি না? আহা! এ'র দিকে চাহিলেও আনন্দ!"—এই ভাবে রাম একা একা অনুচ্চকণ্ঠে কত-কি বলিতেছেন।

যে দিন হইতে তাঁহার জীবনের শান্তিপ্রতিমা সংসারের লক্ষ্মী, সীতাকে বনে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, সেই দিন, সেই অশুভ মুহূর্ত্ত হইতেই ত রামের সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে! তাই আজ অনেক দিন—অনেক বৎসর পরে, ক্ষণকালের জন্য, একটু অপরিচিত, বহুকাল-বিস্মৃত সুখের সাক্ষাৎ পাইয়াই, রাম কত-কি ভাবিতেছেন! 'চন্দ্রকেতু! কে এই মহাপুরুষ?'—লবের এই প্রশ্নে যখন চন্দ্রকেতু সসম্ভ্রমে কহিলেন—'প্রিয় বয়স্য! ননু তাতপাদাঃ;' তখন লব রামের এই পরিচয় শুনিয়াই অমনি 'তোমার ত চারিজন তাত, রামায়ণে এইরূপ উল্লেখ আছে, ইনি তাঁহাদের মধ্যে কোন জন,'—জিজ্ঞাসা করিলেন। চন্দ্রকেতু বলিলেন 'জ্যেষ্ঠতাত।' অমনি লব পরম উল্লাসের সহিত কহিলেন,—'কি বলিলে? রঘুনাথ? আজ সুপ্রভাত, দেবতাদর্শন

১—উত্তর-চরিত, ৬ষ্ঠ অঙ্ক :—লোকরক্ষার জন্যই কি অস্ত্রবেদ শরীর পরিগ্রহ-পূর্ব্বক এই বালকরূপে উপনীত হইয়াছে? না, পৃথিবীর তাবৎ বল, বীর্য্য, এবং গুণের সমষ্টিরূপে ঐ শিশু উপস্থিত? অথবা বেদ-বিদ্যার রক্ষার নিমিত্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম্মই কি জগতের পুণ্যরাশির ন্যায়, ঐ আবির্ভূত? কিছুইত বুঝিতেছি না!

করিলাম'—কহিয়াই সীতাকুমার ভক্তিনম্রহৃদয়ে ও উদাসীনভাবে, বিনয়, বিস্ময় এবং কৌতুকের সহিত রামের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বাল্মীকির আশ্রমে, রামায়ণে, যে রামের অশেষ কীর্ত্তিবিবরণ, কুমার এতদিন অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছেন, এই সেই রাম, এই সেই রামায়ণের নায়ক রাম, ভাবিয়া, পরম কৌতূহল-সহকারে কুমার রামকে দেখিতে লাগিলেন। অনেক-ক্ষণ অনিমেষলোচনে দেখিয়া শেষে লব ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। কুমারের অসংস্কৃত কেশকলাপ তদীয় তেজ-স্বান্ বদনের উপর পতিত হইয়া রামের মনে মেঘাবৃত শশাঙ্কের ছবি জাগাইয়া দিল। তখন অমনি, স্নেহের নির্ঝর রাম 'অত কেন? এস, এস,'—বলিয়া লবকে কোলে টানিয়া লইলেন। পরিচয় অপরিচয়, সম্বন্ধ অসম্বন্ধ, সব ভুলিয়া বলিলেন 'বৎস! অনেকবার গাঢ়ভাবে আমাকে আলিঙ্গন কর ত!'—কি সুন্দর চিত্র! রাম জানেন না, কাহাকে কোলে লইলেন, লবও জানেন না যে, কাহার—কোন্ মহাপুরুষের কোলে উঠিলেন! এমনই সময়ে, দূর হইতে যেন কা'র কণ্ঠস্বর রামের কর্ণগোচর হইল,—না—না, 'কাণের ভিতর দিয়া' সে স্বর রামের 'মরমে পশিল,' তাহাতে রামের প্রাণ আকুল করিল। রাম চমকিয়া উঠিলেন। সেই অবিজ্ঞাত ও অশ্রুতপূর্ব্ব স্বরে, রামের দেহ, বর্ষার সহস্র-কুসুম-বিমণ্ডিত কদম্বতরুর ন্যায় রোমাঞ্চিত হইল। ক্রমে সেই, নিশীথ সময়ে বহুদূরাগত পিককূজনবৎ স্বরে, রামের মন, প্রাণ, দেহ, সব যেন ভরিয়া

গেল। তিনি এক মহান্ আনন্দ-বিভ্রমে পড়িয়া গেলেন। যাহার স্বরে রাম অত উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, ক্রমে সে নিকটে আসিল, রাম দেখিলেন। লবকে কোলে করিয়া রাম একবার আস্বাদ পাইয়াছেন, সুতরাং এবার লোভ সংবরণ করা দায়, তিনি ঐ অচিরাগত বালককেও কোলে লইলেন। পূর্ব্বে লবকে কোলে লওয়ায়, রামের অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে যে আশার সুখতারা মিটিমিটি জ্বলিতেছিল, এই বালককে পাইয়া, তাহা সহসা ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার, হৃদয়ে নৈরাশ্যের কালো মেঘ দেখা দিল, সব ঢাকিয়া ফেলিল! মন আবার আঁধারে ভরিয়া গেল!!

পরক্ষণেই রাম আবার আনন্দে, অধৈর্য্যে, সংশয়ে, নির্ণয়ে যেন কেমন হইয়া পড়িলেন! মনে হইল—

'কিমপত্যময়ং দারকঃ?—

"অঙ্গাদঙ্গাৎ সৃত ইব নিজো দেহজঃ স্নেহ-সারঃ,
প্রাদুর্ভূয় স্থিত ইব বহিশ্চেতনা-ধাতুরেব,
সান্দ্রানন্দ-ক্ষুভিতহৃদয়-প্রস্রবেণেব সৃষ্টো
গাত্রং শ্লেষে যদমৃত-রস-স্রোতসা সিঞ্চতীব!!"[১]—

১—উত্তর-চরিত, ৬ষ্ঠ অঙ্ক:—একি আমার অপত্য, না আমার প্রতি অঙ্গ হইতে স্নেহ-সার পরিস্রুত হইয়া এই বালকদ্বয়কে সৃষ্টি করিয়াছে, অথবা যে পদার্থে মানুষ চেতন থাকে, আমার দেহের সেই পদার্থ এই বালকরূপে বাহিরে আসিয়াছে, তাই আমি ক্রমে যেন জ্ঞানশূন্য হইতেছি। অথবা যখন আমার হৃদয় অতুল আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল, সেই সময়ে, হৃদয়ের সেই আনন্দস্রাবেই কি

ইত্যাদি নানা ভাবনার পর, উৎসঙ্গস্থিত বালককে আরও সূক্ষ্ম-ভাবে দেখিয়া রাম বলিয়া উঠিলেন—

"অয়ে! ন কেবলমস্মৎসংবাদিনী আকৃতিঃ!—
'অপি জনক-সুতায়া স্তচ্চতচ্চানুরূপ্যং
স্ফুটমিহ শিশুযুগ্মে নৈপুণোন্নেয়মস্তি।
ননু পুনরিব তন্মে গোচরীভূতমক্ষো
রভিনব-শতপত্র-শ্রীমদাস্যং প্রিয়ায়াঃ॥"১

রাম ভাবিতে লাগিলেন—"সৈবোষ্ঠমুদ্রা স চ কর্ণপাশঃ।"—এই-ভাবে ক্রমে কত কথা মনে আসিল! সংশয় ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষের মনে যাহা যাহা হয়, রামের মনে সে সব উদিত হইল। এই সেই বাল্মীকির আশ্রম, এইখানেই ত আমার আদেশে, লক্ষ্মণ দেবীকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। এই বালকদ্বয়ের আকৃতিও ত ঠিক আমার দেবীর অনুরূপ! এ সব কি? এ কি কোন স্বপ্ন, না মায়া?—ইত্যাদি কত কি ভাবের উদয়ে রামের প্রেমময় হৃদয় একান্ত বিধুর হইয়া পড়িল। ক্রমে অসময়ের সহচর চক্ষুর জল দেখা দিল। শিশু লব তাহা

এই বালক-যুগল উৎপন্ন হইয়াছে, নতুবা ইহাদের স্পর্শে আমার দেহে এমন অমৃতবর্ষণ হইতেছে কেন?

১—উত্তর-চরিত, ৬ষ্ঠ অঙ্ক:—এ কি? শুধু যে আমার অনুরূপ আকার, তাহা ত নহে। জনকনন্দিনীর দেহের ছায়াও ত ইহাদের সর্ব্বশরীরে উদ্ভাসিত। অনেক দিন হইল, জানকীর সেই চিরনূতন বদনকমল দেখি না, আজ ইহাদের মুখদর্শনে সেই মুখ যেন আবার দেখিলাম, মনে হইতেছে।

দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তাত! এ কি?'—অমনি কুশ ক্ষিপ্রকণ্ঠে বলিলেন, 'সে কি লব? উনি কাঁদিবেন না?'—

'বিনা সীতাদেব্যাঃ কিমিব হি ন দুঃখং রঘুপতেঃ?
প্রিয়া-নাশে কৃৎস্নং জগদিদমরণ্যং হি ভবতি!
স চ স্নেহস্তাবানয়মপি বিয়োগো নিরবধিঃ,
কিমিত্যেবং পৃচ্ছস্যনধিগতরামায়ণ ইব?'[১]

কুশের এই তটস্থিত আলাপে রামের সব আশা ভরসা ফুরাইল! তখন তিনি মনে মনে বলিলেন—'আর কেন? আর প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। দগ্ধহৃদয়, কেন তোমার হঠাৎ এ বিপর্য্যয়?'—বলিয়াই রাম মন ফিরাইতে প্রয়াস করিলেন। কিন্তু পারিলেন না। বালকদ্বয়ের সহিত আলাপ করিবার প্রবৃত্তি রামের ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। শেষে লবকুশ ও রামে কত কথা হইল। 'রামায়ণের কতদূর হইয়াছে?' 'কতদূর পড়িয়াছ?' 'যদি কষ্ট বোধ না কর, দু' একটি কবিতা বল না?'—ইত্যাদি নানা কথায় রাম আবার অধীর হইয়া পড়িলেন।—কি সুন্দর কল্পনা! দুষ্মন্ত দেবস্বভাবসম্পন্ন নৃপতি, রাম দেবতার দেবতা, সাক্ষাৎ পূর্ণ-ব্রহ্ম! দুষ্মন্তের ভার্য্যা ঋষির দুহিতা, রামের ভার্য্যা রাজর্ষির

১—উত্তর চরিত, ৬ষ্ঠ অঙ্ক:—সীতাদেবীকে হারাইয়া রঘুপতির যে দুঃখ, ভাই লব! তাহার কি ইয়ত্তা আছে? প্রিয়তমার বিনাশে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জীর্ণ অরণ্যের মত মনে হয়। একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, রামসীতার সেই স্নেহ, আর এই অসীম বিচ্ছেদ,—কি ভয়ঙ্কর বিপর্য্যয়! লব! রামায়ণ পড়িয়াও এমন অজ্ঞের ন্যায় প্রশ্ন করিতেছ কেন?

দুহিতা, দুষ্মন্তের পুত্র দুগ্ধপোষ্য, রামের পুত্র অমিততেজা বীর, কিশোর হইয়াও প্রাবীণ্যের অদ্বিতীয় নিকেতন। দুষ্মন্ত ও রামে এবং সর্ব্বদমন ও লবকুশে কত প্রভেদ। যেমন শকুন্তলা এবং সীতায় প্রভেদ, যেমন দুষ্মন্ত এবং রামে প্রভেদ, তেমনই সর্ব্বদমন ও লবকুশে প্রভেদ। রামের মত পিতাকে লবকুশ চিনিতে পারিলেন না, বা লবকুশের মত পুত্ররত্নকে রাম চিনিতে পারিলেন না, নিরপরাধা সীতার নির্ব্বাসনের বোধ হয়, ইহা অপেক্ষা কঠোরতর প্রায়শ্চিত্ত, রামের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। হিন্দুর চরম প্রায়শ্চিত্ত চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক প্রাজাপত্য প্রভৃতিও ইহার নিকটে কোন্ ছার! দুষ্মন্তকে সর্ব্বদমনের চিনিতে না পারা, আর রামকে লবকুশের চিনিতে না পারা, এতদুভয়ে কত তারতম্য। কবিবর শ্রীকণ্ঠ, কেমন কৌশলে, কালিদাসের স্বরচিত স্বর্ণমন্দিরের গাত্রে একখানি ছবি আঁকিয়া দিলেন। আধার মন্দির অপেক্ষা আধেয় আলেখ্যের আদর অধিক হইল। কালিদাসের সুগঠিত প্রতিমার 'চাল চিত্র' করিয়া, রঙ্গ ফলাইয়া, 'চক্ষুদান' দিয়া, শ্রীকণ্ঠ জগৎ মুগ্ধ করিলেন। কালিদাসের কবিতার এবংবিধ অর্চ্চনা একমাত্র ভবভূতিরই ক্ষমতা-সাধ্য, অন্যে ইহাতে অসমর্থ। তাই কালিদাসের নামের সঙ্গে তাঁহার নামও একসূত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের উভয়ের—

'সাধারণো ভূষণ-ভূষ্য-ভাবঃ'—[১]

১—কুমার, ১ম সর্গ। পরস্পরের ভূষণ পরস্পর।

হইয়াছে। যেমন কালিদাস, তাহার তেমনই অণুকারক ভবভূতি। সূর্য্যের কিরণে চন্দ্র দীপ্তিমান, আবার চন্দ্রের কিরণে ত্রিজগৎ বিমুগ্ধ ও আলোকিত। শ্রীকণ্ঠের কবিতা-রূপিণী বিমল কৌমুদীতেও জগৎ বিমুগ্ধ, তন্দ্রালস।

একবিংশ অধ্যায়।

পিতা ও পুত্র।

কথোপকথনের ব্যপদেশে, লবকুশের দ্বারা, মহাকবি শ্রীকণ্ঠ, রামের সেই সীতাময় জীবনের সব কথাগুলি একটি একটি করিয়া মনে করাইয়া দিলেন! রাম কখন হর্ষে, কখন বিষাদে, কখন জ্ঞানে, কখন অজ্ঞানে অভিভূত হইতে লাগিলেন। কুমারযুগলের মুখে, রামায়ণের কিয়দংশ শুনিবার অভিলাষে, রাম কহিলেন,—“বৎসগণ! শুনিয়াছি, রামায়ণ ভগবান্ বাল্মীকির কবিত্বামৃতের অপূর্ব্ব উৎস, আদিত্য-বংশের অপ্রতিম ইতিহাস, তাহার কোন অংশ আবৃত্তি করিতে পার কি?”—অমনি কুমার কুশ মুক্তকণ্ঠে কহিলেন ‘বালচরিতের অন্ত্যভাগের দুইটি কবিতা আমার বেশ মনে আছে, শ্রবণ করুন;

প্রকৃত্যৈব প্রিয়া সীতা রামস্যাসীন্ মহাত্মনঃ।
প্রিয়ভাবঃ স তু তয়া স্বগুণৈরেব বর্দ্ধিতঃ॥

তথৈব রামঃ সীতায়াঃ প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়োঽভবৎ।
হৃদয়ং ত্বেব জানাতি প্রীতিযোগং পরস্পরম্॥[১]

রাম শুনিলেন,—তাঁহার প্রিয়তমা সীতার সেই অনুপম পাতিব্রত্য, অমরপ্রার্থিত প্রীতি, আর তাদৃশী প্রীতি-প্রতিমার প্রতি রাজার নির্ব্বাসন দণ্ড—যুগপৎ রামের মনে ভাসিয়া উঠিল। বিশুদ্ধ প্রণয়ের এবং দেবদুর্লভ সতীত্বের মর্যাদা রাম যে অদ্ভুত প্রণালীতে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়া সীতাপতি শিশির-মাসের তুষারবর্ষী চন্দ্রমার ন্যায় সজল-নয়ন হইলেন। সীতার সেই অনন্ত গুণগ্রামের কথা, সিন্ধুবক্ষে উর্ম্মিমালার ন্যায়, রামের জীর্ণবক্ষে যুগপৎ উদিত হইয়া তাঁহাকে একান্ত অধীর করিয়া তুলিল। তিনি নীরবে ও বাষ্পাকুললোচনে শ্যামলকান্তি কুশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কুশ আবার বলিলেন—'দেব, শুনুন, মন্দাকিনীর তটে যে মনোরম কুঞ্জবন ছিল, তথায় এক-দিন সীতাদেবীকে সম্বোধন করিয়া রঘুপতি কহিয়াছিলেন—

ত্বদর্থমিব বিন্যস্তঃ শিলাপট্টোঽয়মগ্রতঃ।
যস্যায়মভিতঃ পুষ্পৈঃ প্রবৃষ্ট ইব কেশরঃ॥[২]

১—উত্তর-চরিত, ৬ষ্ঠ অঙ্ক :—সীতা মহাত্মা রামচন্দ্রের প্রকৃতই প্রাণতুল্য প্রিয় ছিলেন। সীতা নিজের গুণে রামের সেই প্রিয়ভাব দিন দিন বৰ্দ্ধিতই করিতেছিলেন। আবার সীতাও রামকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যে কি অনুপম প্রীতিবন্ধন ছিল, তাহা মাত্র তাঁহারাই জানিতেন। অন্যে তাহা বুঝিত না।

২—উত্তর চরিত, ৬ষ্ঠ অঙ্ক :—তোমার জন্যই, জানকি! ঐ সম্মুখে শীতল

রাম শুনিলেন,—মন্দাকিনীতটের কুঞ্জবনে সেই দিনের সেই কথা,—সীতাকে আদর করার সেই ব্যাপার রামের মনে পড়িল। অরণ্যচর শিশুগণ স্বভাবতই মুগ্ধ, সংসারের জটিল ব্যবহারের কোন ধার তাহারা ধারে না। তাহারা নিশীথিনীর নির্ম্মল ললাটে সিন্দুরবিন্দুরূপী চাঁদ দেখিয়া থাকে, সে চাঁদের কলঙ্ক দেখিতে পায় না, দেখিতে জানে না। তাহারা বসন্ত-দূতিকা পিকবধূর অমৃতবর্ষী ঝঙ্কার কাণ পাতিয়া শুনে, তাহার কৃষ্ণ বর্ণ দেখে না। দেখিতে চায় না। রামায়ণের রাম, তদীয় প্রাণ-প্রতিমা সীতাকে মন্দাকিনীর জনহীন কুঞ্জবনে কত আদর করিয়া শিলাতলে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কুসুম রাশির মধ্যে কুসুমকোমলা সীতাকে মিশাইতে চাহিয়াছিলেন; বাল্মীকির কবিতালোকে সে ছবিখানির রং বড় সুন্দর ফলিয়াছে। বালকযুগল তাহা দেখিয়াছে, দেখিয়া দেখিয়া অতুল আনন্দ পাইয়াছে. বালকের নির্ম্মল প্রতিভাদীপ্ত হৃদয়ে সে ছবির একখানি প্রতিচ্ছবি যেন লাগিয়া রহিয়াছে। তাই তাহারা আজ আবরণ উন্মোচন করিয়া সেই প্রতিচ্ছবি দেখাইল। অযোধ্যা-পতি রামের সমক্ষে রামায়ণের সীতাপতি রামচন্দ্রের হৃদয়ের প্রতিকৃতি তুলিয়া ধরিল। গুরুজনের নিকটে যে তাদৃশ ছবির স্বরূপ প্রকাশ করিতে নাই, দম্পতির প্রণয়-প্রসঙ্গ যে বালকের মুখে শোভা পায় না, মানায় না,—এ সব আইন তাহারা

শিলাফলক বিন্যস্ত, তুমি বসিবে বলিয়া, ঐ দেখ উহার চতুর্দ্দিকে, তরুকুসুমগুচ্ছ, কত কেশর বিছাইয়া রাখিয়াছে!

জানে না, তাহারা আরও জানে না যে, রাম-সীতা তাহাদের কে, তাই অসঙ্কোচে রামসীতার প্রণয়ালাপ, রামের সমক্ষে বলিয়া ফেলিল। রাম কিন্তু একটু লজ্জিত হইলেন, পরক্ষণেই আবার অবসাদ আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। ক্ষণবিলুপ্ত অশ্রু আবার দেখা দিল। সেই মন্দাকিনী, সেই কুঞ্জবন, সেই কুসুমদাম-বিমণ্ডিত শিলাফলক, আর তদুপরি তাঁহার সেই শান্তি-প্রতিমা চিত্তবিনোদিনী জানকীর অধিষ্ঠান,—সব একে একে মনে পড়িল। তখনকার সেই নির্জ্জন মন্দাকিনী-তটের ব্যাপারপরম্পরা, স্বপ্নের ন্যায় মনে জাগিয়া, সীতা-বল্লভকে একান্ত আকুল করিয়া তুলিল। সেই দিনের সেই ছবি, সুকুমারী রাজনন্দিনী জানকীর সেই মূর্ত্তি, তিনি যেন চক্ষুর উপর দেখিতে পাইলেন। সেই যে মুক্তার মত ঘর্ম্মবিন্দুতে সীতার মুখখানি শিশিরজালে কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল, সেই যে মন্দাকিনীর মৃদু-সমীরণে উড়িয়া আসিয়া কুঞ্চিত অলকগুচ্ছ সীতার ললাট-চন্দ্রমাকে ঢাকিতেছিল, বনবাসিনী সীতার কুঙ্কুমরাগ-শূন্য, নিসর্গ-সমুজ্জ্বল, দুগ্ধ-ধবল কপোল-ফলক, চূর্ণ কুন্তলের আবরণে মধ্যে মধ্যে আবৃত হইয়া, পত্নী-বৎসল রামের মনে সেই যে আকাশে চাঁদের সহিত জলদের খেলা স্মরণ করাইয়া দিতেছিল, সেই সব যেন রাম দেখিতে পাই-লেন। তাপস-শিশুর কবিতায় বাতাসের গায়ে যেন সেই দিনের সেই ছবিখানি অঙ্কিত করিয়া দিল, আর সীতাপতি রামচন্দ্র মানস-নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। কি অনুপম কবিত্ব!

যে সরস্বতীর বরে কালিদাস—'কালিদাস,'—সেই সরস্বতী ভবভূতির বশবর্ত্তিনী, কণ্ঠবিলাসিনী ; তাই কালিদাসের দুষ্মন্ত-সর্ব্বদমন-বৃত্তান্ত অপেক্ষা ভবভূতির এই রাম-লবকুশ-সংবাদ মনোজ্ঞতর হইয়াছে। সৌন্দর্য্যের কবি কালিদাস ভাবের কবি ভবভূতির নিকটে এই অংশে পরাস্ত হইয়াছেন, অথবা 'পরাস্ত' বলিব না,—কেন না, ভবভূতি কালিদাসেরই সঞ্চিত পাথেয় সম্বল করিয়া, কালিদাসেরই অনুযাত্রী হইয়াছেন,—সুতরাং ভবভূতির এই উৎকর্ষে কালিদাসেরই মাহাত্ম্য সূচিত হইতেছে। তাই কালিদাসের ভাষায় বলি—

> সিধ্যন্তি কর্ম্মসু মহৎস্বপি যন্নিযোজ্যাঃ
> সম্ভাবনাগুণমবেহি তমীশ্বরাণাং।
> কিং প্রাভবিষ্যদরুণস্তমসাং বিভেত্তা
> তঞ্চেৎ সহস্র-কিরণো ধুরি নাহকরিষ্যৎ ?[১]

কুশোচ্চারিত কবিতার শ্রবণে রামের মুখচ্ছবির যে ভাবান্তর ঘটিয়াছে, নিপুণ লব তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। রাম কুশের মুখের দিকে, আর লব স্থির-নয়নে রামের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। সৈন্যগণের সান্ত্বনার জন্য রামের অনুমতিক্রমে কুমার চন্দ্রকেতু অনেকক্ষণ হইল চলিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রকেতুর

১—শকুন্তলা-৭ম অঙ্ক—অনুজীবগণ প্রভুর অতি দুঃসাধ্য কর্ম্মেও যে সিদ্ধিলাভ করে, সে তাহাদের গুণে নহে, প্রভুর নির্ব্বাচন-কৌশলই ঐ সিদ্ধির প্রকৃত কারণ। সহস্রকিরণ বিবস্বান্ যদি অরুণকে সম্মুখে না রাখিতেন, তবে কি অরুণ নিখিল নৈশ তিমিরের বিনাশে সমর্থ হইতেন ? কখনই নহে।

অদ্ভুত বীরত্বে লব বিমুগ্ধ, অনেকক্ষণ তাঁহাকে দেখেন না,--লবের মনে চন্দ্রকেতু-দর্শন-লালসা ক্রমেই বলবতী হইতেছে।—আদি কবি বাল্মীকির তপোবনের একদেশে রাম, লব এবং কুশ যখন এইরূপে, এক অননুভূতপূর্ব্বা ও বিস্ময়জনিকা অবস্থায় অভিভূত, সেই সময়ে, নেপথ্যে ধ্বনি হইল---"বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, দশরথের মহিষীগণ, জনক এবং অরুন্ধতী প্রভৃতি সকলে, শিশু-দিগের কলহ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া একান্ত ত্রস্ত হইয়াছেন, আশ্রম একটু দূরে, তাঁহারাও জরাগ্রস্ত ও শ্রমক্লান্ত, তাই মৃদু-মন্দ-পদসঞ্চারে এইদিকে আসিতেছেন।"—রাম, লব এবং কুশ—তিনজনেই এ সংবাদে চমকিয়া উঠিলেন। "এখানে তাঁহারা ?"---ভাবিয়া সীতাবিসর্জ্জক রামের চিত্ত অবশ হইয়া আসিল। সীতাকে বনবাস দিয়া রাম ভাবিয়াছিলেন যে, আর ইঁহাদিগকে মুখ দেখাইবেন না। সীতার বিচ্ছেদে যাঁহারা মৃতপ্রায়, আজ একদা সেই সকলের সমক্ষে দাঁড়াইতে হইবে, ভাবিয়া, প্রজারঞ্জন নরপতির হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই সকলের---বিশেষতঃ জনকের সমক্ষে কি করিয়া মুখ দেখাইবেন, রাম তাহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অদূরে বশিষ্ঠ বাল্মীকি প্রভৃতি আগতপ্রায়—দেখিয়া, রাম সজলনয়নে অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইলেন, আর লবকুশ পথ দেখাইতে দেখাইতে রামের পুরোভাগে চলিলেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

আকাশবাণী।

জনক, কৌশল্যা, অরুন্ধতী প্রভৃতির সহিত রামের সাক্ষাৎকার হইয়া গিয়াছে। দুহিতা সীতার বনবাসের পর, জনকের এই প্রথম রাম-মুখ-দর্শন। কৌশল্যা ভাবিয়াছিলেন, যে পুত্র সীতার ন্যায় কুললক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার মুখ-দর্শন আর করিবেন না, ঘটনাবশে তাহাও করিতে হইয়াছে। রামের সহিত সকলেই সাক্ষাৎ করিয়াছেন। অত বড় সর্ব্বনাশের পর, অমন ভয়ঙ্কর আঘাতের পর, পরস্পরের সমক্ষে পরস্পরের হৃদয়ের যে দশা ঘটিয়াছিল, স্বজনের সমক্ষে দুঃখময় হৃদয়ের কপাট খুলিয়া গিয়া যে শোচনীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। যাঁহারা সহৃদয়, তাঁহারা মানস-নয়নে সে অরুন্তুদ দৃশ্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যে যাতনার অত্যল্প অংশেরও চিন্তাদ্বারা ধারণা করিতে বুক ভাঙ্গিয়া যায়, মস্তক অবসন্ন হইয়া আইসে, ভাষায় তাহার প্রকাশের প্রয়াস বিফল। তাই ভাবুকপ্রবর শ্রীকণ্ঠ ঐ সাক্ষাৎকারের কোনও বর্ণন করেন নাই। জনকাদি ঐ আসিতেছেন, দেখিয়া, সীতা-বিচ্ছেদ-কাতর রাম তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইলেন, সঙ্গে তাঁহার লবকুশ,—মাত্র এইটুকু বলিয়াই মহাকবি বিরত হইয়াছেন। ভবভূতির ন্যায় প্রেমিকের পক্ষে

ইহা অতি সমীচীন হইয়াছে। যে দশা দেখিয়া নিজেই কাঁদিয়া আকুল হই, জ্ঞান হারাই, শর-সংবিদ্ধ মৃগের ন্যায় ছট্‌ফট্ করি, সে দশার স্বরূপ অপরকে বুঝাইব কি প্রকারে? যে নিজে বিমূঢ়, সে অপরকে প্রবুদ্ধ করিতে পারে না। তাই প্রেমপ্রবণ মহাকবি ঐ শোকাবহ বৃত্তান্তের বর্ণনে ক্ষান্ত হইয়াছেন। ভব-ভূতির চক্ষুতে দেখিলে বলিতে হয়, 'স্থানে খলু বাক্যনিবৃত্তি র্মোহশ্চ।'

লবকুশের সহিত রাম, অনেকক্ষণ হইল, জনকাদিকে অভ্যর্থিত করিতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এখনও ফিরিলেন না। জনকাদির দর্শনে রামের বা রামের দর্শনে জনক কৌশল্যা প্রভৃতির কি অবস্থা ঘটিল?—আবার কোন অত্যাহিত হইল কি না?—এখনও ত কেহ কোনও সংবাদ আনিল না? কোথায় সে লব? কোথায়ই বা কুশ? এতক্ষণ যাহারা রঙ্গমঞ্চ উজ্জ্বল করিয়া ছিল, কোথায় সে শিশু-যুগল?—ভাবিতে ভাবিতে সীতাবিয়োগবিধুর সামাজিকবৃন্দ নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিলেন। কত কি দুশ্চিন্তায় তাঁহাদের বিষণ্ণ অন্তঃকরণ অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। এমন সময়ে, চকিতে দৃশ্যপট উত্তোলিত হইল। কুমার লক্ষ্মণ ঋতুরাজ বসন্তের ন্যায়, সেই শোকশীত-ক্লিষ্ট সামাজিকগণের নয়নপথে উপনীত হইলেন। প্রসন্নবদন লক্ষ্মণের আগমনে সমস্ত রঙ্গমঞ্চ যেন ঝটিতি প্রসন্নতায় নিমগ্ন হইল। নির্ম্মল চন্দ্রিকায় শারদা নিশার ন্যায় সমগ্র রঙ্গভূমি হাসিয়া উঠিল।

লক্ষ্মণ প্রবেশ করিয়াই মধুরকণ্ঠে কহিলেন—"সমবেত সামাজিকবৃন্দ! শ্রবণ করুন; ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি, ভগবান বাল্মীকি, স্বকীয় প্রভাববলে রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীদিগকে একত্র উপস্থাপিত করিয়াছেন, দেবতা, অসুর, শ্বাপদ, সরিসৃপ সকলেরই অধিপতিগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। অধিক কি, স্থাবর জঙ্গম—সমস্ত ভূতগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা আহূত হইয়াছেন। ঐ দেখুন, ঐ ভাগীরথী-তীরে, লবণাম্বুরাশির বেলাবক্ষে বিভগ্ন ফেন-পুঞ্জের ন্যায়, অনন্ত জনবাহিনী শোভা পাইতেছে। বাল্মীকির স্বরচিত কোন বিশিষ্ট কাব্য আজ অপ্সরাদের দ্বারা অভিনীত হইবে। সেই অভিনয় দেখাইবার জন্যই এই জন-সংগ্রহ। আর্য্য রামচন্দ্রের আদেশে আমি অভ্যাগত ব্যক্তি-বৃন্দের উপবেশনাদির যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিয়াছি। ঐ আর্য্যও আসিতেছেন,—আপনারা অবহিতচিত্তে মহর্ষি-প্রণীত অভিনেয় পদার্থের মাধুর্য্য উপভোগ করুন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।"

অকস্মাৎ রঙ্গমঞ্চে লক্ষ্মণের আগমনে সামাজিকসমূহ যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়াছিলেন, আর এখন লক্ষ্মণের মুখে আবার এই অভিনয়ের কথা শ্রবণে চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হইলেন। কোথায় প্রবল শোকানলের বিশ্বপ্রদাহিনী জ্বালা, আর কোথায় এই আনন্দ-সন্দোহ-বর্ষিণী অতুল অভিনেয়-সম্পদ্! সামাজিক-গণ ত অভিনয়-দর্শনার্থেই সমবেত, দেখিতেছেনও অভিনয়, তাহার মধ্যে আবার আর এক অভিনয়, এ কিরূপ কথা? রামচরিত অভিনীত হইতেছে, তাহার এখনও শেষ হয় নাই,

ইহারই মধ্যে অপ্সরাগণের দ্বারা বাল্মীকির এক নূতন কাব্য অভিনীত হইবার প্রস্তাবনা.—ব্যাপার কি? তাঁহারা কিছুই স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। জগতের প্রধান প্রধান সকলেই উপস্থিত। অযোধ্যাপতি রাম, এই সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে, তারাব্রজমধ্যগত তারাপতিবৎ বিরাজমান। সকলেই কৌতূহলাবিষ্ট। কেন এ অভিনয়? কিসের অভিনয়? সংসারবিমুক্ত, রজোরিক্ত-হৃদয় আদিকবি বাল্মীকি, যে কাব্যের অভিনয় প্রদর্শনের নিমিত্ত চরাচর ভূতগ্রামকে একত্র সমবেত করিয়াছেন, সে কাব্যে কোন্ প্রবন্ধ বর্ণিত, কা'র ইতিবৃত্ত গ্রথিত,—তাহা জানিবার জন্য সকলেই একান্ত উৎসুক হইয়া উঠিলেন। বিরাট্ জনসমাগম,—কিন্তু তাহাতে একটি সামান্য নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যান্ত শ্রুত হয় না। সামান্য স্পন্দন পর্য্যন্ত অনুভূত হয় না। সকলেই নীরব, যেন চিত্র লিখিত। মাত্র পতিতোদ্ধারিণী ভাগীরথীর কুল কুল ধ্বনি, উষার পিকধ্বনিবৎ শ্রুত হইতেছে, সে ধ্বনিতে সমবেত দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত, তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে, যেন কোন যাদুমন্ত্রে ক্রমে তন্দ্রাযুক্ত ও অলস হইয়া আসিতেছে। কি অনুপম চিত্র! মহাকবি ভবভূতি যদি অন্য কোন কাব্য প্রণয়ন না করিয়া, মাত্র উত্তর চরিতের এই সপ্তমাঙ্কটি বিরচন করিতেন, তাহা হইলেও তিনি তাঁহার ন্যায়তঃ প্রাপ্য 'শ্রীকণ্ঠ' মণ্ডনে বিমণ্ডিত হইতেন।

সমবেত সভ্যবৃন্দ যখন এই প্রকারে, নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপকলিকাবৎ স্থির, নিস্পন্দ, ঠিক সেই সময়ে, সূত্রধার রঙ্গমঞ্চে

প্রবেশপূর্ব্বক জলদ-গম্ভীর-স্বরে কহিল—"ভূত-ভবিষ্যদ্-বর্ত্তমান —ত্রিকালের ইতিহাসজ্ঞ ভগবান্ প্রাচেতস বাল্মীকি, কি স্থাবর কি জঙ্গম, জগতের সকলকে আদেশ করিতেছেন যে, আমি আর্ষ নয়নের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া, যে পবিত্র, করুণ এবং অদ্ভুত রসে পরিপূর্ণ প্রবন্ধ প্রণয়ন করিয়াছি, তাহা এখনই অভিনীত হইবে, সকলে সাবধানে অবলোকন করুন।"—প্রবন্ধের স্বরূপ কেহই অবগত নহেন। তাই সূত্রধারের কথা আরও একটু বিশদভাবে বুঝাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে রাম কহিলেন—'মহর্ষিগণ আর্ষনয়নে বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, সুতরাং প্রাচেতসের অমৃতময় প্রবন্ধের অভিনয় নিঃসন্দিগ্ধহৃদয়ে সকলে অবলোকন করুন। মহর্ষিবৃন্দের সত্ত্বপ্রধান প্রজ্ঞা, কোন কালে, কোন দেশে, কোন বিষয়ে কদাচ ব্যাহত হয় না, অতএব এ অভিনয় আপাতরম্য অভিনয় নহে, ইহা যে সত্য, সনাতন, এবং জগতের অশেষ কল্যাণের নিদান, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।" রামের উক্তিতে দর্শকগণের চিত্ত আরও একাগ্র হইল। কি অভিনয়, কিসের অভিনয়, কেহই তাহা অবগত নহেন, অথচ স্বয়ং অযোধ্যাপতি পর্য্যন্ত সে অভিনয়ের প্রতি এত গৌরব প্রকাশ করিতেছেন; দর্শকদিগের বিস্ময় আরও বাড়িল। একাগ্রতার সহিত বিস্ময়ের সংমিশ্রণে দর্শকবৃন্দের চিত্তে এক নবীন ভাব জন্মিল, আকাঙ্ক্ষা এবং উৎসাহে সে চিত্ত ভরিয়া গেল। তাঁহাদের হৃদয়ে কত নূতন আশা, নূতন আগ্রহ উদিত হইল। সংসার ভুলিয়া, আপনাকে ভুলিয়া, মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায়,

হৃতচেতনের ন্যায়, তাঁহারা বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে রঙ্গমঞ্চের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাম,—সত্যপ্রিয়, গুণাভিরাম, অযোধ্যার প্রজারঞ্জন রাম,—সত্য-প্রাণ প্রাচেতসের প্রবন্ধে বহুমান-নিবন্ধন, নির্নিমেষ-নয়নে সেই দিকে চাহিয়া আছেন, প্রাণপ্রিয় অনুজ লক্ষ্মণ পার্শ্বে উপবিষ্ট। আর অযোধ্যার প্রজামণ্ডলী তাঁহাদের চারিদিকে চিত্র-ন্যস্ত মূর্ত্তির ন্যায় নিঃস্পন্দ-ভাবে আসীন। কেহই জানে না যে, ঘটনাটা কি, কোন্ বিষয়ের অভিনয় হইবে, কিসের জন্য এত আয়োজন, কেন চরাচর পৃথিবীর সকলের একত্র সমাবেশ? রত্নাকরের সত্ত্বময় তপোবনে আজ তাঁহারা কি রত্নের অন্বেষণে সমবেত? যখন সকলেরই চিত্ত এই প্রকার স্থির, একাগ্রতাপূর্ণ, যখন সকলেরই নয়ন রঙ্গমঞ্চে যুগপৎ প্রহিত, সেই সময়ে নেপথ্যে কে যেন কান্দিয়া উঠিল,—'হা আর্য্য পুত্র! হা কুমার লক্ষ্মণ!'—সকলেই চমকিয়া উঠিলেন। সে করুণ-ধ্বনিতে সমবেত জনমণ্ডলীর চিত্তে সহসা এক বিষম আঘাত লাগিল। কে কান্দিল, কেন কান্দিল, কিছুই কেহ বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু প্রাণ সকলেরই অস্থির হইল।—আর রাম,—লোকরঞ্জন রাম, বজ্রাহতবৎ, শাখা-পত্রাদিশূন্য স্থাণুবৎ, প্রস্তরস্তম্ভবৎ, একেবারে নিশ্চল ও নিস্পন্দ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইল, ঐ করুণস্বর যেন তাঁহার কর্ণের চিরপরিচিত, হৃদয়ের চিরবিজ্ঞাত, এবং জীবনের চির-বাঞ্ছিত। অযোধ্যাপতির হৃদয় একেবারে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' হইয়া পড়িল। ঐ স্বর শ্রবণের প্রথম মুহূর্ত্তে তদীয় নীল-নয়নে

যে জলবিন্দুর উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা নিমিষের মধ্যে শুকাইয়া গেল। রাম দৃঢ় হইয়া বসিলেন। বুকের তরঙ্গ বুকের মধ্যেই চাপিয়া, অযোধ্যার সর্ব্বংসহ রাজার ন্যায় সীতানাথ প্রশান্ত-ভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। আর লক্ষ্মণ,—রামের প্রাণসম লক্ষ্মণ, সীতার প্রাণাধিক লক্ষ্মণ, অযোধ্যার অকলঙ্ক চন্দ্রমা, কোমলতার অদ্বিতীয় আধার লক্ষ্মণ, অগ্রজের পার্শ্বে একেবারে হতচেতনের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়নের দৃষ্টি, হৃদয়ের চিন্তা, শরীরের শক্তি, সব যেন সহসা ঐ করুণস্বরে অপহরণ করিল। পূর্ণ-শশী যেন অকস্মাৎ মেঘাবৃত হইল। তিনি লক্ষ্যহীন নয়নে ঐ দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঐ করুণস্বর এখনও যেন বিলুপ্ত হয় নাই, বাতাসে এখনও যেন ভাসিতেছে, লক্ষ্মণ আর একবার ঐ ধ্বনি শুনিবার জন্য কাণ পাতিয়া রহিলেন। ঐ আকাশবাণী যদি আর একবার শুনিতে পান, জীবন সার্থক হইবে—ভাবিয়া, যে পথে ঐ ধ্বনি আসিয়াছে, সেইদিকে অনিমেষ-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

উষা।

'আর্য্যপুত্র'—কে আর্য্যপুত্র ?—কা'র আর্য্যপুত্র ?—কা'র কণ্ঠের এ ধ্বনি—? সামাজিকগণ তাহা বিদিত নহেন, কিন্তু ঐ 'আর্য্যপুত্র' ধ্বনির পর হইতেই তাঁহাদের অবিদিত হৃদয় তুহিন ভরে দূর্ব্বাগ্রের ন্যায়, ঐ দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। ঐ করুণ-স্বরে, সেই সমবেত জন-সংহতি, সমগ্র রঙ্গমঞ্চ উৎকণ্ঠামিশ্রিত বিষাদের একটা গাঢ় আবরণে আবৃত হইয়াছে। আর তাহার মধ্যে অযোধ্যাপতি প্রজারঞ্জন রাম, উচ্ছ্বসিত-হৃদয়ে বসিয়া আছেন। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে, বিরাট্ জনসমাগমকে সম্বোধন করিয়া, তিনি, প্রজ্ঞাচক্ষুঃ মহর্ষি বাল্মীকির অভিনেয় প্রবন্ধের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সকলকে উহার উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়াছেন, তখন জানিতে পারেন নাই যে, ঐ প্রবন্ধে কোন বিষয় বর্ণিত, কা'র কথা আলোচিত। একে আদিকবি বাল্মীকির রচনা, তার পর, সম্রাট রামচন্দ্রের প্রশংসাখ্যাপন,—সামাজিকগণের চিত্ত একান্ত অবহিত হইয়া ঐ দিকে নিবিষ্ট। কিন্তু রাম স্বয়ং ঘোর আন্দোলনে পতিত। ঐ 'আর্য্যপুত্র' শব্দে তাঁহার হৃৎপিণ্ড যেন উৎপাটিত হয় হয় হইয়াছে। ব্যাপার কি, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না বটে, কিন্তু ঐ সম্বোধন, আর যে উৎস হইতে ঐ করুণরস-বাহিনী স্বর-

লহরী উত্থিত, সেই উৎস, সেই কণ্ঠ, তাঁহার অপরিচিত নহে। কি কৈশোরে, কি যৌবনে, কি রাজপ্রাসাদে, কি গহন অরণ্যে, ঐ সম্বোধন আর ঐ কণ্ঠ রামের মৃতসঞ্জীবন-স্বরূপ ছিল। ঐ সম্বোধন রাম যখন শ্রবণ করিতেন, ঐ কণ্ঠস্বর রামকে যখন পীযূষ ধারায় অভিষিক্ত করিত, প্রেমময় রামের তখন আত্মবিস্মৃতি ঘটিত, এক অননুভূতপূর্ব্ব ও অপার্থিব আনন্দরসে সীতাপতি রামচন্দ্রের হৃদয়খানি তখন একেবারে ডুবিয়া যাইত। অনেক দিন হইল, দুর্ভাগ্য নরপতি ঐ সম্বোধনে বঞ্চিত, ঐ অমৃতে বঞ্চিত। শয়নে, স্বপনে, সজনে, নির্জ্জনে, রাম ঐ সম্বোধনের চিন্তা করিয়া থাকেন। যাহা শুনিয়া এক সময়ে জীবনকে ধন্য ভাবিতেন, সংসারকে সার্থক মনে করিতেন, যাহা শুনিবার জন্য নিয়ত উৎকণ্ঠিত থাকিতেন, কত কৌশল করিতেন, সেই যৌবনের মোহ, প্রৌঢ়কালের স্বপ্ন, 'আর্য্যপুত্র'-ধ্বনি বহুকাল পরে আজ প্রজারঞ্জন নৃপতিকে আকুল করিয়া তুলিল। যে ধ্বনি দিবানিশি—অষ্টপ্রহর রামের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হয়, যে ধ্বনি—

"পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো

কি করিব কি হ'বে উপায় ?—"

ভাবিতে ভাবিতে রাম নীরবে নিয়ত কত অশ্রু বিসর্জ্জন করেন, সেই 'আর্য্যপুত্র'-ধ্বনি,—এক সময়ে যাহাতে অনন্ত প্রসাদ জন্মাইত, আজ বিষাদ-ধারা-পরিবাহী সেই স্বর, হিরণ্ময়ী সীতার প্রতিষ্ঠাতা রামচন্দ্রকে যথার্থই উন্মত্তবৎ করিল। আত্মসংযমে

রাম অদ্বিতীয়, গাম্ভীর্য্যের তিনি অনুপম আধার, সহিষ্ণুতার তিনি অগাধ পারাবার, তাই সামাজিকগণের মধ্যে কেহ তদীয় হৃদয়াবস্থার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিলেন না। আর জানিবেনই বা কখন? এই অদ্ভুত ব্যাপারে তাঁহারাও অবাক্, স্তম্ভিত হইয়াছেন। পরিমিত হৃদয়ে এই অপরিমিত ঔৎসুক্য জন্মিয়া তাঁহাদিগকে একান্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহারা নিজের নিজের হৃদয় লইয়াই বিব্রত, অপরের হৃদয়ের অবস্থা জানিবার বা বুঝিবার অবসর তাঁহাদের নাই।

সকলেই এক প্রাণে, ঐ ধ্বনির প্রতি কাণ পাতিয়া আছেন, এমন সময়ে আবার শব্দ হইল, না না, শব্দ নহে, করুণ রসের যেন সহস্রধারে আবার বৃষ্টি হইল,—"হা আর্য্যপুত্র! হা লক্ষ্মণ! কোথায় তোমরা? এই গহন অরণ্যে হতভাগিনী আমি আজ একাকিনী, নিরাশ্রয়া; প্রসববেদনায় আমার প্রাণ গতপ্রায়, আর ঐ দেখ, ভয়ঙ্কর, হিংস্র শ্বাপদগণ আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত,। আর্য্যপুত্র! লক্ষ্মণ! রক্ষা কর। অথবা আমার ন্যায় মন্দভাগিনীর জীবনে প্রয়োজন কি? ঐ সম্মুখে কুলদেবতা ভাগীরথী, উঁহার সুশীতল বক্ষই এ দগ্ধ-হৃদয়ার প্রকৃত বিশ্রাম স্থল, উঁহার বক্ষেই আত্মবিসর্জ্জন শ্রেয়ঃ।"—অতি কষ্টে, হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগ ও নয়নের গলিত-প্রায় অশ্রুর সংবরণ করিয়া, জনমণ্ডলী ঐ হৃদয়বিদারিণী বিলাপগাথা শ্রবণ করিলেন। গর্ভভরকাতরা প্রসববেদনা-বিধুরা রাজনন্দিনী সীতা বুঝি জাহ্নবী-জীবনে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত, এ আবার কি

অভিনয় !—ভাবিয়া, সামাজিকবৃন্দ এবার শুধু অবাক্ নহে, যার-পর-নাই বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। পাছে রামের কষ্টের বৃদ্ধি হয়, ভাবিয়া, লক্ষ্মণ এতক্ষণ কোন কথাই বলেন নাই। কিন্তু এখন আর পারিলেন না, অনুচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "হায় ! এ আবার কি ? কি দেখিতে আসিলাম, কি হইল ?" এদিকে ঐ নেপথ্য-ধ্বনির বিরাম-মাত্রেই সূত্রধার উচ্চতরস্বরে বলিল—

"বিশ্বম্ভরাত্মজা দেবী রাজ্ঞা ত্যক্তা মহাবনে।

প্রাপ্ত-প্রসবমাত্মানং গঙ্গাদেব্যাং বিমুঞ্চতি"।

'দেবী ধরিত্রীতনয়া রাজা কর্ত্তৃক গহনবনে পরিত্যক্ত হইয়াছেন। আজ তাঁহার প্রসববেদনা উপস্থিত, তাই দেবী তদায় অসহায় জীবন ভাগীরথী-বক্ষে বিসর্জ্জন দিলেন।'—বলিয়াই সূত্রধার ত্বরিতপদে প্রস্থান করিল। আর রামচন্দ্রও কম্পিতকণ্ঠে 'হা দেবি, হা জানকি ! লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ, রক্ষা কর'—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সমবেত জনগণ অনাথা সীতার, অযোধ্যার সাক্ষাৎ রাজলক্ষ্মী সীতার, শোচনীয় দশা দর্শনে একান্ত মর্ম্মাহত হইল, এবং তাহাদেরই প্রচারিত অলীক অপবাদের যে এই পরিণাম, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া লজ্জায়, ঘৃণায়, পশ্চাত্তাপে যেন মরিয়া গেল। তাহাদের সেই অপকর্ম্মের ফল যে এমন ভয়ঙ্কর হইবে, তাহা তাহারা স্বপ্নেও ভাবে নাই। যাহা হইবার হইয়াছে। এখন কি করিলে, এই ঘোর সর্ব্বনাশের প্রতিপ্রসব হয়, কি করিলে অযোধ্যার বিসর্জ্জিত প্রতিমার উদ্ধার হয়,—ভাবিতে ভাবিতে একান্ত অধীর হইয়া পড়িল। সমগ্র জনসংহতির মধ্যে কেমন

যেন একটা অস্বস্তির লক্ষণ, অসহ্য বেদনার ভাব প্রকাশ পাইল। আর অভিনয়ে প্রয়োজন নাই, যে অংশ প্রদর্শিত হইল, এখন ইহার কি উপায়,—নির্দ্ধারণ করিতে, আবালবৃদ্ধবনিতা—সকলেই নিভান্ত উন্মনা হইলেন।

মহাকবি শ্রীকণ্ঠ, কি অপূর্ব্ব কৌশলে রামসীতার পুনর্মিলন করিতে বসিয়াছেন। যাহাদের দোষে, যাহাদের নির্বুদ্ধিতায় এবং চপলতায় এই সর্ব্বনাশ, জগতে যাহা কেহ কখনও দেখে নাই, শুনে নাই, বা ভাবেও নাই, তাদৃশ সর্ব্বনাশের যাহারা মূল, তাহাদিগকে একত্র সমবেত করাইয়া, যে রাজা তাহাদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য এই নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই প্রজাবৎসল নৃপতিকেও সম্মুখে রাখিয়া, আর যিনি অগ্র-জের কালকূটবৎ শাসনে এই বিষম দুর্বিবপাকের সহায়তা করিয়াছিলেন, নির্দ্দোষ জানিয়াও দূষিতার ন্যায় সেই সরলা পতিপ্রাণাকে গহন অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই রামানুজ লক্ষ্মণকেও সেই অগ্রজ রামের পার্শ্বে বসাইয়া, কবিকুঞ্জর শ্রীকণ্ঠ এক অভিনব দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন। দুঃখিনী জানকীর প্রতি সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট এবং জানকীর দুঃখে দুঃখিত হইয়াছে। কি করিলে এ দুঃখের অবসান হয়, এই মহাভ্রমের সংশোধন হয়, এই ভাবনায় সকলেই অস্থির হইয়া-ছেন। সামাজিকগণের হৃদয় যেন নিজের মুষ্টির মধ্যে আনিয়া, কবিবর এই অদ্ভুত ও মর্ম্মস্পর্শী খেলা খেলিতেছেন। কবিসৃষ্টির ইহা চরম উৎকর্ষ। নির্ম্মাণদক্ষতার ইহা অপূর্ব্ব-কৌশল।

সকলেই যখন এই ভাবে অতল শোকসাগরে নিমগ্ন, মর্ম্ম-বেদনায় এক প্রকার হতচৈতন্য, সেই সময়ে অকস্মাৎ দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইল। অথবা দৃশ্যপট বলি কেন, কবিত্বের চরম আবরণ উন্মোচিত হইল। কিংবা প্রজাবৎসল, দারত্যাগী, দুর্ভাগ্য নরপতির জীবনাভিনয়ের শেষ দৃশ্য উত্তোলিত হইল। এতকাল যে যাতনা, যে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, তাহার চরম আবরণ সঙ্কুচিত হইল। আর ঐ সম্মুখে উষার অরুণ-রাগোদ্ভাসিত সস্মিত বদনের ন্যায়, নিদাঘ-দিবসের অবসানে সমীর-শীতলা গোধূলীর ছায়াময়ী মূর্ত্তির ন্যায়, শোকজীর্ণ সীতা-পতির অবশিষ্ট জীবনের এক নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত হইল। সকলেই স্থিরনেত্রে রঙ্গমঞ্চে দৃষ্টিযোজনা করিলেন,—করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে কেবল বিস্মিত নহে, সমবেত জন-মণ্ডলী একেবারে স্তম্ভিত হইলেন। লোকে বহুকাল তপস্যা করিয়া, জীবনব্যাপী কঠোরতা করিয়া, ধ্যানবলে যে দৃশ্যের শতাংশের একাংশও ধারণায় আনিতে পারে না, শরীরপাত করিয়াও যে দৃশ্যের দর্শন কল্পনা করিতে পারে না, সেই দৃশ্য সম্পূর্ণ অবস্থায়, দর্শকগণের সমক্ষে উপস্থিত। এ কি যথার্থই যাহা দেখিতেছি, তাহা, না কোনও অদ্ভুত ইন্দ্রজালের লীলা, এ কি প্রকৃতই সুখময়ী উষা, না ক্লেশ-বিভাবরীর প্রদোষ,—দর্শকগণ, নিশ্চিতরূপে কিছুই ধারণা করিতে পারিলেন না। আনন্দের সহিত বিস্ময় এবং প্রসন্নতার সহিত অবসন্নতা আসিয়া, তাঁহাদিগকে এক নূতন, অচিন্তিতপূর্ব্ব অবস্থায় উপনীত করিল।

তাঁহারা যোগমগ্ন তপস্বীর ন্যায় অনন্যমনে ও অনন্যনয়নে সেই নবীন দ্রষ্টব্যের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

অন্তর্ধান।

পট উত্তোলিত হইবামাত্রই, তিনটি রমণী, মর্ত্তের রমণী নহে, স্বর্গের রমণী, তিনটি দেবতা প্রবেশ করিলেন। দর্শকগণ দেখিলেন,—দেখিলেন, তাঁহাদের বহুকাল বিলুপ্ত দেবী জানকী উপস্থিত, আর তাঁ'র দুই পার্শ্বে দুইটি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবতা, তাঁহাদের একটি স্বয়ং ভূতধাত্রী পৃথিবী, অপরটি ত্রিলোকপাবনী জাহ্নবী, দুইদিক হইতে দুই জনে তাঁহারা বিশীর্ণ-কায়া জনক-তনয়াকে ধরিয়া আনিতেছেন, তাঁহাদের দুইজনের কণ্ঠে দুই বাহু স্থাপিত করিয়া ধীরে ধীরে সীতা আসিতেছেন। নয়নের অবিরল ধারায় দুঃখিনীর বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। সাক্ষাৎ ক্ষমা এবং শান্তি যেন আজ পৃথ্বী-ভাগীরথীর রূপ-পরিগ্রহ-পূর্ব্বক অশান্তি-ভুজগী-দষ্ট অযোধ্যাপতির হৃদয়ের জ্বালা নির্ব্বাণ করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের দুইজনের কোলে দুইটি সদ্যঃ-প্রসূত সন্তান, যেন ননীর পুত্তলি। এতক্ষণও রাম কোন প্রকারে স্থির ছিলেন, কিন্তু এই দৃশ্যে তাঁহার সে স্থিরতার সেতু ভগ্ন

হইল। তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। তিনি অপ্রবুদ্ধ-ভাবে লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া কহিলেন, 'ভাই, আমি যেন ক্রমে কেমন এক অবিজ্ঞাতপূর্ব্ব ও অহেতুক অন্ধতমসে প্রবেশ করিতেছি, অকস্মাৎ আমার এমন দশাবিপর্য্যয় ঘটিল কেন? লক্ষ্মণ! প্রাণাধিক! তোমার নিরাশ্রয় অগ্রজকে আশ্রয় দাও'—বলিতে বলিতে রাম যেন কেমন হতচেতনবৎ হইয়া পড়িলেন। এদিকে পৃথ্বী ভাগীরথী—উভয়ে যুগপৎ জানকীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"মা বৈদেহি! আশ্বস্ত হও, মঙ্গল মুহূর্ত্তে অমঙ্গলের রোদন কেন? এই দেখ, জলের মধ্যে তুমি দুইটি সুসন্তান প্রসব করিয়াছ, জানকি, আমরা বলিতেছি,—এই শিশুদ্বয় রঘুবংশের অবতংস স্বরূপ হইবে। সৌরকুল ইহাদের গুণ-গরিমায় উজ্জ্বল হইবে। সীতে! চিত্ত স্থির কর।"—লক্ষ্মণ আর থাকিতে পারিলেন না, সজলনয়নে রামের পায়ের উপর পড়িয়া কহিলেন,—'আর্য্য! রঘুকুলোত্তম! আজ পরম সৌভাগ্যের সময়ে আপনি অধীর হইলেন কেন? ঐ দেখুন, রঘুবংশের অঙ্কুর আপনার সমক্ষে উপনীত।' শোকবিমূঢ় রাম অনুজের কোন কথাই শুনিতে পাইলেন না। লক্ষ্মণ, অগ্রজের মোহ বুঝিতে পারিয়া, সরস নলিনী-পত্রে ব্যজন করিতে লাগিলেন। এ দিকে সীতা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন, পৃথ্বী-ভাগীরথীর দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, দুঃখিনীর সে উদাসীন ও কাতর দৃষ্টিতে সর্ব্বংসহা ধরিত্রীরও চিত্তবিপ্লব ঘটিল, হিমাদ্রিদুহিতা গঙ্গার হৃদয় করুণায়

ভরিয়া গেল। পৃথিবী সীতাকে কহিলেন 'মা! ইনি তোমার শ্বশুর কুলের পরম দেবতা ত্রৈলোক্যতারিণী ভাগীরথী।' সীতা অমনি প্রণাম করিলেন। ভাগীরথীও তৎক্ষণাৎ অভয়মিশ্রিত জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন— 'জানকি! স্বকীয় সচ্চরিত্রের দ্বারা, তুমি এতদিন যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ, আজ তাহার অনুত্তম ফল ভোগ কর, জগতে সতীর মাহাত্ম্য খ্যাপন কর; আমি তোমার কুলদেবতা গঙ্গা, তোমার দুঃখে না থাকিতে পারিয়া আসিয়াছি, আর একদিন আসিয়াছিলাম, তোমার পতিকুলের পরম-যোগী ভগীরথের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া, কত যুগযুগান্ত পূর্ব্বে আর একবার এমনি ভাবে আসিয়াছিলাম, আর মা, আজ আসিয়াছি, তোমার তপস্যায়, সতী তুমি যে মহাতপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছ, তাহাতে প্রীত হইয়া আজ আবার আসিয়াছি। আমাকেও চিনিলে, ইঁহাকেও প্রণাম কর, ইনি তোমার জননী বসুন্ধরা।' বিস্রস্ত-কুন্তলা আপাণ্ডুরমুখী সীতা বিষাদ-মলিন মুখখানি ঈষদুন্নত করিয়া জননী পৃথিবীর দিকে চাহিলেন, মাতৃদর্শন তাঁহার ভাগ্যে এই প্রথম। চাহিয়াই—তারকণ্ঠে 'মা' বলিয়া ডাকিলেন, সে ডাকে সমগ্র সদস্যমণ্ডলী চমকিয়া উঠিলেন, সমগ্র তপোবন, প্রতিধ্বনিত হইল। সে স্বরে আকাশ ভরিয়া গেল, সেই অসংখ্য সামাজিকের প্রাণে, যুগপৎ এক অনির্ব্বচনীয় উচ্ছ্বাস বহিল। পৃথিবীও অমনি 'মা' বলিয়া সীতাকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিতে আনিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অপত্য-স্নেহের এমনই প্রভাব যে, আজ বিশ্বম্ভরাও ব্যথিতচিত্তে অচেতন

হইলেন। দুরুচ্ছেদ সংসার-জালের মায়াময় তন্তু অতিক্রম করে, কা'র সাধ্য ?

মূর্চ্ছিতা পৃথিবীকে, জাহ্নবী আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন—'দেবি! তোমারও মোহ! তুমি বিশ্বের আধার, তোমাতে লৌকিক সুখদুঃখের সম্ভাব কি পূর্ব্বাপর সঙ্গত ?—অমনি ধরণীও সজলনয়নে বলিলেন—"জাহ্নবি! তুমি ত সকলই জান, সীতাকে প্রসব করিয়া আমি একটি দিনও সুখে কাটাইতে পারি নাই।—

"একশ্চিরং রাক্ষস-মধ্য-বাস—
স্ত্যাগো দ্বিতীয়শ্চ সুদুঃসহোঽস্যাঃ।"

সেই প্রথম দুঃখ—মার আমার দুরন্ত রাক্ষস-মধ্যে বসতি, তারপর দ্বিতীয় দুঃখ—সুদুঃসহ দুঃখ, বিনা দোষে জানকীর পরিত্যাগ। তুমিই বল দেখি, এই ঘোর অপকার্য্য কি রামের অনুরূপ হইয়াছে ?—

ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে বালেন পীড়িতঃ।
নাহং ন জনকো নাগ্নির্নানুবৃত্তির্নসন্ততিঃ॥

সেই বাল্যে হরধনুঃ ভঙ্গপূর্ব্বক, বালক রামের সীতার পাণি-পীড়ন, তাহা একবার রাম ভাবিল না, আমি ভূতধাত্রী পৃথিবী সীতার জননী, একথা রাম চিন্তা করিল না, সেই মহর্ষি জনক, সেই লঙ্কায় অগ্নিপরীক্ষা, সেই বনে বনে অনুগমন, তারপর, ভাগীরথি! বলিতে বুক ফাটিয়া যায়, সেই গর্ভস্থ সন্তান,—রাম একপদে সমস্ত বিস্মৃত হইল!"—বলিতে বলিতে সর্ব্বংসহা

অসহ্য বেদনার গুরুভারে একেবারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। দুঃখিনী রাজকুমারী সীতা 'হা আর্য্যপুত্র, আজ একে একে জীবনের সেই সব মনে পড়িতেছে'—বলিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে, পৃথিবী বিরক্তির সহিত কহিলেন, 'আবার ঐ নাম? কে তোমার আর্য্যপুত্র?'—সীতা অধোমুখী হইলেন। কন্যার প্রতি জামাতৃ কৃত অনাদর মায়ের প্রাণে কোন মতেই সহ্য হয় না। তাই মাতা ধরিত্রী দুহিতা সীতাকে সেই অনাদরপর রামের নামোচ্চারণে বাধা দিলেন। স্নেহের নিকটে দেবতা মানুষে, প্রবলে দুর্ব্বলে কোন ভেদ নাই। জ্ঞানী অজ্ঞান, মনুষ্য পশু,—যে কেহই ভাগীরথীর জলে অবগাহন করুক না কেন, তাহার যেমন প্রাণ জুড়াইয়া যায়, তদ্রূপ, স্নেহের মানস-সরোবরে যে অভিষেক করিবে, তাহারই মন অপার্থিব নির্বৃতিরসে আপ্লুত হইবে। স্নেহ, দেবাদেব-নির্ব্বিশেষে সকলকে সমান ভূমিতে আনয়ন করে, সকলকে সমান ভাবে বিভোর করে। তাই কবি দেখাইলেন যে, যিনি প্রকাণ্ড বিশ্বের বিপুল ভার অম্লানহৃদয়ে বহন করিতেছেন, অনন্ত ভূধর, অনন্ত বারিধি, অনন্ত ঝঞ্ঝা যাঁহার বক্ষের উপর নিয়ত বিদ্যমান, স্নেহের নিকটে তিনিও আজ পরাজিত, সংসারী জীবের ন্যায় আচ্ছন্ন। মায়ার এ বিচিত্র ইন্দ্রজালের হস্তে কাহারও নিস্তার নাই। কি সুন্দর ভাব! কি অনুপম কল্পনা! মনে বিরক্তির সহিত ক্রোধের উদ্রেকে, পৃথিবীর বদনমণ্ডল ও নয়নযুগল আরক্ত হইল, তিনি শ্বেতপ্রস্তররাশির ন্যায়

অটলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দর্শকমণ্ডলীর সকলেই প্রমাদ গণিলেন। আবার কি নূতন অনর্থের উৎপত্তি হয়, ভাবিয়া, সকলেই একান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। এ দিকে লক্ষ্মণ মনে মনে বিষম বিপদের আশঙ্কা করিলেন। দেবীর দেবী পৃথিবীর ক্রোধে, নিমেষে বিশ্ব বিধ্বস্ত হইতে পারে, কপিল-তেজে সগরসন্ততিবৎ মুহূর্ত্তে সূর্য্যবংশ আবার ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে, রামের,—তাঁহার প্রত্যক্ষ দেবতার কত অমঙ্গল ঘটিতে পারে,—ভাবিয়া, কোমল-হৃদয় কুমার সৌমিত্রীর প্রাণ একান্ত আকুল হইল। ভূতধাত্রীর সেই তেজস্বিনী মুখচ্ছবির দিকে আর কেহ চাহিতে পারিলেন না। সকলে সত্রাসে নয়ন পরাবর্ত্তন করিলেন। পৃথিবীর রোষে যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও রুষ্ট হইল। প্রলয়ের পূর্ব্বে প্রকৃতির ন্যায় বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ এক বিচিত্র গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিল।

সদয়-হৃদয়া লোকতারিণী জাহ্নবী, ধরিত্রীর ঐ ক্রোধের পরিণাম ও তাহার গুরুত্ব স্মরণ করিয়া, ব্যগ্র-কণ্ঠে কহিলেন,—'ভগবতি বসুন্ধরে! সংসারের তুমি শরীরকল্পা, যখন যে স্থানে যাহা ঘটে, দেবি, তোমার ত কিছুই অবিদিত থাকে না। তবে কেন আজ অজ্ঞাতবৃত্তান্তার ন্যায়, পুত্রোপম জামাতার উপর কুপিত হইতেছ?—ধরিত্রি! তুমি ত জান যে—

"ঘোরং লোকে বিততমযশো যা চ বহ্নৌ বিশুদ্ধিঃ
লঙ্কাদ্বীপে কথমিব জনস্তামিহ শ্রদ্দধাতু।"
ইক্ষ্বাকূণাং কুলধনমিদং যৎ সমারাধনীয়ঃ
কৃৎস্নো লোকস্তদতিবিষমং কিং স বৎসঃ করোতু॥

কি ঘোর অপযশে অকলঙ্ক সৌরকুল কলঙ্কিত হইতেছিল। সুদূর লঙ্কানগরীর সেই অগ্নিবিশুদ্ধিতে, তোমার আমার ন্যায় যাঁহারা, তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইতে পারেন, কিন্তু অত্রত্য প্রাকৃত ব্যক্তিদের সন্দেহ তাহাতে মিটিবে কেন? রাজ্যের আবালবৃদ্ধ-বনিতা—সকলের মনোরঞ্জন করা ইক্ষ্বাকু নৃপতিগণের চিরকুল-ব্রত, এ ব্রতের যথাযথ প্রতিপালন বড়ই দুঃসাধ্য, সুতরাং কল্যাণাস্পদ রামের অপরাধ কি? পৃথ্বি! সমস্ত বিষয়টি একবার নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা কর দেখি, বুঝিবে, রাম অপরাধী না নিরপরাধ।" ভাগীরথীর এই বচনলহরী সঞ্জাতরোষা বসুধাকে যেন সুশীতল করিল। তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। আর এ দিকে, আকুল লক্ষ্মণও তদীয় কুলদেবতা গঙ্গাকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিলেন। রাম একপ্রকার পাষাণ হইয়া গিয়াছেন। যত অসহ্যই আপতিত হউক না কেন, সীতা-বিসর্জ্জক তাহা এখন সহ্য করিতে সমর্থ। ত্রিপথগার উদ্দেশে তিনিও কহিলেন,—'মা! ভগীরথের বংশে তোমার অনুগ্রহ চিরদিনই সমান।'

ভাগীরথীর কথার উত্তরে ধরণী বলিলেন,—'গঙ্গে! ঠিক বলিয়াছ। সীতার প্রতি রামের যে কি স্নেহ, কত প্রীতি, তাহা কি জানি না? রাম, নিরপরাধা সীতাকে হঠাৎ পরিত্যাগ করিয়া, যেভাবে দিনযাপন করিতেছে, তাহা আমার অবিদিত নহে। আপাত-দুঃসহ শোকাবেগে আমার চিত্তবিকৃতি ঘটিয়াছিল, নতুবা দেবি! রাম আমার ক্রোধের পাত্র নহে, পরম স্নেহের পাত্র।'

পৃথ্বী-ভাগীরথীতে যখন এই প্রকারে কত কথা হইতেছিল, তখন প্রসবকাতরা সীতা অবসন্নদেহে ভাগীরথীর অঙ্গে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছিলেন। বসুন্ধরার কথা শেষ হইলে সজল-নয়না সীতা যুক্তকরে কহিলেন—'মা! আর পারি না, তোমার অঙ্গে এ হতভাগিনীকে স্থান দাও।'—ভাগীরথী বাধা দিয়া বলিলেন, 'ছি! মা জানকি! অমন কথা বলিতে নাই। আশীর্ব্বাদ করি, সহস্র বৎসর তোমার পরমায়ু হউক।'—সীতা কান্দিতে লাগিলেন। দুঃখিনীর দুঃখের যদি কথঞ্চিৎ উপশম হয়, ভাবিয়া, জননী ভূতধাত্রী নবকুমারযুগলকে সম্মুখে ধরিয়া কহিলেন,—'সীতে! তোমার পুত্রদ্বয়ের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর।' পৃথিবীর এই কথায় রাজার নন্দিনী রাজার মহিষী সীতাব দুঃখবেগ সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইল। যাহাদের জন্মে রাজ্যে অথবা শুধু স্বরাজ্যে কেন—সমগ্র পৃথিবীতে আনন্দের প্রবাহ, উৎসবের লহরী রহিত, তাহাদের কি না এই দশা!—সীতার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—'মা! আমার ন্যায় অনাথার এ রত্নে প্রয়োজন কি!' দর্শকবৃন্দ এ দৃশ্য আর দেখিতে পারিলেন না, বা এতাদৃশী বিষাদবর্ষিণী উক্তি আর শ্রবণ করিতে পারিলেন না। মর্ম্মবেদনায় একান্ত অধীর হইয়া, অধোবদনে, তাঁহারা রোদন করিতে লাগিলেন। বিষণ্ণতা, করুণা, বিরহব্যথা, এই ত্রিতয় যেন আজ জানকী-মূর্ত্তিতে উপনীত। সভাসদ্‌গণ এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব অসহ্য যাতনায় একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

তাঁহাদের সকলেরই মনে হইল যে, আর না, যথেষ্ট হইয়াছে, অলীক অপবাদের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে। দেবী জানকীর এই দুঃখের প্রকৃত কারণ তাঁহারা। তাঁহারাই অবুদ্ধি-পূর্ব্বক যে পরীবাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, জলতরঙ্গে তৈলবিন্দু-বৎ, সেই অপবাদ সহস্রমূর্ত্তিতে কত সহস্র সহস্র মুখে প্রচারিত হইয়াছিল, আর তাহারই ফলে, সীতার,—অযোধ্যার অধীশ্বরীর আজ এই শোচনীয় পরিণাম! যাঁহার বিন্দুমাত্র সলিলস্পর্শে নিখিল কলুষের ধ্বংস হয়, যাঁহার নাম-স্মরণে বিষ্ণুলোকে গতি হয়, যাঁহার লহরী-দর্শনে ভবযন্ত্রণার বিরাম হয়, কত মহা মহা তপস্বী যাঁহার চরণে প্রার্থনা করিয়াছেন যে,—

"ত্বত্তীরে বসতস্তদম্বু পিবতস্তদ্‌বীচিষূৎপ্রেঙ্‌ক্ষতঃ
ত্বন্নাম স্মরতস্তদর্পিত-দৃশঃ স্যান্ মে শরীরব্যয়ঃ"[১]

সেই বিষ্ণুপাদোদ্ভবা, হরশিরোবিলাসিনী স্বয়ং জাহ্নবী যখন সীতার পবিত্রচরিত্রের শতমুখে স্তুতি করিতেছেন, পৃথিবীর সহিত সমস্বরে কহিতেছেন—

জগন্মঙ্গলমাত্মানং কথং ত্বমবমন্যসে?
আবয়োরপি যৎ-সঙ্গাৎ পবিত্রত্বং প্রকৃষ্যতে।[২]

১—"কখন তোমার তীরে বসিয়া, কখন তোমার পবিত্র বারি পান করিয়া, আবার কখন বা মা, তোমার তরঙ্গে তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া, তোমার নাম স্মরণ করিতে করিতে, তোমারই দিকে চাহিতে চাহিতে যেন আমার দেহপাত হয়।"

২—তোমার আত্মা জগতের মঙ্গলস্বরূপ, তোমার সংসর্গে আমি ভাগীরথী, আর ঐ তোমার জননী বসুন্ধরা পর্য্যন্ত আজ পবিত্র, কেন তবে আত্মগ্লানি করিতেছ?

তখন আর দ্বিধা কেন? অযোধ্যার শান্তি-প্রতিমা অযোধ্যায় ফিরিয়া চলুন। প্রজাবৃন্দ একবাক্যে সেই নারীকুল-দেবতা পতিব্রতার চরণে আত্মকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিবে। আর এ দিকে রাম—প্রজারঞ্জন রাম হৃদয়কে বজ্রময় করিয়া এই শোকের চিত্র দেখিতেছেন। পৃথ্বী এবং ভাগীরথী যখন মুক্ত-কণ্ঠে কহিলেন,—'মা জানকি! আত্মগ্লানি করিও না, তোমার সংসর্গে আজ আমাদেরও পবিত্রতা বৃদ্ধি পাইল, তোমার স্পর্শে আজ আমরাও ধন্য হইলাম,' তখন কুমার লক্ষ্মণ সজলনয়নে রামকে বলিলেন—'আর্য্য, প্রজানাথ! শ্রবণ করুন।' সীতা-বৎসল রামও অমনি কহিলেন—"লোকে শ্রবণ করুক।"– কি বিচিত্র ভাববিন্যাস! রাম যে সীতাকে কি চক্ষে দেখিতেন, হৃদয়-মন্দিরের কোন্ স্থানে বসাইয়া সীতাকে পূজা করিতেন, তাহার আর অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই, এই উক্তিই যথেষ্ট। লোকে ক্ষমা করিল না, রামের জীবনের সুখ, সুখের স্বপ্ন, লোকে সহিতে পারিল না, তাই লোকের অনুরোধে লোকনাথ তাঁহার জীবনের জীবনকে পরিত্যাগ করিয়াছেন,—অবিশ্বাস বা অবহেলা এ পরিত্যাগের কারণ নহে, এ পরিত্যাগের কারণ লোক, সুতরাং সীতার চারিত্র-মাহাত্ম্য শ্রবণ রামের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন; যাহারা সে মাহাত্ম্য হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে নাই, আর পারে নাই বলিয়াই এই অপ্রতিকার্য্য সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া বসিয়াছে, আজ জাহ্নবী এবং পৃথ্বীর মুখে, সীতার পবিত্রতার খ্যাপন তাহারাই শ্রবণ করুক।

সমগ্র সামাজিকগণের চিত্ত যখন এইরূপ নানাচিন্তায়, অসহ্য পশ্চাত্তাপে অবসন্ন, রাম লক্ষ্মণ যখন এই ভাবে একান্ত কাতর, সেই সময়ে পৃথিবী কহিলেন,—'মা জানকি! এস, এ পাপ-তাপ-পূর্ণ মর্ত্তভূমি তোমার ন্যায় দেবীর আবাসযোগ্য নহে, এস, রসাতলে এস, তোমার স্পর্শে পাতাল-ভবন পবিত্র হইবে।' মলিন মুখী আজন্মদুঃখিনী রঘুকুল লক্ষ্মীও 'মা! তোমার অঙ্গে স্থান দাও, সংসারের এ যাতনা আর সহ্য করিতে পারি না'—বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে ধরণীর বক্ষে মুখ লুকাইলেন,—যেমন আসিয়াছিলেন, সেই ভাবে পৃথ্বী-ভাগীরথী পতিদেবতা সীতাকে লইয়া অন্তর্হিত হইলেন। এ দৃশ্যে দর্শকগণের অনেকে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন, কেহ অচেতন হইয়া পড়িলেন, কেহ বা শরাহত হরিণের মত ছটফট করিতে লাগিলেন। আর রাম,—সীতার ন্যায় দেবীর দেবী ভার্য্যা বলিয়া যিনি জীবনকে ধন্য মনে করেন, সেই সীতাপতি রাম 'হা চারিত্র-দেবতে! শেষে তোমার এই পরিণাম হইল, এ বিরাট পৃথিবীতেও একটু স্থান হইল না। রঘুকুল-রাজলক্ষ্মি! দেবযজনসম্ভবে! সেই তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল, ইহা দেখিতেই কি আজ বাল্মীকির তপোবনে আসিয়াছিলাম'—বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। লক্ষ্মণ কান্দিতে কান্দিতে উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—'ভগবন্ বাল্মীকে! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, আপনারি প্রণীত কাব্যের কি এই চরম ফল। এই দৃশ্য প্রদর্শন করিবার জন্যই কি আজ স্বর্গমর্ত্ত রসাতলের একত্র সমাবেশ!'

দর্শকমণ্ডলীর সবেদন হৃদয়, কুমার লক্ষ্মণের আর্ত্তনাদে আরও কাতর হইল। অনেকে আসিয়া কুমারকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। ভাগীরথীতটে, বাল্মীকির পুণ্যময় শান্তিপূর্ণ তপোবনের অনতি দূরে, এই দৃশ্যে বিষাদের যে প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইল, সমগ্র পৃথিবী তাহাতে যেন ভাসিয়া গেল। শমগুণপ্রধান তপোবন অতল শোকসাগরে নিমগ্ন হইল। করুণার অধিদেবতা যেন নিষ্করুণ পৃথিবী হইতে ঐ পৃথ্বী-ভাগীরথীর সহিত চলিয়া গেলেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

আনন্দ-প্রতিমা।

সীতার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে রাম মূর্চ্ছিত, লক্ষ্মণ ভূপৃষ্ঠে অবলুণ্ঠিত, আর দর্শকমণ্ডলী উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে বজ্রাহত-প্রায় হইয়াছেন। গঙ্গা এবং পৃথিবীর সহিত অযোধ্যার সৌভাগ্য-লক্ষ্মী যে পথে অন্তর্হিত হইয়াছেন, সেই পথের দিকে সামাজিকগণের নয়ন প্রহিত. সে নয়নে স্পন্দন নাই, সে নয়ন বাহ্যজগতের কোনও বস্তু যেন দেখিতেই পাইতেছে না। এমন সময়ে, অকস্মাৎ আবার দৃশ্যপট অপসৃত হইল। বীণা মুরজাদির সে করুণ-রস-বাহিনী নিক্কণ-লহরী বিরত হইল। জলদগম্ভীর স্বরে আবার কোন অদৃশ্য পুরুষ কহিলেন—'হে স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতগ্রাম! হে প্রাণধারী মর্ত্ত্যগণ! নিবিষ্ট-নয়নে দর্শন কর, ভগবান্ বাল্মীকির অনুজ্ঞামতে এক পরম পবিত্র ও অভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য উপনীত প্রায়।' অবসন্ন লক্ষ্মণ ক্ষিপ্রভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সামাজিকগণ চমকিয়া উঠিলেন। আবার কি আশ্চর্য্য? যাহা দেখিয়াছি, তদপেক্ষা আশ্চর্য্যতর আর কি হইতে পারে?—ভাবিয়া সকলেই সেই দিকে চাহিলেন,—যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রাণ যথার্থই ভরিয়া গেল। নয়ন সার্থক হইল। তেমন শান্তি-ময় দৃশ্য, তেমন সুখপূর্ণ স্বপ্ন তাঁহারা জীবনে আর দেখেন নাই।

তাঁহারা দেখিলেন,—নিম্নে পুরোবর্ত্তিনী কলবাহিনী জাহ্নবীর বক্ষে প্রবল তরঙ্গ উঠিয়াছে, আর ঊর্দ্ধে দেবর্ষিবৃন্দ আসিয়া অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়াছেন,—তরঙ্গিণী ভাগীরথীর বক্ষে এক-খানি কনকের রথ তরঙ্গে তরঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া রঙ্গমঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সে রথের মধ্যভাগে আর্য্যা জানকী উপবিষ্টা, আর তাঁহার দুইপার্শ্বে স্বর্ণকিরীটিনী বসুন্ধরা ও গঙ্গা সহাস্য বদনে আসীনা। দর্শকবৃন্দের মন, প্রাণ, নয়ন,—সমস্ত একপদে জুড়াইয়া গেল। দর্শকগণ, কুলকুল-গায়িকা নয়ন-রঞ্জিকা গোদাবরীর তটে, বিহগকূজন-মধুর, স্নিগ্ধশ্যামল পঞ্চবটী বনে, তাপসী আত্রেয়ী, বনদেবতা বাসন্তী ও শান্তমূর্ত্তি তমসা-মুরলার ছবি দেখিয়াছেন, দর্শকগণ, মৃদুগামিনী বীচিহাসিনী সরযূর তটে ইন্দ্রেব অমরাবতীসদৃশী সমৃদ্ধিশালিনী অযোধ্যা-নগরীর কত অতুল সম্পদ্ দর্শন করিয়াছেন, প্রজারঞ্জন রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের সেই হিরণ্ময়ী প্রতিমা দেখিয়াছেন, কিন্তু কৈ ? এমন আনন্দ, এত তৃপ্তি ত কখন কিছুতেই পান নাই। সোণার রথ দুর্লভ নহে, কিন্তু আজ সেই রথের যিনি অধিষ্ঠাত্রী, তাঁহাকে যে আবার দেখিতে পাইবেন, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। প্রকৃতির প্রসাদে, তরুশাখায় কত সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে, সুন্দর সুন্দর পল্লব জন্মে, বাতাসের সহিত কত খেলা খেলিয়া, তাহারা দর্শকের চিত্তবিনোদন করে, কিন্তু সেই ফুল, একবার ছিন্ন বা দলিত করার পর, কে তাহাকে আবার পূর্ব্বভাবে দেখিতে সমর্থ হয়, বা দেখিতে

পায়? বৃন্তচ্যুত কুসুম ক্রমে পৃথিবীর ধূলিতে মিশিয়া যায়, আর তা'র সৌরভ বাতাসে মিলাইয়া যায়। জানকীরূপ ফুল্ল-শতদলকে অযোধ্যার নির্দ্দয় জনগণ বিদলিত করিয়াছিল, আজ যে আবার এইভাবে সেই নন্দনের পারিজাতকে দেখিতে পাইবে, ইহা তাহারা স্বপ্নেও ভাবে নাই। তাই অনিমেষনেত্রে, সকলে ঐ আগতপ্রায় সোণার রথের দিকে চাহিয়া আছে। এমন সময়ে নেপথ্য হইতে জলদগম্ভীর কণ্ঠে কে যেন কহিলেন:—

অরুন্ধতি! জগদ্বন্দ্যে গঙ্গাপৃথ্ব্যৌ ভজস্ব নৌ।
অর্পিতেয়ং তবাভ্যাসে সীতা পুণ্যব্রতা বধূঃ॥

"দেবি অরুন্ধতি! আমরা জগদারাধ্যা ভাগীরথী এবং পৃথিবী উপস্থিত, আমাদিগকে ভজনা কর। তোমার হস্তে এই তোমাদের কুলবধূ পুণ্যশীলা সীতাকে অর্পণ করিলাম।"—নেপথ্যের এই মঙ্গলধ্বনি সমগ্র সভামণ্ডপে প্রতিধ্বনিত হইয়া, সেই অসংখ্য জনগণের কর্ণে যেন অমৃতবর্ষণ করিল। লক্ষ্মণ কাণ পাতিয়া শুনিলেন। ঐ ধ্বনি বাতাসে যেন শতগুণ হইয়া, ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল; এখনও উহার সম্পূর্ণ লোপ হয় নাই, নিশীথ-বীণা-ধ্বনিবৎ এখনও উহার শেষ তান, শেষ ঝঙ্কার, কাণে মধুধারা ঢালিতেছে। এমনই সময়ে, আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি কুমার লক্ষ্মণ রামের মুখের দিকে চাহিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন,—"আর্য্য, দেখুন দেখুন, পরম আশ্চর্য্য উপস্থিত!"—কে দেখিবেন? রাম ত মূর্চ্ছিত। 'হায়, আর্য্য এখনও সংজ্ঞালাভ করিলেন না,'—বলিয়া লক্ষ্মণ অতিশয়

কাতর হইয়া পড়িলেন। যাঁহাকে দেখাইবার জন্য লক্ষ্মণের এত আগ্রহ, তাঁহার মূর্চ্ছা এখনও ভাঙ্গিল না, যাঁহার জন্য মূর্চ্ছা, এত কষ্ট, সেই লোকপাবনী জানকী ঐ উপস্থিত, আর রাম তাহা দেখিলেন না,—ভাবিয়া লক্ষ্মণ অবনত-মস্তকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নিমেষের মধ্যে তাঁহার হৃদয়ের সকল উৎসাহ বিলুপ্ত হইল। রাম মূর্চ্ছিত, এখনও মূর্চ্ছিত, মহা বিপদের সংবাদ। তাই মুহূর্ত্তমধ্যে এই অশুভ বার্ত্তা বিস্তৃত সভাস্থলের সহস্রকর্ণে প্রবেশ করিল। অযোধ্যাপতির জন্য সকলেই একান্ত উন্মনা হইয়া উঠিলেন। পরস্পর, সাশঙ্ক-হৃদয়ে, এ উহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। যখন সভামণ্ডপের মধ্যে এই প্রকারে একটা উৎকট উৎকণ্ঠার খরস্রোত, তাড়িত প্রবাহের ন্যায়, সর্ব্বত্র বহিতেছিল, সকলের চিত্তকেই এক অবস্থায় আবিষ্ট করিতেছিল, সেই সময়ে, সৌরকুলের আদিগুরু বশিষ্ঠের সহ-ধর্ম্মিণী, দেবী অরুন্ধতী জানকীকে লইয়া সকলের সমক্ষে উপনীত হইলেন। হইয়াই স্নেহপূর্ণকণ্ঠে দেবী অরুন্ধতী কহিলেন,—“মা জানকি! এখন তোমার লজ্জার সময় নহে, এস, তোমার সুখস্পর্শ করে আমার প্রাণাধিক রামকে উজ্জী-বিত কর।” একটি কথাও না বলিয়া, স্বপ্নদৃষ্ট প্রতিমার ন্যায় রঘুকুল-লক্ষ্মী সীতা সসম্ভ্রমে যাইয়া মূর্চ্ছিত হৃদয়েশ্বরকে স্পর্শ করিলেন এবং অনুচ্চকণ্ঠে কহিলেন—“আর্য্যপুত্র! আশ্বস্ত হউন।” রাম নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক, অতিশয়িত হর্ষনির্ভরে যেন

কেমন উদ্ভ্রান্ত হইয়া, চারিদিকে চাহিলেন,—দেখিলেন, পতিত-পাবনী গঙ্গা, ভগবতী ভূতধাত্রী, দেবী অরুন্ধতী, ভগবান্ ঋষ্য-শৃঙ্গ, কুলগুরু বশিষ্ঠ এবং অপরাপর সমস্ত গুরুজনবর্গ একত্র সমবেত। দেখিলেন,—তাঁহার জীবনের সুখ, সুখের তন্দ্রা, শান্তিপ্রতিমা সীতা সম্মুখে দণ্ডায়মানা। দেখিলেন,—সতীত্বের বিমলপ্রভায়, পাতিব্রত্যের উজ্জ্বল আলোকে, শীর্ণকলেবরা জানকীর মুখের কি অপূর্ব্ব শ্রীই না জন্মিয়াছে! দেখিলেন,—জন্মাবধি রাম যে রূপ দেখিয়া, যে রূপের ধ্যান করিয়া, নয়নের তৃপ্তি জন্মাইতে পারেন নাই, লক্ষ লক্ষ জন্ম যে রূপ দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহার সেই নয়নের দীপ্তি, হৃদয়ের তৃপ্তি, রূপতরঙ্গিণী জ্যোতিষ্মতী আনন্দপ্রতিমা সীতা, তাঁহারই দিকে চাহিয়া আলেখ্যলিখিতার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। রাম, আনন্দে, মোহে, আশ্চর্য্যে, যেন কেমন হইয়া পড়িলেন। রামের তদানীন্তন হৃদয়াবস্থার প্রকৃত-স্বরূপ-বর্ণন ভাষায় করা যায় না, যাঁহারা সহৃদয়, সে অবস্থা তাঁহারা অনুভবের সাহায্যে কতক বুঝিতে পারিবেন, তাই ভাবুক কবি সে বিষয়ে বিরত হইয়াছেন।

রাম যখন ঐ প্রকারে, স্বপ্নোত্থিতের ন্যায়, বিস্মিতের ন্যায়, মন্ত্রবিমূঢ়ের ন্যায়, একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, সেই সময়ে, দেবী অরুন্ধতী কহিলেন—'রাম! ইনি তোমার পুরুষপরম্পরার কুলদেবতা ভাগীরথী, প্রসন্ন হইয়া তোমাকে দর্শন দিতে আসিয়াছেন।' অমনি ভাগীরথীও স্নেহবর্ষিকণ্ঠে কহিলেন—

"জগৎপতি রামচন্দ্র! মনে পড়ে কি সেই কথা? সেই যে তুমি সাধ্বী জানকীকে লইয়া লক্ষ্মণ-প্রদর্শিত আলেখ্য দর্শন করিতে করিতে আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলে, 'মা ভাগীরথি! অরুন্ধতীর ন্যায় তুমিও তোমার এই কুলবধূ সীতার মঙ্গলানুষ্ঠানে নিয়ত রত থাকিও'—সে কথার স্মরণ হয় কি? রঘুকুলোত্তম! সীতাপতে! অযোধ্যার ঈশ্বর! আজ তোমার সে ঋণ শোধ করিলাম।" ভাগীরথীর এই সুবিশুদ্ধ উক্তিতে, এই প্রসন্নগম্ভীর বচন-বিন্যাসে সেই বিরাট সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত হইল। সকলেরই হৃদয়ে যেন কেমন একটা আনন্দের বিদ্যুৎ চকিতে বহিয়া গেল। অরুন্ধতী আবার কহিলেন—"রাম! ইনি তোমার শ্বশ্রূ, পরমদেবতা পৃথিবী।" পৃথিবী অমনি রামের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বৎস! যখন মোহবশে, তুমি নিদ্রিতা সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া যাও, মনে করিয়া দেখ, তখন বলিয়াছিলে,—'দেবি বসুন্ধরে! তোমার পাপলেশশূন্য দুহিতা জানকীর 'আমার' বলিতে কেহ রহিল না, তুমি ইঁহাকে রক্ষা করিও।' রাম! তুমি ধরণীর অধীশ্বর, সম্পর্কে আমার স্নেহাস্পদ হইলেও, কার্য্যগৌরবে তুমি আমার শাসনকর্ত্তা, তোমার যাহা অনুরোধ, আমার পক্ষে তাহা আদেশ, রঘুকুলোত্তম! এতদিনে তোমার সে আদেশ প্রতিপালিত হইল, আমি বাঁচিলাম।" অপরাধী রাম অবনত-মস্তকে পৃথ্বী-ভাগীরথীকে প্রণাম করিলেন। রামের মস্তক উত্তোলনের পূর্ব্বেই, দেবী অরুন্ধতী, সসাগরা ধরণীর অধীশ্বরের

যথার্থ কুলদেবতার ন্যায়, স্নেহামৃতবর্ষী নয়নে সমগ্র সভাস্থল একবার অবলোকন করিয়া, ভারস্বরে কহিলেন—"হে নিখিল জনগণ! হে সূর্য্যকুলের চিরানুগত প্রজাপুঞ্জ! এই দেখ, স্বয়ং ভাগীরথী এবং পৃথিবী যাঁহার পবিত্র চরিত্রের শত-মুখে প্রশংসা করিয়া, আমার হস্তে অর্পণ করিলেন, এই সেই পুণ্যশীলা, পতিদেবতা সীতা। তোমরা শুনিয়াছ, একদিন ত্রিলোকপাবন বৈশ্বানর স্বয়ং সশরীরে অবতীর্ণ হইয়া, ইঁহার পুণ্যময় চরিত্রের কত স্তুতি করিয়াছিলেন, সাক্ষাৎ প্রজাপতি অপরাপর দেবগণের সহিত সমাগত হইয়া, ইনি যে পাপলেশ-বিমুক্তা, একথা চতুর্ম্মুখে খ্যাপন করিয়াছিলেন। এই সেই সবিতার কুলবধূ, জনকের দুহিতা, দেবযজনসম্ভবা, দেবী সীতা, আজ আমরা ইঁহার পুনর্গ্রহণ করিব। তোমাদের যদি কিছু বক্তব্য থাকে, অসঙ্কোচে বিবৃত কর।" অরুন্ধতীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই আকাশ হইতে অজস্রধারে কুসুমবৃষ্টি হইল। সপ্তর্ষিগণ, লোকপালগণ, কুসুমবর্ষণচ্ছলে সীতার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করিলেন। সমবেত সভ্যমণ্ডলী ভূতলে মস্তক সংলগ্ন করিয়া, অযোধ্যার অপাপবিদ্ধা রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে যখন সকলে মস্তক উত্তোলন করিলেন, তখন মনে হইল, যেন কত দিনের, কত কালের, কত সহস্র সহস্র বৎসরের একটা গুরুভার, হৃদয়ের একটা উৎকট বেদনা আজ তিরোহিত হইল। তাঁহারা না বুঝিয়া, প্রাকৃত বুদ্ধির বশে যে ঘোর অন্যায় করিয়া বসিয়াছিলেন, মহা পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন,

এতদিনে যেন তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল। তাঁহাদের মনের একটা বিষম বিকার কাটিয়া গেল, চিত্ত লঘু হইল।

অরুন্ধতী আবার কহিলেন,—'জগৎপতে রামভদ্র!

"নিযোজয় যথাধর্ম্মং প্রিয়াং ত্বং ধর্ম্মচারিণীং।
হিরণ্ময্যাঃ প্রতিকৃতেঃ পুণ্যপ্রকৃতিমধ্বরে॥"

তোমার ধর্ম্মচারিণী প্রিয়তমা জানকীকে, ধর্ম্মকার্য্যে সহায় কর, যাঁহার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ করিবে, ভাবিয়াছিলে,—রাম,—এই সেই পুণ্য-প্রকৃতি সীতা, ইঁহাকে গ্রহণ কর।' 'যে আজ্ঞা' বলিয়া রাম সীতার কর-গ্রহণ করিলেন। এখানে রামের মুখে অধিক কথা ভাব-বিরোধিনী, তাই কবি, অতি সংযতহস্তে রাম-চিত্রের অঙ্গ সুসম্পূর্ণ করিলেন। প্রসন্নবদন লক্ষ্মণ আসিয়া "আর্য্যে! নিলর্জ্জ লক্ষ্মণের প্রণাম গ্রহণ করুন" বলিয়া সীতা-চরণে প্রণত হইলেন। তখন অরুন্ধতী আবার কহিলেন,—'ভগবন্ বাল্মীকে, সীতাকুমার কুশ এবং লবকে একবার আনুন, পিতার পুত্র পিতার করে অর্পণ করি, গচ্ছিত ধন আর রাখা কেন?"—বলিতে বলিতে ত্বরিতচরণে সূর্য্যকুলহিতৈষিণী দেবী অরুন্ধতী চলিয়া গেলেন। রাম, লক্ষ্মণ—উভয়েই নীরব, নিঃস্পন্দ, একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছেন। পুত্রের নাম-শ্রবণে সাশ্রু-নয়না জননী সীতার প্রাণে পুত্রমুখদর্শনের উৎকণ্ঠা জন্মিল।

সমগ্র সভামণ্ডপ সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে প্রতিধ্বনিত করিয়া, অরুন্ধতী যখন সীতার কথা কহিতেছিলেন,—সীতার গুণ

কীর্ত্তন করিতেছিলেন,—তখন সভামণ্ডপে এমন একজনও ছিলেন না, যিনি, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায়, আনন্দ-হৃত-সংজ্ঞের ন্যায় হইয়া না পড়িয়াছিলেন।—এ কি স্বপ্ন না সত্য, নিদ্রা না জাগরণ, সুখ না মোহ, প্রলয় না বিলয়,—কেহই কিছু স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। দেবতার চিন্তায় মন প্রসন্ন হয়, পবিত্র হয়, চিত্তে অতুল শান্তির উদয় হয়, আজ সেই দেবতাকে—যাঁহাকে এতদিন যাবৎ সকলে সর্ব্বদা একমনে ধ্যান করিয়াছেন, যাঁহাকে জীবনে কখন আর দেখিতে পাইবেন না, ভাবিয়া, পৌরজানপদগণ ক্ষণে ক্ষণে বিষাদের সূচিভেদ্য অন্ধতমসে নিমগ্ন হইয়াছেন, যাঁহাকে, যখন সুদিন ছিল, তখন অর্চ্চনা করিতে পারেন নাই, বরং হেলায় হারাইয়াছেন,—রাজ্যের সেই চিরকল্যাণময়ী, সেই মূর্ত্তিমতী দেবতা জানকীকে দেখিয়া সভ্যগণ যেন জীবন্মুক্ত হইলেন। জীবনে যাহা কখনও অনুভূত হয় নাই, সেই অতুল আনন্দে সকলে যুগপৎ বিহ্বল হইলেন। নারীকুল-দেবতা পূতপ্রকৃতি সীতা ঐ সম্মুখে দণ্ডায়মানা,—আর সাধকরূপী জনগণ এক-দৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া তদীয় চরণের চতুষ্পার্শ্বে কৃতাঞ্জলি-পুটে উপবিষ্ট। সকলেই যেন নিরুচ্ছ্বাস—যেন জীবন্মুক্ত। কি সুন্দর চিত্র! শান্তির সহিত ভক্তির, পবিত্রতার সহিত প্রসন্নতার এমন মিলন আর কে কবে দেখিয়াছে। রাম-লক্ষ্মণ, গঙ্গা-পৃথ্বী, পৌর-জানপদ—সকলেই নির্ব্বাক্, যেন চিত্রিত। কোন অদৃশ্য-বর্ষিত অমৃতরসে সকলেই যেন অভিষিক্ত ও

আত্মবিস্মৃত। কি অনুপম কল্পনা! যখন সভামণ্ডপের এইরূপ অবস্থা, সেই সময়ে সাক্ষাৎ সূর্য্যস্বরূপ, তেজোদীপ্তদেহ, মহর্ষি বাল্মীকি দুই হস্তে কুশলবের দুইখানি হাত ধরিয়া উপস্থিত হইলেন। মূর্ত্তিমান্ সত্ত্বগুণ যেন সারল্য ও মাধুর্য্যের সহিত দেখা দিলেন। সভ্যগণ তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

সতীত্বের জয়।

মহর্ষি বাল্মীকি কুশলবের সহিত প্রবেশ করিয়াই কহিলেন—"প্রাণোপম কুশ-লব! ইনি তোমাদের পিতা রঘুনাথ, ইনি কনিষ্ঠ তাত লক্ষ্মণ, ইনি তোমাদের জননী সীতাদেবী, আর ইনি রাজর্ষি জনক, তোমাদের মাতামহ।" দুহিতা সীতা এতক্ষণ পিতা জনককে দেখেন নাই। সীতার নয়নপদ্ম স্বকীয় পাদমূলে নিহিত ছিল, ইতস্ততঃ সে নয়ন প্রহিত হয় নাই। এইক্ষণে বাল্মীকির কথায়, আনন্দ, করুণা এবং বিস্ময়ে যেন কেমন উদ্ভ্রান্ত হইয়া, সীতাদেবী তাঁহার দয়াময় পিতার দিকে চাহিলেন, দেখিলেন,—প্রভাতের চন্দ্রমণ্ডলবৎ, ঝটিকাবসানে দলিত-বিটপ বনস্পতিবৎ, মধ্যাহ্নকালের হীনজ্যোতিঃ উষবুর্ধবৎ, তুহিনমণ্ডিত হিমাদ্রিবৎ রাজর্ষি জনক অদূরে উপবিষ্ট

দেখিলেন,—অন্তরের যেন কোন প্রবল বেদনার শতবৃশ্চিক দংশনে, মহাযোগীর সে মহনীয় দেহজ্যোতিতেও ঈষৎ মালিন্য আসিয়াছে, সে প্রশান্তবদনে, সে দয়ার প্রস্রবণতুল্য নয়নে, আর সে পূর্ব্বের প্রসন্নতা নাই, বিষাদের হৃদয়শোষী কালিমায় তাহা বিবর্ণ। জীবন্মুক্ত সংসার-বিরক্ত রাজর্ষির সে অবস্থা দর্শন করিয়া, স্নেহময়ী দুহিতা সীতার নয়ন সন্ততবাহিনী অশ্রুধারায় আপ্লুত হইল। 'এই কি আমার সেই পিতা'—বলিয়া পুণ্যপ্রতিমা সীতা জনকের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। এদিকে সীতাপতি সহর্ষে কুশ-লবকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—'বৎসগণ! কত পুণ্যের ফলে তোমাদিগকে লাভ করিলাম।'—সীতা, আজন্মদুঃখিনী, রাক্ষস-হৃতা, নির্ব্বাসিতা, উপেক্ষিতা সীতাও বাষ্পকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, 'এস প্রাণাধিক কুশ-লব! তোমাদের পুনর্জীবিতা দুঃখিনী জানকীকে একবার আলিঙ্গন কর। নবকুমারগণ! আজ আমার নবজীবনপ্রাপ্তির দিন, এমন শুভদিনের মুখ যে আর দেখিব, স্বপ্নেও ভাবি নাই। এস, তোমাদের দুঃখিনী জননীর বক্ষঃ শীতল কর।" কুশ-লব তৎক্ষণাৎ, কোন কথা না কহিয়া, সেই চির-প্রার্থিত, শান্তিময়, স্নেহময়, সুখময় জননী-বক্ষে আসিয়া মুখ লুকাইলেন। সীতা অনেকক্ষণ গাঢ়ভাবে কুমারদ্বয়কে বক্ষে ধারণ করিয়া, পুত্রোৎসঙ্গবতী জননীর সুখ,—যে সুখের স্বরূপ জানকী পুত্রিণী হইয়াও আর কখন জানিতে পারেন নাই, যে সুখের তুলনায় পুত্রের মাতার নিকটে স্বর্গও প্রার্থিত নহে, সেই সুখ

উপভোগ করিলেন। আর কুশ-লব,—আজন্ম মাতৃস্নেহে বঞ্চিত, কঠোর তাপসধর্ম্মে দীক্ষিত, নবনীত-দেহ, রাজকুমার কুশ-লব সেই "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জননীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া, এক অনির্ব্বচনীয়, অমরদুর্লভ নির্বৃতিরসে নিমগ্ন হইতে হইতে যেন ঘুমাইয়া পড়িলেন। জলে যেমন তৃষ্ণার শান্তি, সমীরণে যেমন জীবনের শান্তি, চন্দ্রিকায় যেমন জগতের শান্তি, পুণ্যে যেমন হৃদয়ের শান্তি, জননীর বক্ষে তেমন পুত্রের শান্তি। সংসারে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, বন্ধু, স্বজন, সকলেই প্রতিদান চায়, পুত্রের নিকটে মাতার প্রতিদান স্পৃহা নাই। পুত্রের কল্যাণ, পুত্রের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ব্যতীত জননীর অন্য স্পৃহণীয় নাই। এই দুঃখতাপময় সংসার-শাহারায় যে মাতৃস্নেহে বঞ্চিত, তাহার জীবনে ধিক্, সে অধন্য। সংসার তাহার নিকট বিড়ম্বনার আকর। যেখানে নিঃস্বার্থ স্নেহের উৎস নাই, করুণার অপ্রতিহত ধারা প্রবাহিত নহে, সে স্থানে বসতি দুঃখকষ্টেরই কারণ। কুশ-লব এতদিনে সেই জীবনতর্পণ স্নেহের উৎসের সন্ধান পাইলেন। বাল্মীকির নিকটে রামায়ণ পাঠের সময়ে, যে সীতার কত গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়াছেন, যে সীতার দুঃখের বর্ণনা পাঠ করিয়া, ভ্রাতৃদ্বয় নীরবে কত অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছেন, যে সীতার পুণ্য-প্রবণ চরিত্রের মহান্ উৎকর্ষের কথা পড়িতে পড়িতে, উদ্দেশে সীতাদেবীকে প্রণাম করিয়াছেন, ইনি যে সেই করুণাময়ী সীতা, এবং সেই সীতাই যে আবার তাঁহাদের দুই ভ্রাতার মাতা, ইহা বিদিত হইয়া কুশ-লব যেন কেমন

মোহ-প্রাপ্ত হইলেন। একি সুখের মোহ না দুঃখের মোহ, অবসাদের প্রভাব না প্রসাদের মদিরা, তাহা সুপণ্ডিত কুমার-যুগল বুঝিতে পারিলেন না। কেবল এইটুকু বুঝিলেন যে, ইনি সেই দেবযজনসম্ভবা সীতা, ইনি সেই সৌরকুল-রাজলক্ষ্মী সীতা, ইনি সেই অবিনীত-দশাস্য-কুলনাশিনী, সতীকুলবরেণ্যা, ধরিত্রীতনয়া সীতা। আর বুঝিলেন যে, অযোধ্যার প্রজারঞ্জন নরপতি, যিনি ঐ সম্মুখে সমাসীন, তৎকর্ত্তৃক দুর্ভরগর্ভভর-কাতরা যে সীতা গহন অরণ্যে নির্ব্বাসিতা হইয়াছিলেন, যে সীতা প্রসববেদনায় চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া, একাকিনী নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া, ভাগীরথীর খর-প্রবাহে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, ইনিই সেই সীতা। আরও বুঝিলেন,—ভাগীরথীর গর্ভে সীতার যে সন্তানযুগল প্রসূত হইয়াছিল, মহর্ষি বাল্মীকি, পিতার ন্যায় যত্নে এবং মাতার ন্যায় স্নেহে এতদিন, যে সন্তানদ্বয়ের লালনপালন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা দুইজন সীতার সেই সন্তান। লব-কুশ, অনেক দিন হইল, রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, রাজর্ষি জনক—সকলেরই বিশিষ্ট পরিচয় রামায়ণে বিদিত হইয়াছেন। গুণগ্রাহী কুমারযুগল, পূর্ব্ব হইতেই ঐ ঐ মহাত্মার গুণগ্রামে ও মাহাত্ম্যে একান্ত বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তার পর, অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বসংরোধকালে রামের সহিত, এবং তৎপূর্ব্বে বাল্মীকির আশ্রমে জনকাদির সহিত সাক্ষাৎকারে, সেই রামায়ণপরিচিত মহাত্মবৃন্দের মহনীয়তা যে আরও কত অধিক, তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, আর এক্ষণে সেই রাম

তাঁহাদেরই পিতা, সেই লক্ষ্মণ তাঁহাদেরই পিতৃব্য, আর সেই মিথিলাপতি রাজর্ষি জনক তাঁহাদেরই মাতামহ,—জানিয়া, একেবারে অবাক্ হইলেন, অচিন্তিত আনন্দ-রসে অভিষিক্ত হইলেন। মানুষের যতই অভ্যুদয় হউক না কেন, তাহার একটা ক্রম আছে, কিন্তু আজ কুমারযুগলের এই যে অভ্যুদয়, ইহার কোন ক্রম নাই। বেলাবক্ষে সাগরতরঙ্গের ন্যায়, বাল্মীকির তপোবনে, সৌরকুলপাবনী ভাগীরথীর তটে, আজ এই অভ্যুদয়রাশি একদা ঝটিতি উপনত হইয়া, বিদ্যাবিনয়োজ্জ্বল, কমনীয়কান্তি, রাজকুমারদ্বয়কে আনন্দের এক অত্যদ্ভুত আবেশময়ী তন্দ্রায় অভিভূত করিয়া ফেলিল। তাঁহারা সেই অভিভূত অবস্থায়, জননীর বক্ষে মস্তক রক্ষা করিয়া, যেন যথার্থই ঘুমাইয়া পড়িলেন। প্রকৃতির বিকৃতি যেন প্রকৃতির বক্ষে মিশিয়া গেল। কি সুন্দর চিত্র! কি অনুপম কল্পনা!

আজ পতি, পুত্র, পিতা প্রভৃতি সকলের সমাগমে সীতার হৃদয়ের যে অবস্থা ঘটিয়াছে, অনাথার সংসারে সব থাকিতেও 'আমার' বলিতে কেহ ছিল না, আজ সেই সব একত্র সমবেত হইয়া, উপেক্ষিতার উপেক্ষাকাতর চিত্তে যে ভাবতরঙ্গের সমুত্থাপন করিয়াছে, তাহা, সীতার এমন সামর্থ্য নাই যে, মুখ দিয়া প্রকাশ করেন। অথবা মুগ্ধা সীতা কেন, স্বয়ং সরস্বতীও বোধ হয় সে ভাবরাশির প্রকাশে সমর্থা নহেন। তাই মহাকবি শ্রীকণ্ঠ সীতার মুখ দিয়া কোনও কথা* বলাইলেন না। মাত্র, যাঁহার প্রসাদে, যাঁহার অনুকম্পায়, আজ এই আনন্দ সম্মেলন,

যাঁহার শুভানুধ্যানে আজ এই অচিন্তনীয় স্বপ্ন-দর্শন, সেই, জগতের আদি কবি, প্রজাপতির বরপ্রাপ্ত প্রিয় পুত্র বাল্মীকিকে, পুত্রোপূর্ণোৎসঙ্গা, আনন্দপ্রতিমা, পতিপ্রাণা, রাজনন্দিনী, রাজ-মহিষী সীতা নীরবে প্রণাম করিলেন। যাঁহার আশীর্ব্বাদে আজ এই মহান্ সুমঙ্গলের সম্মেলন, সেই মঙ্গলের মঙ্গল, মহর্ষির চরণমূলে প্রণত হইয়া, সীতা যেন তথায় আপনার আনন্দ ভর-নমিত হৃদয়খানি রাখিয়া দিলেন। সহস্রমুখী ভাষায় যে ভাবের কিয়দংশও প্রকাশিত হইত না, পতিপুত্রবতী জানকীর দ্বারা বাল্মীকিকে একটি প্রণাম করাইয়া, ভাবের কবি ভবভূতি, সে ভাবরাশির সম্পূর্ণ প্রকাশ করিলেন। ভাবের নিকটে ভাষার সামর্থ্য যে কত নগণ্য, অকিঞ্চিৎকর, তাহা প্রেমিক চূড়ামণি, কবিত্বগগনের প্রতিভোজ্জ্বল ভাস্কর ভবভূতির কৃপায় কি অপূর্ব্ব কৌশলেই না প্রতিপন্ন হইল! ভাবের এমন চিত্র, মাধুর্য্যের এমন মূর্ত্তি, প্রসন্নতার এমন প্রতিচ্ছবি, সংস্কৃত-সাহিত্য-সাম্রাজ্যে অতি বিরল।

সীতা বাল্মীকির চরণে প্রণতা, আর তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে অযোধ্যার রাজসংসারের প্রায় সকলে এবং চরাচর জগতের তাবৎ 'ভূতগ্রাম' দণ্ডায়মান। বিরাট্ জন-সমাগম। মহর্ষি জনক, কুলগুরু বশিষ্ঠ, ভগবতী অরুন্ধতী, মহাদেবী কৌশল্যা, সুমিত্রা, দশরথ-দুহিতা শান্তা ও ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গ, প্রজারঞ্জন রাম এবং ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণ, কুমার কুশ, লব প্রভৃতি অযোধ্যার রাজসংসারের সকল ব্যক্তির সমক্ষে, যাঁহাদের সহিত

বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সমুন্নত সূর্য্যবংশ আরও উন্নত হইয়াছে, তাঁহাদের সমক্ষে,—সমগ্র প্রজাপুঞ্জের সমক্ষে, মহর্ষি বাল্মীকি প্রণতা জনকতনয়াকে কহিলেন—'মা রঘুকুললক্ষ্মি! চরিত্রোজ্জ্বলধরণি! উঠ, আশীর্ব্বাদ করি, আজ যে মহান্ আনন্দের সাগরে আনন্দময়ী তুমি বর্ত্তমানা, আজ যে সুখের প্রবাহে তুমি আপ্লুতা, আজ যে অভ্যুদয়ের প্রভায় তুমি প্রদীপ্তা, সাধ্বি! এই আনন্দ, এই সুখ, এই অভ্যুদয় যেন চিরদিন তোমার অক্ষুণ্ণ থাকে। তোমার বিমল চরিত্রের দীপ্তিতে বিশ্বভুবন প্রদীপ্ত, তোমার পবিত্র দেহের সংস্পর্শে ধরাতল পবিত্রীকৃত। মা! আজ যে সম্পদ্ উপনত, চিরদিন এই সম্পদ্ ভোগ করিও'। সীতা মস্তক উত্তোলন করিয়া একবার রামের দিকে চাহিলেন,—সতীর সে দৃষ্টিতে রঘুনাথ যেন অমৃতসাগরে নিমগ্ন হইলেন। পৃথিবীর সকলে চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান, আর মধ্যস্থলে, পুত্রবতী সীতা, আনন্দময়ী রঘুকুলবধূ, মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার ন্যায় বিরাজমানা। হিমালয়কল্প প্রশান্ত জনক, সংসারের এই সকল মায়ার খেলায় যেন কতকটা আত্মচিন্তাপর, অথচ মহর্ষি বাল্মীকির এই অলৌকিক অনুকম্পায় ও অত্যদ্ভুত স্নেহ-পরতায় কতকটা বিস্মিত। প্রসন্নবদন বাল্মীকির স্নেহবর্ষি দৃষ্টিতে রঘুনাথ অভিষিক্ত। লক্ষ্মণ এই অপ্রার্থিতোপনত আকস্মিক অভ্যুদয়ে একান্ত আশ্চর্য্যান্বিত,—যেন চিত্রলিখিত। কৌশল্যা অরুন্ধতী প্রভৃতি গুরুজনবর্গ অপার প্রীতি-সাগরে নিমগ্ন। জগতের তাবৎ প্রাণিবৃন্দ তাহাদের বহুকাল-বিলুপ্তা

স্বর্ণ-প্রতিমার পুনঃসন্দর্শনে এক অচিন্তিতপূর্ব্ব সুখের সমুদ্রে নিমজ্জিত। সকলেই প্রসন্ন, সকলেই বিস্মিত, আর তাহার মধ্যে পুত্রবতী প্রসাদ-প্রতিমা সীতা, আনন্দময়ী দশভুজার মূর্ত্তিতে বিরাজমানা। পৃথিবীর অধিবাসিবর্গ, আজ রাম-সীতার এই অপূর্ব্ব সম্মেলন দর্শন করিয়া যেন জীবন্মুক্ত হইল। সীতার নির্ব্বাসনে তাহাদের অন্তঃকরণে যে ঘোর বিষাদ-কালিমা জন্মিয়াছিল, পাপের ন্যায় যে বিষাদে তাহাদিগকে ক্ষণে ক্ষণে কত নূতন, ক্রমবর্দ্ধিত অশান্তির অনলে দগ্ধ করিতেছিল, এতদিন পরে, আজ আনন্দময়ী সীতার সন্দর্শনে সে কালিমা কাটিয়া গেল। অকস্মাৎ যে এমন আনন্দের মুহূর্ত্ত আসিবে, বা আসিতে পারে, এমন অভ্যুদয় হইতে পারে,—যিনি,—যে পবিত্রশীলা দেবতা বিনা দোষে পরিত্যক্তা, তিনি যে আবার এমন ভাবে ফিরিয়া আসিবেন, তাঁহার সেই অকৃত্রিম প্রণয়-সজ্জের তাদৃশ যজমানকে আবার যে এইরূপে অনুগ্রহ করিবেন, রাম ইহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তাই সীতাপতি বিস্ময়পূর্ণ হৃদয়ে ও আনন্দবর্ষি-নয়নে কখন সীতার দিকে, কখন সীতা-কুমারের দিকে, আবার কখন বা এই অভ্যুদয়ের যিনি বিধাতা, সেই কবিগুরু বাল্মীকির দিকে চাহিতেছেন। আর প্রসন্নমুখী, আনতকায়া সীতা সকল গুরুজনের সমক্ষে দাঁড়াইয়া,—চিত্র লিখিতার ন্যায় দাঁড়াইয়া, আপনার সৌভাগ্যের স্মরণে এক অভূতপূর্ব্ব প্রসন্নতায় যেন ডুবিয়া যাইতেছেন। আজ এই আনন্দের শুভলগ্নে সেই ভূতপূর্ব্ব নিরানন্দের কোন কথাই

আর মনে পড়িতেছে না। সর্ব্বংসহানন্দিনী এতকাল সব সহিয়া আসিয়াছেন, আজ একপদে সে সব আবার ভুলিয়া গেলেন। সকলেই নীরব।—এমনই সুখের সময়ে, বাল্মীকি আবার কহিলেন—"রাম! অযোধ্যাপতে! বল, তোমার আর কোন্ প্রিয় কার্য্য এখনও অসম্পূর্ণ, হৃদয়ের কোন্ আশা এখনও অপূর্ণ।" রাম আনতমস্তকে কহিলেন—"দেব! আপনার অনুগ্রহে আমার আর কোন বাসনাই অপূর্ণ নাই। তবে যদি অনুগ্রহই করিলেন,—আমার প্রার্থনা—জগতে মাতার ন্যায় হিতকারিণী, গঙ্গার ন্যায় কলুষ-হারিণী, আপনার এই চিরমঙ্গলা ছন্দোময়ী কথা, আপনার এই চিরসুন্দরী মনোহারিণী কবিতা, জগতের নিখিল পাপ ধ্বংস করুক, অশেষ কল্যাণ সাধন করুক। চিন্তাশীল মনস্বিবৃন্দ, জ্ঞানার্কদীপ্ত পণ্ডিতবৃন্দ, আপনার এই রামায়ণ-রূপিণী অপূর্ব্ব ভারতীর আলোচনা করিয়া কৃতার্থ হউন, এবং জগদ্বাসীদিগকেও কৃতকৃতার্থ করুন। জগতে বিদ্যার আলোচনা, কলার আলোচনা বর্দ্ধিত হউক, আর আপনার কবিতারূপিণী অমলিন-মালায় পণ্ডিতগণের কণ্ঠ বিমণ্ডিত হউক, ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা।"—কোশলসম্রাট্ রামের জলদগম্ভীর স্বর সেই বিশাল সভামণ্ডপে প্রতিধ্বনিত হইল। সকলে একবাক্যে যেন রামেরই কথার পুনরাবৃত্তি করিলেন। মহাকবি বাল্মীকি, রামের এই উক্তিতে, সস্মিতবদনে 'তথাস্তু' বলিয়া, অন্তর্হিত হইলেন। গঙ্গার সুপবিত্র সৈকতে, মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনের উপকণ্ঠে, জগতের সকলের সমক্ষে, আজ অযোধ্যার লুপ্ত শান্তি

সীতামূর্ত্তি-পরিগ্রহ-পূর্ব্বক পুনরুদিত হইলেন। যেখানে লয়, সেইখানেই উৎপত্তি। একাকিনী সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে লক্ষ্মণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আজ আবার বহুবৎসর পরে সেই তপোবনেই আসিয়া, লক্ষ্মণ পুত্রবতী সীতার দর্শন-লাভ করিলেন। যাঁহাকে স্বয়ং ত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রজারঞ্জন রাম আজ আবার স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন, সতীত্বের মর্য্যাদার পূজা করিলেন। ব্রহ্মাণ্ডবাসী জনগণ দেখিল, তাহাদের যিনি রাজ-রাণী, তিনি মহর্ষিগণেরও অর্চ্চনীয়া, কলঙ্কলেশশূন্যা। তাহারা আরও দেখিল, সতীত্বের জয়, সতীর আদর সর্ব্বত্র। কেবল অযোধ্যায় সে জয় ঘোষিত হয় নাই, সে আদর অযোধ্যাবাসীরা করিতে শিখে নাই।—তাহারা লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। আজ বাল্মীকির তপোবনে এই মহাভাবের যে এক বিরাট্ অভিনয় সম্পন্ন হইল, জগতের ইতিহাসে ইহা নূতন। তাহারা এই নূতন ভাবে বিভোর হইয়া, আনন্দপূর্ণ-হৃদয়ে তাহাদিগের আনন্দময়ী দেবতাকে বরণ করিয়া লইয়া ঘরে ফিরিল।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

উপসংহার।

আদিকবি বাল্মীকির অনুকম্পায় রাম-সীতার পুনর্মিলন হইয়াছে। জগতের সকলের সমক্ষে, বিশেষতঃ অযোধ্যার সন্দিগ্ধ-মনা প্রজামণ্ডলীর সমক্ষে, দেবর্ষি, রাজর্ষি, মহর্ষি, দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব, স্থলের দেবতা পৃথিবী আর জলের দেবতা গঙ্গা,—সকলের সমক্ষে, রাম, সীতাকে গ্রহণ করিয়া, আত্মকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। যাহারা না বুঝিয়া, পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া, অনল-বিশুদ্ধা সীতাদেবীর চরিত্রে বৃথা কলঙ্কের আরোপ করিয়াছিল, এবং সেই অকার্য্যের জন্য, এতদিন অনুতাপের অসিপত্র-নরকে বিড়ম্বিত হইতেছিল, সেই রাজানুগত প্রজাপুঞ্জ আজ তাহাদের প্রনষ্ট প্রতিমাকে পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে,---সকলেই আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। মহাকবি ভবভূতির অলৌকিক কবিত্বচন্দ্রমার অমৃতবর্ষিণী চন্দ্রিকায়, ক্রৌঞ্চমিথুনের বিরহ-গীতিকার কবি, সংস্কৃত ভাষায় নূতন ছন্দের আদি আবিষ্কর্ত্তা, কবিতারূপিণী চিরসুন্দরী সুধাময়ী দুহিতার জনক, ক্রান্তদর্শী মহর্ষি বাল্মীকির নিসর্গ শীতল, পরম রমণীয় কল্লোদ্যান যেন আরও রমণীয়তর আকার ধারণ করিয়াছে। কালিদাস যে কাব্য-কাননে মনের সাধ মিটাইয়া কত নূতন নূতন ঘ্রাণতর্পণ কুসুমের বীজ বপন করিয়াছিলেন,

কত নয়নরঞ্জিনী মনোহারিণী কৃত্রিম-সরিতের সৃষ্টি করিয়া, যে কাননের উপাদেয়তার শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, কোথাও অকালে বসন্তের আবির্ভাব করাইয়া,[১] কোথাও নিদ্রিত নরপতির অর্গলবদ্ধ কক্ষে ভুবনেশ্বরীর অধিষ্ঠান করাইয়া,[২] কোথাও বায়ব-যানে দূর আকাশে লইয়া গিয়া, ভাবুকদিগকে, সৌন্দর্য্য-প্রিয়দিগকে যে কাননের মনোমোহিনী শোভা দেখাইয়াছিলেন,[৩] করুণ ভবভূতির অনুপম কবিত্বামৃতে সেই কাননের সেই কুসুম-বীজে, কত সুন্দর সুন্দর তরু জন্মিয়াছে, তাহাতে আবার কত সুন্দর সুন্দর সুরভি কুসুম ফুটিয়া ত্রিলোক আমোদিত করিয়াছে! ভবভূতির কল্পনামারুতে সেই কাননের সেই সকল সুধাবাহিনী সরিতে, কত সুন্দর, কত আবেশজনক বীচি উঠিয়াছে। দুগ্ধধবলা সহস্র-লহরী মুক্তার মালা পরিয়া, সেই সরিৎ কি সুন্দর নৃত্য করিতেছে! বিমুগ্ধা আপনার ভাবে আপনি ভুলিয়া, মধুরাস্ফুট কুলকুল স্বরে, যেন, প্রাণের কোন্ বিস্মৃত গাথার গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। কালিদাস নিশীথে যে চতুর্ভুজা ভুবনেশ্বরীকে অযোধ্যাপতির সমক্ষে আনিয়া বিশ্ববিমোহন করিয়াছিলেন, ভবভূতি তাঁহাকে দশভুজা-রূপে ধ্যান করিয়া ভূতলে আনিয়াছেন। কালিদাসের সামাজিকগণ জগতের সর্ব্বত্র স্বস্থ আবাসে বসিয়া আছেন, আর, তাঁহার প্রিয় কবিতারাণী সকলের দ্বারে

১—কুমার, ৩য় সর্গ, ২৪।

২—রঘুবংশ, ১৬শ সর্গ, ৪।

৩—রঘুবংশ, ১৩শ সর্গ, ১।

দ্বারে গিয়া, যাহাদের দ্বার বদ্ধ, তথায় করাঘাতে দ্বার খুলিয়া, কঙ্কন-ঝনৎকারে সকলের হৃদয়াকর্ষণ-পূর্ব্বক মৃতসঞ্জীবনী সুধা বর্ষণ করিয়াছেন। আর ভবভূতি, জগতের,—স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতলের তাবৎ অধিবাসীকে, চরাচর ভূতগ্রামকে—একস্থানে,—যিনি জগতে কবিতার প্রথম স্বপ্ন প্রদর্শন করেন, সেই আদি কবিরই আশ্রমে সম্মিলিত করিয়া, সকলের সমক্ষে তাঁহার কবিতারাণীকে আহ্বান করিয়াছেন। সাধকের আহ্বানে কবিতাদেবী স্থির থাকিতে পারেন নাই, তাই কালিদাসের সেই চতুর্ভুজা ভুবনেশ্বরী দশভুজার মূর্ত্তিতে আসিয়া, প্রেমিক মহাকবি শ্রীকণ্ঠের মনের সাধ মিটাইবার জন্য সকলের সমক্ষে দাঁড়াইয়াছেন। এক পুণ্যাত্মার পুণ্যপ্রভাবে যেমন; কত শত শত পাপীর, শত শত প্রাণীর উদ্ধার হয়, পাপ ধ্বংস হয়, তদ্রূপ এক ভবভূতির পুণ্যে জগতের কোটি কোটি মানব আজ কবিতারূপী অপূর্ব্ব স্বর্গের অধীশ্বরীকে দর্শন করিয়া ধন্য হইতেছে, কৃতকৃতার্থ হইতেছে। মৃত্যুঞ্জয় রত্নাকরের নানারত্ন-বিমণ্ডিত কবিত্ব-প্রাসাদে প্রবেশ করিবার জন্য, সৌন্দর্য্য-রাজ্যের প্রধান পর্য্যটক কলিদাস যে যে পথে ভ্রমণ করিয়া-ছিলেন, কালিদাসের প্রিয় সেবক ভবভূতিও সেই সেই পথে ভ্রমণ করিয়াছেন। কালিদাস পর্য্যটন-সময়ে, পথের চারিদিকে, স্বভাব-সুন্দরীর যে সকল স্বপ্নময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন,—যে মূর্ত্তির দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া উদ্ভ্রান্ত ভাবে একাকী বসিয়া রহিয়াছেন, ভবভূতি তথায় সেই সকল নিরবদ্য সৌন্দর্য্য দর্শনে যেন কেমন উন্মত্ত হইয়া, আপনা ভুলিয়া,

ভাবের বীণায় গান ধরিয়াছেন,—সে গানে, বীণার সে মধুর ঝঙ্কারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পুলকিত হইয়াছে, আত্মবিস্মৃতিপূর্ব্বক কবির ভাবস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে, ইহা সে জানে না, জানিবার বা বুঝিবার শক্তি বুঝি তা'র লোপ পাইয়াছে। বিশ্বের সমস্ত জীব তখন কবির সুরে সুর মিশাইয়া কবির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে। তাহারা কখনও কবির সঙ্গে, অম্লানবদনে, দুরারোহ, অভ্রংলিহ, "প্রস্রবণ" পর্ব্বতের শিখরে উঠিয়া, অধোবর্ত্তিনী, সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা, কানন-কুন্তলা ভারতভূমির চিরনবীন কান্তি দর্শন করিতেছে, কখনও সাগরাম্বরার মুক্তাসন্নিভ ফেনখচিত স্বচ্ছ নীল বসনে স্বর্গের অমরাবতীর প্রতিবিম্বন দেখিয়া বিস্মিত হইতেছে, কখনও আবার কবির সহিত দ্রুতপদে অবতরণ পূর্ব্বক, গোদাবরীর তটে, স্নিগ্ধশীতল বেতসকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া, তটিনীর তরঙ্গশীতল সমীরণে তন্দ্রালস হইয়া, কুল কুল সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতেছে। ভবভূতির সরস্বতী ললিত গম্ভীর পদন্যাসে চলিয়াছেন, কবির মোহন বংশীর স্বরে, তন্ময়হৃদয়ে, কবির অনুসরণ করিয়াছেন। বশবর্ত্তিনী সাধ্বী রমণী যেমন দয়িতের অনুসরণ করে, সুগম-দুর্গম, উচ্চাবচ, যেরূপ পথই হউক না কেন, অক্লান্ত গমনে অতিক্রম করে, তদ্রূপ মহাকবির প্রীতিময়ী বাগ্‌দেবতা, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র সমান পদবিক্ষেপে চলিয়াছেন। সে পদন্যাসে লালিত্য আছে, কিন্তু চাঞ্চল্য নাই উৎকণ্ঠা আছে, কিন্তু অসঙ্গত ক্ষিপ্রতা নাই। সে পদন্যাস

যৌবনদর্পিতা আত্মসৌন্দর্য্যমুগ্ধা কামিনীর নহে, সে পদন্যাস প্রেমাবেশমন্থরা ললিত-হৃদয়া গম্ভীরা প্রৌঢ়া ভামিনীর। তাই ভবভূতির কাব্যের কুত্রাপি কোনরূপ তারল্যের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। মাধুর্য্যের সহিত গাম্ভীর্য্যের মিলনে, ভবভূতির কাব্য অদ্বিতীয়।

বিরাট্ শব্দ-সাম্রাজ্যের তিনি অপ্রতিরথ সম্রাট্ ছিলেন; প্রেমের চিত্রাঙ্কনে তাঁহার যেরূপ নৈপুণ্য, মাধুর্য্যের স্বরূপ বিশ্লেষণে তাহার যেরূপ দক্ষতা, উৎকটের তীব্র সন্ধানে ব, ভীষণের বিভীষণ আকার-প্রদর্শনেও তাঁহার সেইরূপ সামর্থ্য ছিল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভবভূতির প্রেমময় হৃদয়ের একাগ্রতা বড় অধিক ছিল। কোন একটা বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট হইলে, সে চিত্তকে ভবভূতি সহসা বিষয়ান্তরে আর প্রহিত করিতে পারিতেন না। কালিদাস ঘটনার বশে চলিতেন, প্রকৃতির অনুসরণ করিতেন। আর ভবভূতি, ঘটনাকে আপনার বশীভূত করিয়া লইতেন, প্রকৃতিকে আপনার অনুগামিনী করিয়া তুলিতেন। কালিদাস বসন্তের পিকের ন্যায়, যেখানে রসাল মঞ্জরীর সৌরভ, তথায় বসিয়া কবিত্ব-পূর্ণ সুকণ্ঠে ঝঙ্কার করিতেন, আর ভবভূতি বনের যেখানে হউক বসিয়া, স্বকীয় কল্পনারূপী দূরবীক্ষণের সাহায্যে সমগ্র বনভূমির সকল পদার্থের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেন। কালিদাসের সরস্বতী চম্পক, বনজ্যোৎস্না, নবমল্লিকা, শিরীষ প্রভৃতির মালায় বিমণ্ডিতা, আর ভবভূতির সরস্বতীর কণ্ঠে সেফালিকার স্রক্। কালিদাসের

সরস্বতী বাছিয়া বাছিয়া কখনও কেসরতরুর মূলে, কখনও কাণ-কার তরুর মূলে, কখনও বা নিদাঘ দিবসের শেষে, শিরীষ তরুর ছায়ায় বসিতে ভালবাসেন। আর ভবভূতির বাগ্‌দেবতা, নীল-সলিলা যমুনার তটে, গম্ভীরাকৃতি শ্যামল বটবৃক্ষের প্রশান্ত ছায়ায় একাকিনী বসিয়া, যমুনার দিকে চাহিয়া থাকেন। কালিদাসের কবিতা সুন্দরী, শারদী জ্যোৎস্নার ন্যায়, কুসুমিতা লতিকার ন্যায়, সালঙ্কারা তরুণীর ন্যায়, আপনার সৌন্দর্য্যে আপনিই বিমুগ্ধা, আপনার ভাবে আপনিই উন্মাদিনী। আর ভবভূতির কবিতা, বর্ষীয়সী রাজমহিষীর ন্যায়, অভয়দায়িনী দশভুজার ন্যায়, করুণা-ময়ী জননীর ন্যায়, গাম্ভীর্য্য-শালিনী ও স্নেহ-বর্ষিণী,। সে দশভুজা মূর্ত্তির দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর, তোমার প্রাণ শীতল হইবে, আশ্বাসে ভরিয়া যাইবে। তুমি অনন্ত তৃপ্তির অমৃতসাগরে নিমগ্ন হইবে। কালিদাসের কবিতা-সুন্দরীর প্রতিনিঃশ্বাসে বসন্তের সখা মলয় পবন প্রবাহিত হয়, বিশ্ব আমোদিত হয়, আর ভবভূতির কবিতাদেবীর শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রীষ্মের সান্ধ্য-সমীরণ বহাইয়া তাপিত জীবের মন, প্রাণ, জুড়াইয়া দেয়। কালিদাসের কবিতার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চিত্তবিনোদিনী নায়িকার "প্রভাতরল জ্যোতিতে" সমুদ্ভাসিত, আর ভবভূতির কবিতার সর্ব্বশরীর ধবল-বসনা কুসুম-ভূষণা বনদেবতার ছায়ায় সমুল্লসিত। কালিদাসের কবিতার পরিধেয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চীনাংশুক, আর ভবভূতির কবিতার পরিধেয় কখনও বৃক্ষের বল্কল, কখনও বা গৈরিক বসন। একজন সৌন্দর্য্য-জগতের বিশ্বকর্ম্মা, অমৃতের

উৎস; আর একজন ভাব-রাজ্যের প্রজাপতি, তুষারশীতলা জলধারার প্রস্রবণ। একজনের নিকটে যাও, নয়ন জুড়াইবে, কণ্ঠ চরিতার্থ হইবে, মাধুর্য্যে ভরিয়া যাইবে; আর একজনের সমীপে যাও, যোগমগ্ন তপস্বীর ন্যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া, আপন ভাবে আপনিই ডুবিয়া যাইবে, সুশীতল জলধারায় তোমার প্রাণের পিপাসা মিটিবে। তুমি অবশ হৃদয়ে ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িবে। তাই আবার বলি,—কালিদাস সৌন্দর্য্যের কবি, ভবভূতি ভাবের কবি, কালিদাস মাধুর্য্যের উৎস, ভবভূতি শান্তির প্রস্রবণ। পাঠক! যদি শান্তির প্রস্রবণে অবগাহন করিতে চাও, যদি ভাবের মন্দাকিনী-তরঙ্গে ভাসিতে চাও, তবে ভবভূতির শরণ লও, সংস্কৃত-সাহিত্য-গগনের অকলঙ্ক চন্দ্রমা শ্রীকণ্ঠের বশবর্ত্তিনী বীণাপাণির সঙ্গীত শ্রবণ কর।

ভবভূতির রামসীতার মিলন যখন আলোচনা করি, তখন কালিদাসের দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মিলন মনে পড়ে। সেই প্রত্যাখ্যাতা কণ্বদুহিতা শকুন্তলা, সেই 'পরিধূসর-বসনা' 'ক্ষাম-মুখী', 'একবেণীধরা', 'শুদ্ধশীলা' শকুন্তলার সহিত মারীচাশ্রমে দুষ্মন্তের পরিচয় মনে জাগিয়া, ভবভূতির প্রতি আরও ভক্তি জন্মাইয়া দেয়। দুষ্মন্ত-শকুন্তলা জগতের অধিবাসী হইয়াও যেন জগৎ হইতে নির্ব্বাসিত, উপেক্ষিত হইয়াছিলেন। জগতের অধীশ্বরকে জগদ্বাসীরা ভুলিয়া গিয়াছিল। দুষ্মন্তের সেই অসহায়, অন্যকৃত-সমবেদনা-শূন্য, পরিশ্রমকাতর চিত্তের দুরবস্থার কথা ভাবিলে কা'র নয়ন না অশ্রুপূর্ণ হয়? আর রামের প্রতি

জগতের নরনারীর যে ভক্তি, রামের দুঃখে জগতের আবাল-বৃদ্ধবনিতার,—বনে বনদেবতার, জলে জলদেবতার, স্থলে স্থল-দেবতার যে দুঃখ, আবার রামের প্রতি যে সম্ভ্রম, রামের শোকে বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের—স্থাবরজঙ্গমের যে শোক, তাহা ভাবিলে চিত্তে এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থার উদয় হয়। কালিদাসের অনুকরণে ভবভূতির কাব্যাবলী বিরচিত হইলেও, কাব্যাংশে, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার চরিত্র অপেক্ষা রামসীতার চরিত্রের বিকাশ সমধিকতর হইয়াছে।

দুষ্মন্ত, মৃগয়া করিতে যাইয়া, গোপনে, একা একা, অপ্সরার গর্ভসম্ভবা, ঋষি-পালিতা শকুন্তলার অতুল সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, দুষ্মন্ত স্বয়ং অনন্ত উদ্যান-বিমণ্ডিতা বসুমতীর অধীশ্বর হইয়াও আর্ষ আশ্রমের অযত্নবর্দ্ধিতা বনলতার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। তাই তিনি হরিণবধে অকৃত-কার্য্য হইয়া, শেষে নির্জ্জনে, নিজেই নিজের বাণের আঘাতে জর-জর হইলেন। সুতরাং সেই বাণাঘাতের যাতনা,—সেই শোচনীয় বিরহ তাঁহাকে একা একা ভুগিতে হইল। তাঁহার ক্রন্দনে আর কেহ কান্দে নাই, তাঁহার বিলাপে আর কেহ বিলাপ করে নাই। স-সাগরা ধরণীর অধীশ্বর, হৃদয়ের বেদনায়, আত্মকৃত ব্যাধির যাতনায় প্রায় উন্মত্ত, একপ্রকার হতচৈতন্য, আর তাঁহার এত যত্নের প্রজাপুঞ্জের একটি প্রাণীরও সে দিকে লক্ষ্য নাই। দুষ্মন্ত আপনার বিরহতাপ-দগ্ধ দুর্ব্বহ হৃদয়খানি লইয়া, বিশ্বের অধিপতি হইয়াও, বিশ্বের এক কোণে উপেক্ষিত, একজন

ব্যক্তিরও সমবেদনা তাঁহার তাপিত প্রাণে শান্তি বর্ষণ করে নাই। তাঁহার হৃদয়ের সুখদুঃখের যেন কেহ ভাগী ছিল না। এ বড় বিড়ম্বনার জীবন। যাহার আনন্দের অংশ লইবার বা দুঃখের ভার লঘু করিবার কেহ নাই, তাহার জীবন বড়ই কষ্ট-প্রদ। দুষ্মন্ত কষ্টের দিনে সেই ঘোর কষ্টময় জীবন লইয়া একা একা কান্দিয়াছেন, ছট্‌ফট্‌ করিয়াছেন, আর কেহ নিকটে যায় নাই। আবার যখন শকুন্তলার সহিত মিলন হইল, মারীচাশ্রমে প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার চরণে পড়িয়া আত্মকৃত অবিনয়ের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, এবং প্রায়শ্চিত্তান্তে অপার নির্বৃতি-সাগরে নিমগ্ন হইলেন, আনন্দে, মোহে, একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িলেন, তখনও কেহ তাঁহার সেই আনন্দের, সেই নির্বৃতির অংশ লইতে আসে নাই। তাঁহার সুখে সুখী হয় নাই। যখন শকুন্তলা কণ্বাশ্রম হইতে দুষ্মন্তের রাজধানীতে আসিয়াছিলেন, তখন কেহ যেমন তাহাতে একটা বিশেষ কিছু আনন্দ অনুভব করে নাই, সেইরূপ যখন শকুন্তলা কান্দিতে কান্দিতে চলিয়া গেলেন, তখনও কেহ বিশেষ দুঃখিত হয় নাই। শকুন্তলার আসা বা যাওয়ায়, থাকা বা না থাকায়, প্রণয়ে বা বিরহে, রাজ্যের আর কাহারও কিছু হয় নাই। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মিলন জগতের অন্তরালে হইয়াছিল, জগতের সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া মহীপতি শকুন্তলার পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন, তাই বিরহটাও তাঁহাকে একা একা ভুগিতে হইল। পুনর্মিলনের সময়েও তাহাই। আর কেহ তাহা জানিল না। তুমি যদি

পরের মুখের দিকে না চাও, পরে তোমার মুখের দিকে চাহিবে কেন? দুষ্মন্তের অভ্যুদয় জগতের কেহ দেখে নাই, বিপদেও জগতের কেহ আসে নাই।

কিন্তু সীতা ত আর শকুন্তলা নহেন বা রামও দুষ্মন্ত নহেন। সীতা সেই ধনুর্ভঙ্গ-পণ-বিজিতা 'সীতা,' সীতা সেই অগ্নিপরীক্ষিতা 'সীতা', সীতা সেই মিথিলাপতি রাজর্ষি জনকের প্রাণাধিক দুহিতা। সীতা যেমন রামের হৃদয়ের অধিদেবতা, তেমনই স্বর্গমর্ত্তরসাতলের পরম আরাধ্য দেবতা ছিলেন। সীতার সম্পর্কে কেবল রামের সংসার নহে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পবিত্র ও আনন্দিত ছিল। সীতার বিরহেও কেবল রামের হৃদয় নহে, কেবল অযোধ্যার বা মিথিলার রাজ-সংসার নহে, স্বর্গমর্ত্তরসাতলে দুঃখের ঝড়, শোকের ঝড় বহিয়াছিল। রামের নিজের যেন কোনও অস্তিত্ব ছিল না, জগতের সকলকে লইয়াই যেন তিনি। যে রাজ্যের তিনি রাজা, সেই রাজ্যের প্রজাপুঞ্জের সমষ্টির প্রতিকৃতিরূপে যেন তিনি বিদ্যমান। তাই তাহাদের চিত্তের পরিতুষ্টিবিধানের বাসনায়, নিঃস্বার্থ রঘুনাথ সাধ্বী সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরের জন্য তিনি আপনার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়াছিলেন। পরের জন্য তিনি আপনার সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। জগতে একটা অচিন্তনীয় ও অচিন্তিতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার দুঃখে সকলে দুঃখিত ও তাঁহার রোদনে জগত রোরুদ্যমান হইয়াছিল। আজ আবার-মিলনের দিনেও তাঁহার আনন্দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আনন্দিত, স্থাবর

জঙ্গম—সমস্ত ভূতগ্রাম একত্র সমবেত, তাহাদের আদর্শ-দেবতা রামসীতাকে বরণ করিয়া লইতে উৎসুক। সীতার বিয়োগে যাহারা কান্দিয়াছিল, আজ সংযোগে তাহারা হাসিল। সীতার বনবাসে যাহারা আত্মভ্রম বুঝিতে পারিয়া অতলশোক-সাগরে ডুবিয়াছিল, আজ তাহাদের নারীকুলদেবতা সীতা ফিরিয়া আসিলেন,—তাহারা আনন্দ-সিন্ধুতে ভাসিল। কি অনুপম চিত্র! কোথায় দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার মিলন! আর কোথায় এই রামের সহিত সীতার মিলন! উভয়ে আকাশ পাতাল প্রভেদ। অপ্সরার তাদৃশী দুহিতা শকুন্তলার প্রণয়, বিরহ এবং মিলনের চিত্র সম্মুখে রাখিয়া, প্রেমিক চূড়ামণি শ্রীকণ্ঠ হিন্দুর উপাস্য দেবতা রামসীতার প্রণয়, বিরহ এবং মিলনের যে স্বপ্নময়ী, আবেশময়ী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিলেন, তাহার তুলনা নাই।

অতি সুবিশুদ্ধ ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিবার পক্ষে মহাকবি ভবভূতির যে অতুল ক্ষমতা ছিল, তাঁহার সমসাময়িক কবিগণের মধ্যে কাহারও সেরূপ পরিদৃষ্ট হয় না। তাঁহার যেমন কল্পনার প্রসার, তেমনই ভাষার প্রসার ছিল। তাঁহার কল্পনা বা ভাষার কোন স্থলে কোন প্রকার সঙ্কীর্ণতা দেখিতে পাই না। বরং সর্ব্বত্রই সকল বিষয়ে চরম উদারতা অনুভূত হয়। ভবভূতির আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষার চরম উন্নতি হইয়াছিল সত্য, সংস্কৃত ভাষা জগতে বরণীয়া হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ভবভূতি, ভাষায় এমন একটা অনুপম

এবং শক্তিমান্ জীবন সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, ভাষার এমন একটা গাম্ভীর্য্য জন্মাইয়া দিয়াছেন, যাহা তাঁহার পূর্ব্বে বরং কদাচিৎ দৃষ্ট হইত, কিন্তু তাঁহার তিরোধানের পরে, আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে,—বলা উচিত যে, মহাকবি ভবভূতির সঙ্গে তাঁহার চিরপূজিতা 'প্রসন্ন-গম্ভীরপদা' সরস্বতীরও অন্তর্ধান হইয়াছে। অনেকে নানালঙ্কার-ভূষিতা সরস্বতীর বিলাসগতি দেখিতে ভালবাসেন, অন্যকে দেখাইতেও ভালবাসেন। অলঙ্কারের সৌন্দর্য্যে যাহার সুন্দরতা বুঝিতে হয়, অলঙ্কার বাদ দিলে যাহার আর কিছুই দেখিবার থাকে না, তাদৃশী লেখা কখনও সুধীসমাজে, বিশেষতঃ সমালোচক-সমাজে দীর্ঘকাল স্থায়িনী হইতে পারে না। রঙ্গিন পাথরের সাহায্যে অতি সামান্য পদার্থেও নানা রঙ্গ দেখা যাইতে পারে, কিন্তু সে রঙ্গ কতক্ষণ স্থায়ী?—সে রঙ্গের অস্তিত্ব কতটুকু? যে ভাষা অলঙ্কারের তরঙ্গে তরঙ্গিতা বলিয়া নয়ন-রঞ্জিনী, যে ভাষা ভাব-সম্পদে গরীয়সী না হইয়াও অলঙ্কারের চাকচিক্যে দর্শকের চিত্তবিনোদিনী, তাহাকে আমরা উৎকৃষ্ট ভাষা বলিতে পারি না। ভাব-পূর্ণা—গম্ভীরপদ-সমলঙ্কৃতা, প্রসাদগুণ-ভূষিতা যে ভাষা, তাহার আর অলঙ্কারের প্রয়োজন হয় না। সে নিজেই নিজের অলঙ্কার। ভবভূতির ভাষাও নিজেই নিজের অলঙ্কার। নবীন গ্রন্থকারগণ, অনেক সময়ে, ভাষায় এত সমুজ্জ্বল-প্রভা-সম্পন্ন অলঙ্কারের বিন্যাস করেন যে, পাঠকের মন, সেই অলঙ্কারের ইন্দ্রজাল অতিক্রম করিয়া, লেখকের

প্রকৃত উদ্দেশ্য ভাষার অভ্যন্তর হইতে বাহির করিয়া লইতে পারে না। অভিজ্ঞ গ্রন্থকারবৃন্দ ঐরূপ অলঙ্কার-প্রিয়তাকে রচনার একটা দোষ বলিয়া মনে করেন। যাঁহারা নাতিদীর্ঘ ও সুসংযত পদ-বিন্যাসে হৃদয়ের প্রকৃত ভাব বাহিরে প্রকাশ করিতে পারেন, বাহ্য উপাদানের সাহায্যে অন্তরের ভাবকে জটিল হইতে জটিলতর করিয়া তুলেন না, তাঁহারা লেখকশ্রেণীর অগ্রণী। মহাকবি ভবভূতিও, এই কারণে, তাঁহার সমসাময়িক লেখকগণের অগ্রণী ছিলেন। চিন্তাশীল লেখক যখন পাদ্য অর্ঘ্য সাজাইয়া বীণাপাণির অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত, ধ্যানমগ্ন হইয়া বসেন, কল্পনা-কাননের অম্লান কুসুমে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তাঁহার মনে, সিন্ধুবক্ষে তরঙ্গের ন্যায়, ভাবের উপর ভাব, তাহার উপর ভাব, তাহার উপর কত ভাব আসিয়া খেলা করিতে থাকে। তখন, মনের আবেগ দমন করিয়া, উচ্ছ্বসিত ভাবতরঙ্গের প্রতিসংহার করিয়া, লেখনী চালনা করা বড়ই কঠিন কার্য্য। বিশেষ ক্ষমতাশালী লেখক ব্যতীত, সে উদ্বেল তরঙ্গের প্রতিরোধ সকলে করিতে পারে না। পারে না বলিয়াই, অনেক স্থলে দেখি, এক নায়িকার চিকুরের বর্ণনে বা দেহের বর্ণনে শতাধিক কবিতা লিখিত হইয়াছে। কোথাও দেখি, এক সরোবরের বর্ণনায় বা এক পর্ব্বতের বর্ণনায় সহস্রাধিক বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে। মাঘের রৈবতক-বর্ণন বা কাদম্বরীর অচ্ছোদ-সরোবর-বর্ণন এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট।

মহাকবি ভবভূতি নিজেই নিজের প্রভু ছিলেন। নিজের কল্পনা-তরণীর তিনি নিজেই কর্ণধার ছিলেন। যখন আবশ্যক হইয়াছে, সে তরী বাষ্পীয় অর্ণবযানের ন্যায় ছুটিয়াছে, আবার প্রয়োজনমতে, সে তরী পাষাণের ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক তিলও অগ্রসর হয় নাই। ভবভূতির কল্পনাসুন্দরী যেন স্থাবরজঙ্গমাত্মিকা। যখন স্থাবর, তখন প্রস্তর প্রতিমার ন্যায়, আবার যখন জঙ্গম, তখন বিদ্যুদ্‌বিলাসের ন্যায়। তাঁহার কল্পনা যখন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও সেই সঙ্গে স্থির, নিঃস্পন্দ, হইয়াছে, আবার যখন চপলার ন্যায় চঞ্চলগমনে চলিয়াছে, তখন হাসিতে হাসিতে জগৎ সেই স্বৈরগতি কল্পনার অনুগমন করিয়াছে। কবিগণ প্রায়শই কল্পনার বশে চলিয়া থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভবভূতি কখনও কল্পনার বশে চলিতেন না, বরং কল্পনাই তাঁহার বশে চলিত। তাই দেখিতে পাই, যখন যে ভাবে ইচ্ছা, কান্যকুব্জের রাজপণ্ডিত ভবভূতি, তাঁহার সামাজিকদিগকে কল্পনামন্ত্রে বিমোহিত করিতেছেন। কখন হাসাইতেছেন, আবার পরক্ষণেই কান্দাইতেছেন। কখন অবসাদ, কখন বিষাদ, কখন প্রসাদ, কখন আবার যুগপৎ এই ত্রিতয়ের মধ্যে সামাজিকদিগকে স্থাপিত করিতেছেন। কল্পনা এবং ভাষা—উভয়ের উপরেই তাঁহার তুল্য আধিপত্য ছিল। ভাষাগত দীনতার জন্য কল্পনার বা কল্পনাগত দীনতার জন্য ভাষার সঙ্কোচ করিয়া, তাঁহাকে কখন মনঃপীড়া ভোগ করিতে

হয় নাই। বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে কোন্‌টি ত্যাজ্য, কোন্‌টি গ্রাহ্য, তাহা তিনি বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিতেন। এই জন্যই দেখি, কালিদাসের ন্যায়, তাঁহার রচনাতেও কোনরূপ পরিপন্থী ভাবের বা রসের সমাবেশ হয় নাই। এই জন্যই উত্তর-চরিতের শেষভাগে, বাল্মীকির আশ্রমে, রাম, সীতা, লব, কুশ প্রভৃতির মিলনকালে, দেখি, অযোধ্যার যে যেখানে ছিল, ভবভূতি সকলকে উপস্থাপিত করিয়াছেন, আনন্দের শুভলগ্নে সকলকে সমবেত করিয়া, আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়াছেন, কিন্তু ভরতকে আনেন নাই। মথুরেশ্বরকে জয় করিয়া শত্রুঘ্ন আসিয়াছেন; যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া শান্তার সহিত ঋষ্যশৃঙ্গ আসিয়াছেন; জনক, কৌশল্যা, অরুন্ধতী বশিষ্ঠ,—সকলে আসিয়াছেন; কিন্তু ভরত আসেন নাই। ভরতের আগমনে, সামাজিকগণের মনে অনেক পুরাতন বৃত্তান্ত জাগিত। ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তির বাসনাতেই কৈকেয়ী কর্ত্তৃক রামসীতার নির্ব্বাসন, ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্তই মন্থরার সহিত ভরতজননীর ষড়যন্ত্র, আর সেই ষড়যন্ত্রের ফলেই যত অনর্থের উৎপত্তি। যদি রাম বনে না যাইতেন, তবে আর রাবণ সীতার অপহরণ করিত না, যদি রাম বনে না যাইতেন, দশরথের অবৈধ মৃত্যু ঘটিত না, যদি রাম বনে না যাইতেন, অপাপবিদ্ধা, সতীত্বের প্রতিমূর্ত্তি সীতার চরিত্রে কেহ অলীক অপবাদের আরোপ করিতে পারিত না, আর সেই অপবাদের নিরাকরণ-মানসে, প্রজারঞ্জন রাম কর্ত্তৃক অযোধ্যার লক্ষ্মীরূপিণী জানকীও নির্ব্বাসিতা হইতেন না। পুত্র

ভরতকে, তুচ্ছ সিংহাসনে, কতিপয় বৎসরের জন্য অধিরোহিত করিতে যাইয়া, জননী কৈকেয়ী এই সকল অনর্থ-সংঘটন করিয়াছিলেন। তাই মিলনকালে, মহাকবি ভবভূতি, ভরতকে উপস্থিত করেন নাই। আনন্দমগ্ন সামাজিকগণের চিত্তে নিরানন্দের বাতাস উঠিতে দেন নাই। ভরতের দর্শনে মনে ঐ সকল কথা জাগিলে রসভঙ্গ হইত, তাই ভবভূতি ভরতের নাম পর্য্যন্তও তুলেন নাই। এইজন্যই বলিতেছিলাম, বিষয়ের সদসদ্-বিচারে ও বর্জ্জন-নির্ব্বাচনে তিনি প্রায় কালিদাসের তুল্য ছিলেন।

ভাষা এক প্রকার দর্পণ। সেই দর্পণে লেখকের প্রকৃত মূর্ত্তির অনেকটা প্রতিবিম্বন পাওয়া যায়। আমরা কালিদাসকে দেখি নাই, ভবভূতিকে দেখি নাই, কিন্তু তাঁহাদের দুই জনের লেখায়, দুই জনকেই স্বতন্ত্রভাবে দেখিতে পাই। আবার কালিদাসের লেখায় ভবভূতিকে বা ভবভূতির লেখায় কালিদাসকে দেখিতে পাই না। লেখকহৃদয়ের প্রকৃত প্রভাব লেখকের লেখনীমুখে ভাষায় সংক্রমিত হয়। লেখকের ভাষাবিন্যাস-কৌশল যত অধিকই হউক না কেন, লেখক যতই শ্লেষাদি-অলঙ্কার-প্রিয় এবং বর্ণনাকুশল হউন না কেন, তাঁহার রচনার অক্ষরে অক্ষরে, তদীয় হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা ভবভূতির রচনার প্রতিপদে তাঁহাকে দেখিতে পাই, তাঁহার গম্ভীর, ভাবপ্রবণ ও প্রেমপূর্ণ পবিত্র হৃদয়খানির প্রকৃতস্বরূপ উপলব্ধি করি। যাহা উদার, যাহা পবিত্র, তাহার প্রতি যে তাঁহার কি পরিমাণে অনুরাগ ছিল, ন্যায়ের প্রতি যে তাঁহার কতদূর আস্থা ছিল, আবার

সেই-সঙ্গে ঘৃণিতের প্রতি, নীচের প্রতি, তরল ও আপাতমধুর বিষয়ের প্রতি যে তাঁহার কি অসীম অশ্রদ্ধা ছিল, তাহা তদীয় রচনার ছত্রে ছত্রে বেশ বুঝিতে পারা যায়। ক্ষণিক চমৎকারিতা সম্পাদনের বাসনায় তিনি গাম্ভীর্য্যের সীমা কদাচ অতিক্রম করেন নাই। সেই জন্যই অন্যান্য কবির কাব্যের ন্যায় ভবভূতির কাব্যে, আমরা, অনাবশ্যক স্থলে আদিরসের অবতারণা দেখিতে পাই না। আবশ্যক স্থলেও অতি সতর্কহস্তে, প্রবীণ শ্রীকণ্ঠ, উক্ত রসের আলোচনা করিয়াছেন। যেমন কোন একটি অপরিচিত জাতির জাতীয় চিত্রাবলী, সঙ্গীত, স্থাপত্য প্রভৃতির দ্বারা তাহার স্বরূপ অনেকটা বুঝিতে পারা যায়, ঐ জাতির জাতীয়ত্বের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিয়া কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তদ্রূপ, মহাকবি ভবভূতির রচনা, ভবভূতির কল্পিত মূর্ত্তির অঙ্গসৌষ্ঠব, কথাবার্ত্তা, আকার, ইঙ্গিত প্রভৃতির দ্বারাও তাঁহার সময়ের, এবং তিনি যে সমাজের অলঙ্কার ছিলেন, সেই সমাজের স্বরূপ, অনেকটা, আমরা জানিতে পারি।

কবিগণ কালের সাক্ষী, কবিগণ দেশের প্রকৃত ইতিহাস, একথা বর্ণে বর্ণে সত্য। মহাকবি ভবভূতির গুরুগম্ভীর লেখনী, তদীয় আবির্ভাব কালের যে প্রাঞ্জল ইতিহাস অঙ্কন করিয়া গিয়াছে, তাহা ভারতের একটি প্রধান গৌরবের বস্তু। সমাজ যখন উন্নতির চরমচূড়ায় উপনীত হয়, তখন তাহার কোন দিকের কোন অংশেই কোন প্রকার নীচতা থাকিতে পারে না, নীচতা স্থান পায় না। ভবভূতির সময়ে বিদর্ভের সামাজিক অবস্থা

ততদূর সমুন্নত ছিল কি না, জানি না. কিন্তু কবিবর যে একটি সমুন্নত সমাজের আদর্শ চিত্র নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার কাব্যপাঠে বেশ বুঝিতে পারি। তিনি দক্ষিণাপথের বরেণ্য বেদজ্ঞ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জপ, তপঃ, আরাধনা, যম, নিয়ম প্রভৃতি যে বংশের চির অনুষ্ঠেয়, তাদৃশ সমুচ্চ বংশে জন্মিয়া তিনি নিজেও বংশানুগত গুণগরিমায় অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে, তদীয় উন্নত হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি প্রতিভাসিত। তাঁহার ন্যায়, পাণ্ডিত্য এবং কবিত্বের একাধার তখন আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না।

কালিদাসের দ্বারা বিক্রমাদিত্যের রাজসভার ন্যায়, ভবভূতির দ্বারাও কান্যকুব্জপতি যশোবর্ম্মদেবের সভা অলঙ্কৃত ছিল। ভবভূতির প্রসার, খ্যাতি, সম্মান এত অধিক ছিল যে, কাশ্মীর-পতি ললিতাদিত্য কান্যকুব্জের যশোবর্ম্ম দেবকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, বলিয়াছিলেন—"তুমি যদি তোমার রাজ-সভার অলঙ্কার মহাকবি ভবভূতিকে একবার আমার সভায় পদার্পণ করাইতে পার, তবে আমি, তোমার যেমন ইচ্ছা, সেইরূপ সর্ত্তে সন্ধি করিতে পারি।[১]" কাশ্মীর এবং কান্যকুব্জের সেই মহাযুদ্ধের পরিণাম, মহাকবি ভবভূতির কাশ্মীরে চরণ-স্পর্শ! ভারতের—অথবা এই বিশাল পৃথিবীর ইতিহাসে কবির প্রতি এমন সম্মানের কথা আর শুনা যায় নাই। বিদর্ভের

১—কালিদাস ও ভবভূতি। পৃ—২১।

অভিমানী পণ্ডিতগণ, যে ভবভূতিকে অসূয়ার কটাক্ষে ব্যথিত করিতেন, সেই ভবভূতিকে তখনকার কালে, সুদূর কাশ্মীরের অধীশ্বর কত সম্মান করিলেন! ললিতাদিত্যের ঐ প্রস্তাব কেবল তাঁহার গৌরবের দ্যোতক নহে, উহা সমগ্র ভারতের স্পর্দ্ধার সূচক। ভারতের মনস্বিবৃন্দ যে গুণের পূজা করিতে চিরদিনই উৎসুক, এই সত্যের উহা প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মহাকবি ভবভূতির উত্তর-চরিতের সপ্তমাঙ্কে নাট্যসূত্রকার ভরত কর্তৃক অপ্সরাদের দ্বারা, রাম, সীতা এবং লবকুশের মিলনের যে অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা যখন দেখি, তখন পাশ্চাত্য মহাকবি সেক্ষপীয়রের হ্যামলেটের কথা মনে পড়ে। অভিনয়ের মধ্যে আর এক অভিনয় প্রদর্শনে, ভবভূতির ন্যায় সেক্ষপীয়রও কল্পনা-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। এক জনের প্রতিভায় পূর্ব্ব গগন উদ্ভাসিত, আর এক জনের প্রতিভায় পশ্চিম গগন আলোকিত। বিশাল গগনের দুই প্রান্ত জুড়িয়া দুই সূর্য্য সমুদিত হইয়াছিলেন, কতদিন, কত শত বৎসর হইল, তাঁহারা অস্তমিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সে প্রভা এখনও পূর্ব্ববৎ জগৎ আলোকিত করিতেছে! কত রাজবিপ্লব, কত প্রভঞ্জন, কত মহামারীতে ধরণীবক্ষঃ ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করিয়া গিয়াছে। উল্কার ন্যায় ক্ষণেকের জন্য আসিয়া, কত শক্তিশালী, কালের গর্ভে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে কত নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে, কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু প্রাগুক্ত সূর্য্যদ্বয়ের অপরিবর্ত্তনশীল কিরণমালা,

যুগযুগান্ত ধরিয়া, সমভাবে হাসিয়া হাসিয়া দশদিক বিমোহিত করিতেছে! রাহুর কবলে এ সূর্য্য ম্লান হয় না, মেঘের আবরণে এ সূর্য্যের কিরণ ঢাকিতে পারে না, নিয়তির নিয়মে এ সূর্য্য পরিচালিত নহে। যে দেশের সাহিত্য-গগনে এইরূপ সূর্য্যের উদয় হয়, সে দেশ ধন্য। মহাকবি ভবভূতি এবং সেক্ষপীয়রের আবির্ভাবে ভারত ও ইউরোপ ধন্য হইয়াছে, তাদৃশ মহাকবির জন্মভূমি বলিয়া জগতে চিরদিনের জন্য বরণীয় হইয়া রহিয়াছে; আর অমর কবির অমৃতময় করস্পর্শে তাঁহাদের স্বস্ব মাতৃভাষাও অমরতা লাভ করিয়াছে।

কেবল প্রতিভার সাহায্যে বা হস্তের কৌশলে যেমন চিত্র সর্ব্বতোভাবে নিরবদ্য করা যায় না, উহা করিতে হইলে চিন্তাশক্তির প্রয়োজন, অনুভব-নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ, কেবল প্রতিভার বলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাব্য প্রণীত হইতে পারে না। লেখকের মনে যদি ভাবের তরঙ্গ না থাকে, প্রেম, সহানুভূতি, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদের নিরাবিল ধারা প্রবাহিত না থাকে, তবে ভাষাগত সম্পদে লেখকের লেখা সম্পন্ন হইলেও, তাহার প্রতিবর্ণে প্রাণের অভাব অনুভূত হয়। কোন প্রতিমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সুমার্জ্জিত ও সুপরিচ্ছন্ন হইলেই, তাহাকে উত্তম বলা যাইতে পারে না। ঐ প্রতিমার প্রত্যেক অঙ্গে একটা এমন জীবন্ত ভাব থাকা চাই, যাহাতে, উহার প্রতি যে একবার দৃষ্টিপাত করিবে, সে আর নয়ন ফিরাইতে পারিবে না। ঐ জীবন্ত ভাবই

প্রতিমার সর্ব্বস্ব। উহারই প্রভাবে প্রতিমার এক একটি অঙ্গের ভঙ্গিতে রাশি রাশি ভাবের অভিব্যক্তি হয়। ঐরূপ প্রতিমার যিনি নির্ম্মাতা, তাঁহার হৃদয়ে যেমন অনন্ত ভাবের অসংখ্য লহরী নিয়ত নৃত্য করিয়া বেড়ায়, তদ্রূপ, যাঁহার লেখায় পাঠকের চিত্ত এক অপার্থিব আনন্দে, এক অননুভূতপূর্ব্ব অমৃতে আপ্লুত হয়, পাঠক আপনাকে ভুলিয়া যান, জগৎ ভুলিয়া যান, ঐ লেখা পড়িতে পড়িতে একেবারে তন্ময় হইয়া পড়েন, বর্ণিত ঘটনার সময়ে যাইয়া উপনীত হয়েন, তাদৃশ লেখকের চিত্তও যে ভাবের অমৃতধারায় নিয়ত অভিষিক্ত, কল্পনার উন্মাদে নিয়ত উন্মত্ত, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। যে নিজে কান্দিতে জানে না, সে কখন পরকে কান্দাইতে পারে না। যাহার নিজের হৃদয়ে উন্মাদ নাই, বা কল্পনার লীলাতরঙ্গ নৃত্য করে না, তাহার লেখায় কখন অন্যের হৃদয় উন্মত্ত বা তরঙ্গিত হয় না। ব্যাকরণ, ছন্দঃ, অলঙ্কার, শব্দ-সম্পাদ্, যুক্তি, ন্যায়, প্রকরণ-সঙ্গতি প্রভৃতি দ্বারাই রচনার সৌষ্ঠব নির্ণয় করা সঙ্গত নহে, লেখকের উৎকর্ষ অঙ্গীকার করা যায় না। কল্পনা ভাব, সৌন্দর্য্যানুভব, সদসদ্বিচার প্রভৃতি দ্বারা লেখককে বুঝিতে হয়, লেখকের মহাপ্রাণতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। যাঁহারা ভাবুক, হৃদয়ে যাঁহাদের চিন্তার লহরী নিরন্তর উত্থিত, তাঁহাদের রচনায় পাঠকের হৃদয় আপনিই ভাবের আবেশে অলস হইয়া আইসে। ভাষা তাদৃশ ভাবুক কবির ভাবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে থাকে, ভাবের সহকারিতা করে। ভাব ভাষাকে

আপনার ছাঁচে গড়িয়া লয়। ভাবের বৈদ্যুতী শক্তির সংস্পর্শে ভাষার সামর্থ্য তখন শতগুণ বাড়িয়া যায়। ভাবের শক্তি সহযোগে এইরূপে শক্তিশালিনী হইয়া, ভাষা তখন, উন্মুক্ত গগনে বসন্ত-সমীরণের ন্যায়, কবির কাব্যে সঞ্চরণ করিতে থাকে। ভাষা কেবল কবির মনের ভাব প্রকাশ করিয়াই তখন ক্ষান্ত হয় না। ভাষা তখন কবির উত্তাল চিন্তা-লহরীকে, পরিচারিকার ন্যায়, সন্তর্পণে গম্য স্থানে লইয়া যায়; কবির উদ্দাম কল্পনাকে সংযত করিয়া আনে। কবির আকাশ-কল্প হৃদয়ে কত কল্পনা কত ভাবে, কতরূপে মন্দাকিনী-তটে অমর-বালিকার ন্যায় খেলা করে। কখন তাহারা যুগপৎ বাহিরে আসিতে চায়, কখন আবার যুগপৎ কবিকে লইয়া উধাও হইয়া কোথায় চলিয়া যায়। কবি তখন শবের ন্যায় মর্ত্তে পড়িয়া থাকেন, আর তাঁহার প্রাণ কল্পনার বিমানে চড়িয়া নিমেষে স্বর্গমর্ত্তরসাতল ঘুরিয়া আইসে। কল্পনার এই স্বৈরগতিতে প্রেমিক কবির হৃদয় কিছুতেই বাধা দিতে পারে না। তখন কবির মনে হয় যে, যদি তাঁহার দশখানা মুখ হইত, বিশখানা হাত থাকিত, তাহা হইলে, হয়ত, তিনি তদানীন্তন হৃদয়-ভাবের কতকটা বলিতে বা লিখিতে পারিতেন। কবির এই দুরাশাকে কবির সহচারিণী ভাষা সংযত করিয়া আনে। কবিকে যেন হাতে ধরিয়া, গন্তব্যপথে লইয়া যায়। ভাব এবং ভাষার এই সম্বন্ধ যে কাব্যে যত ঘনিষ্ঠ, সে কাব্য তত মধুর, তত নির্দ্দোষ, তত অনুপম।

মহাকবি ভবভূতির কাব্যে ভাবের সহিত ভাষার ঐ সম্বন্ধ অতি সুদৃঢ়। ভাষা সর্ব্বত্রই ভাবের যেন অনুগামিনী। প্রেমোন্মত্ত মহাকবির প্রাণের ভাবের সহিত যেন একেবারে মিলিয়া মিশিয়া ভাষা চলিয়া গিয়াছে, কোনও স্থলে কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। যখন যেখানে অশরীরিণী কল্পনাসুন্দরী আপনার মনে যে গান গাহিয়াছেন, শরীরিণী ভাষা, তখন তথায় তাহা তৎক্ষণাৎ, ঠিক সেই সুরে, আপনার বীণায় ঝঙ্কার করিয়াছে। ভবভূতির কাব্যে, তাই, সকল বিষয়েই সম্পূর্ণতা দেখিতে পাই। কোন কবি, হয়ত আদি-রস-বর্ণনে দক্ষতম, অন্যান্য রসবর্ণনে তাঁহার তেমন নিপুণতা নাই। কোন কবি, হয়ত করুণরসে অদ্বিতীয়, রসান্তরের বর্ণন তাঁহার তত রুচিকর নহে। এইরূপে, কেহ একটি, কেহ দুইটি, কেহ বা দুই তিনটি রস পর্য্যন্ত বর্ণন করিতে পারেন। কিন্তু মহাকবি ভবভূতির ক্ষমতা এই অংশে অতুল। তিনি যখন যে রস ধরিয়াছেন, তাহারই চূড়ান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। যখন তাঁহার কল্পিত প্রণয়ের চিত্র দেখি, তখন মনে হয়, তেমনটি আর নাই। আবার যখন তাঁহার শান্তিময়ী কল্পনার মুগ্ধপ্রশান্ত মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন মনে হয়, এ ছবি জগতে অতুল। আবার যখন, কিছু পরেই তাঁহার বর্ণিত রৌদ্ররসের প্রচণ্ড মূর্ত্তি নয়ন-পথে পতিত হয়, তখন ভাবি, এ অংশেও তিনি অদ্বিতীয়। যখন গ্রীষ্মের প্রখর মধ্যাহ্নে, ঘনসন্নিবিষ্ট তরু-লতা-গুল্মে তিমিরাচ্ছন্ন গম্ভীর-মূর্ত্তি অরণ্যের এক প্রান্তে গম্ভীর-

কণ্ঠ পেচকের ফুৎকার শব্দ শ্রবণ করি, যখন সৌরতাপক্লান্ত তৃষিত কৃকলাসকে তরুস্কন্ধসুপ্ত অজগরের ঘর্ম্মবিন্দু পান করিতে দেখি, যখন সমরক্ষেত্রের উপরিদেশে, আকাশে, বিদ্যাধর ললনাকে, আগ্নেয়াস্ত্রের প্রভায় নিমীলিত-নয়না ও অস্ত্রের ঝনৎ-কারে মুহুর্মুহুঃ কম্পিতকায়া দেখিতে পাই, ভয়চকিতা কামিনী ত্রাসে আকুল হইয়া, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রিয়তমের অঙ্কে লুকাইতেছে, দেখিতে পাই, তখন মনে হয়, এই সব রসেও ভবভূতি বুঝি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাই বলিতেছিলাম, মহাকবি ভবভূতি যখন যে রসের বর্ণন করিয়াছেন, তখন সেইটিই সেই স্থলে সর্ব্বোত্তম হইয়াছে। এ অংশে, অর্থাৎ সকল রসের বর্ণনায় সমান কৃতিত্ব-প্রদর্শনে, তাঁহার সমকক্ষ আর কেহই নহেন। তিনি যেমন করুণরসের প্রস্রবণ, শান্তিরসের অপ্রতি-হত উৎস, ভয়ানকের অন্ধতমসাচ্ছন্ন গভীর গহ্বর, তেমনই রৌদ্ররসের যেন আগ্নেয়গিরি। ইহাদের যেটিকে যখন বর্ণন করিতে বসিয়াছেন, ভাষাও তখন তদনুযায়িনী মূর্ত্তিতে তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিয়াছে। ভাষার অভাবে ভাব-প্রকাশে বাধা পাইয়া তাঁহাকে দারুণ মনঃপীড়া ভোগ করিতে হয় নাই। এ অংশেও গুরু কালিদাস অপেক্ষা শিষ্য ভবভূতির কৃতিত্ব অধিক। কালিদাসের সবই মধুর, সবই সুন্দর। যাহা অসুন্দর, কালিদাস তাহার ত্রিসীমায়ও যান নাই। যাহা উৎকট, কালিদাস তাহা স্পর্শও করেন নাই। আর ভবভূতি, সুন্দর অসুন্দর, মধুর-উৎকট, সকলেরই সমানভাবে আতিথ্য করিয়াছেন। তবে

কালিদাসের কল্পনা শারদী জ্যোৎস্নার ন্যায় মধুরা, বসন্তের রাণীর ন্যায় সুন্দরী, আর ভবভূতির কল্পনা ঊষার ন্যায় স্নেহময়ী, তৃপ্তিময়ী, ও নিদাঘের সন্ধ্যার ন্যায় শান্তিদায়িনী। একটির প্রভাতরল রূপচ্ছটায় বিশ্ব বিমুগ্ধ, অপরটির স্নেহবর্ষী কর: স্পর্শে জগৎ সুযুপ্ত। একটি যৌবনের সুখস্মৃতির ন্যায় প্রীতি-দায়িনী, লাবণ্যপ্রতিমা সাধ্বী প্রিয়তমার ন্যায় হৃদয়-মোহিনী, অপরটি জননীর ন্যায় শান্তিদায়িনী ও দেবীর ন্যায় চিত্ত-বিশোধিনী। একটি সযত্ন-রক্ষিত উদ্যানের কুসুমভূষিতা লতিকা, অপরটি জনসঞ্চার-বর্জ্জিত গভীর অরণ্যের অযত্নবর্দ্ধিতা ব্রততী। একটি নানালঙ্কার-ভূষিতা সুকুমারী রাজনন্দিনী, অপরটি প্রকৃতি-দত্ত কুসুমমণ্ডনে বিমণ্ডিতা বনদেবতা। একটি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, অপরটি নবদুর্ব্বাদলশ্যামা। স্ব স্ব সৌন্দর্য্যে দুইটিই অতুলনীয়া। চপলার ন্যায়, কলিদাসের কাল্পনাসুন্দরীর আকাশে বেড়াইয়া তৃপ্তি, আর ভবভূতির মনস্বিনী কল্পনার কখন জনপ্রচারশূন্য গহন-বনে, কখন বা একেবারে রসাতলে যাইয়া,—যেখানে পৃথিবীর কেহ নাই, যেখানে কেহ দেখিবে না, চিনিবে না, সেই পাতালে যাইয়া একা একা বসিয়া থাকিতে তৃপ্তি। তাই একের কল্পনা বিমানে রামসীতাকে লইয়া বেড়াইতেছে, অপরের কল্পনা, সীতাকে পাতালে লইয়া নির্জ্জনে বসিয়া, কত আদর করিতেছে। কালি-দাসের কল্পনা যেন পদ্মরাগমণি, দীপ্তিতে দশদিক্ উদ্ভাসিত। আর ভবভূতির কল্পনা যেন নীলকান্তমণি, প্রভায় দশদিক্ শীতল হইয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষ! তুমি কত কোটি কোটি বৎসর

না জানি, কি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলে, তাই এতাদৃশ অমর-দুর্লভ রত্নে তোমার বক্ষঃ উজ্জ্বল হইয়াছে। যে দেশে এতাদৃশ প্রেমিক কবি জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশ ধন্য। যে ভাষা এতাদৃশ কবির কবিতায় অলঙ্কৃতা, সে ভাষা ধন্যা, আর সেই দেশের যাহারা অধিবাসী এবং সেই ভাষার যাহারা সেবক, তাহারাও ধন্য, তাহাদের মানব-জন্মধারণ সার্থক।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

বীরচরিত।

মহাকবি ভবভূতি-প্রণীত নাটকত্রয়ের মধ্যে, গুণানুসারে, উত্তর-চরিতের পরই মালতী-মাধবের নাম নির্দ্দেশ করা উচিত। কিন্তু যখন উত্তর-চরিত ও বীরচরিত,—দুই গ্রন্থই রাম-চরিতাবলম্বনে বিরচিত, তখন কাব্যামোদিগণের বোধসৌকর্য্যার্থে উত্তর-চরিতের পর বীরচরিতের আলোচনা করা যাইতে পারে। যদি বীরচরিত নাটকীয় গুণ-গরিমায় উত্তরচরিত অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইত, তবে ইহারই প্রথমে আলোচনা করিতাম। তাহা নহে বলিয়াই, সর্ব্বাগ্রে, ভবভূতির সর্ব্বোত্তম নাটক উত্তর-চরিত সমালোচিত হইয়াছে।

"বীরচরিতে রামের বিবাহ অবধি রাবণবধের পর অযোধ্যা প্রত্যাগমন ও রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বীররসাশ্রিত নাটক। বীরচরিতে ভবভূতির কবিত্বশক্তি বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকিলে নাটক প্রশংসনীয় হয়, সে সমুদয় তাদৃশ অধিক নাই। তথাপি, রামচরিতের এই অংশ লইয়া অন্য অন্য কবি যে সকল নাটক রচনা করিয়াছেন, বীরচরিত সে সকল অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উত্তম, তাহার সন্দেহ নাই।[১]"

১—সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত-সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব। পৃ—৭১—৭২

বীরচরিত সপ্তাঙ্ক নাটক। আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণের প্রথম হইতে ষষ্ঠ কাণ্ড পর্য্যন্ত ঘটনাবলী উপজীব্য করিয়া, ভবভূতি এই নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। তবে, নাটকত্বের শৃঙ্খলা-সম্পাদন-মানসে, কল্পনাকুশল ভবভূতি, সর্ব্বত্র রামায়ণের অনুসরণ করেন নাই, স্থানে স্থানে তাঁহাকে, নবীন পথে যাইতে হইয়াছে। এই নাটকের ঘটনাবলী প্রধানতঃ এইরূপ।ঃ—

১ম অঙ্ক। মহর্ষি বিশ্বামিত্র, রাম এবং লক্ষ্মণকে লইয়া, অযোধ্যা হইতে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। বিদেহপতি জনককে বিশ্বামিত্র স্বকীয় যজ্ঞে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে আসিতে পারেন নাই, ভ্রাতা কুশধ্বজকে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন। কুশধ্বজ আসিবার কালে, সীতা এবং উর্ম্মিলাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। রামের প্রতি সীতার এবং লক্ষ্মণের প্রতি উর্ম্মিলার পূর্ব্বরাগ জন্মিয়াছে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্রমে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছেন। অভিশপ্তা প্রস্তরময়ী গৌতমপত্নী অহল্যার শাপবিমোচন, তাড়কার নিধন, বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে, রামের দিব্যাস্ত্রপ্রাপ্তি, হরধনুর আমন্ত্রণ, তাহার আবির্ভাব, রাম কর্ত্তৃক সেই ধনুর্ভঙ্গ, তাহাতে প্রীত হইয়া কুশধ্বজ কর্ত্তৃক রামের করে সীতাকে, এবং লক্ষ্মণের করে উর্ম্মিলাকে সম্প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি, ভরত-শত্রুঘ্নকে যথাক্রমে মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি সম্প্রদানের প্রস্তাব, দশরথকে আনয়ন করিবার

জন্য অযোধ্যায় লোক-প্রেরণ ও এই শুভসংবাদ-জ্ঞাপন প্রভৃতি, অতি সংক্ষেপে, এই অঙ্কে বর্ণিত হইয়াছে। লঙ্কেশ্বর রাবণ সীতার পাণিপীড়নপ্রার্থী,—এই সংবাদ লইয়া দূতের আগমন ও তাহার নানাবিধ বিকত্থনাও এই অঙ্কে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

এই অঙ্কে, রামায়ণের বালকাণ্ডের প্রায় সমগ্র ঘটনাবলী আলোচিত হইয়াছে। তবে প্রভেদ এই—মহাকাব্যের প্রণেতা বাল্মীকি, রামায়ণের বালকাণ্ডে, পঞ্চদশবর্ষব্যাপিনী যে ঘটনাবলীর বর্ণন করিয়াছেন, দৃশ্যকাব্যের কবি ভবভূতিকে, অভিনয়ের সৌষ্ঠব সম্পাদনের বাসনায়, সেই ঘটনার প্রধান প্রধান অংশ একদিনে সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। সুতরাং, পঞ্চদশ বৎসরের ঘটনা একদিনে সম্পন্ন করিতে যাইয়া, বীরচরিতের রচয়িতাকে অনেক স্থলে, এই অঙ্কে, রামায়ণের সহিত ভিন্নমত হইতে হইয়াছে। বিশ্বামিত্র কর্তৃক বিদেহপতি জনকের আমন্ত্রণ, ও তৎপ্রতিনিধিরূপে তদীয় ভ্রাতা কুশধ্বজের সীতা এবং উর্ম্মিলাকে লইয়া বিশ্বামিত্রাশ্রমে আগমন রামায়ণে নাই। সকলের সমক্ষে রামসীতার প্রথম সন্দর্শন ও অনুরাগের বিষয় বীরচরিতে যেরূপ বর্ণিত, রামায়ণে সেইরূপ নহে। নাটকীয় উপযোগিতা রক্ষার জন্য, কবিকে নূতন প্রণালীতে ঐ সকল বিরচিত করিতে হইয়াছে। রাবণের দূতকে উপস্থাপিত করিয়া, ভবভূতি, অভিনেয় পদার্থের কৌতূহলজনকতা আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন। অন্যান্য ঘটনাগুলি, রামায়ণের বালকাণ্ডেও যাহা, ইহাতেও তাহাই, কিন্তু

বর্ণনার ক্রম এবং ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য, বীরচরিতে, রামায়ণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

২য় অঙ্ক। মাল্যবান এবং শূর্পণখার কথোপকথন। শূর্পণখার মুখে, সীতাকর্তৃক রামের কণ্ঠে বরমাল্যার্পণের সংবাদশ্রবণে মাল্যবানের ক্রোধ, রাবণকে উপেক্ষা করিয়া রামকে সীতা বরণ করিল, ইহাতে রাক্ষসপতি রাবণের ঘোর অপমান হইয়াছে, ইহার প্রতিবিধান আবশ্যক,—ইত্যাদি নানা চিন্তায় একান্ত আকুল, মন্দবুদ্ধি মাল্যবানের দ্বারা রামের প্রতিকূলে জামদগ্ন্যের উত্তেজনার সঙ্কল্প। শিব জামদগ্ন্যের গুরু, সেই শিবের ধনুর্ভঙ্গ শিষ্য জামদগ্ন্যের পক্ষে ঘোর গ্লানিজনক,—এই উত্তেজক কুপরামর্শে জামদগ্ন্যের ক্রোধাগ্নির সন্ধুক্ষণ। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের বর্ণিত এই ঘটনাবলীর কোনও উল্লেখই রামায়ণে নাই। ইহা কবির একেবারেই সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। দ্বিতীয় দৃশ্যে, বিদেহ নগরে আগত ক্রোধোদ্দীপ্ত ভার্গবের সহিত সীতাপতি রামচন্দ্রের সাক্ষাৎকার, সগর্ব্ব উক্তি প্রত্যুক্তি, যুদ্ধোদ্যম, শতানন্দ এবং জনকের উপস্থিতি, যুদ্ধের প্রায় আরম্ভ, এমন সময়ে অন্তঃপুরে বৈবাহিক স্ত্রী-আচারের নিমিত্ত রামের আহ্বান। রামের অন্তঃপুরে গমন, কিছুকালের জন্য আরব্ধপ্রায় যুদ্ধের বিরাম। এই দৃশ্যের ঘটনা—অর্থাৎ রামের সহিত জামদগ্ন্যের সাক্ষাৎকার রামায়ণেও বর্ণিত আছে সত্য, কিন্তু ইহাতে যে সকল বিশেষ বিশেষ কার্য্যের বিন্যাসপূর্ব্বক, নাটকের উপাদেয়তা

বৃদ্ধি করা হইয়াছে, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে ভবভূতির নিজের কল্পনা-প্রসূত।

৩য় অঙ্ক। এই অঙ্কে বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক পরশু-রামকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার বৃথা প্রয়াস। পুরোহিত তেজস্বী শতানন্দের সহিত জামদগ্ন্যের বিস্ময়জনক বীরোক্তি-বিন্যাস। পুত্রের পরিণয়োৎসবে আগত দশরথের সহিত জনকের যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিতি। অন্তঃপুর হইতে নববিবাহিত রামচন্দ্রের যোদ্ধৃবেশে আগমন। প্রবলপরাক্রমে যুদ্ধের উদ্যম। রঙ্গমঞ্চে যুদ্ধ-প্রদর্শন অসঙ্গত, তাই, এই স্থানেই এই অঙ্কের বিশ্রাম। এই অঙ্কের ঘটনাবলী সম্পূর্ণরূপে ভবভূতির স্বকপোল কল্পিত। রামায়ণে এতাদৃশ ব্যাপারের কোন নির্দ্দেশ নাই।

৪র্থ অঙ্ক। চতুর্থ অঙ্কের ১ম দৃশ্যে, রামচন্দ্রের হস্তে জামদগ্ন্যের পরাজয়-বার্ত্তার ঘোষণা। তার পর, রামের বিজয়-সংবাদে একান্ত চিন্তাকুলহৃদয়ে মাল্যবানের শূর্পণখার সহিত দিব্যযানে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ও অযোধ্যার জটিল রাজনীতিক বিষয়ের আলোচনা। দশরথের সংসারে বিশৃঙ্খলা-বিধানের নিমিত্ত মাল্যবান্ কর্ত্তৃক মন্থরারূপে শূর্পনখার প্রেরণ। এই সমস্তই কবির কল্পনা-প্রসূত। রামায়ণের সহিত এই অংশের তত সামঞ্জস্য নাই। দ্বিতীয় দৃশ্যে, জনক, দশরথ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রপ্রভৃতির রামের বিজয়বার্ত্তায় অতুল আনন্দ প্রকাশ। বিজিত জামদগ্ন্যের রামের সহিত আগমন। তাঁহার অভ্যর্থনা। বিশ্বামিত্রের আশ্রমে সকলের প্রস্থান। প্রস্থান-

কালে, প্রসন্ন জামদগ্ন্য-কর্তৃক, রামকে স্বকীয় বিশ্ববিজয়ী কার্ম্মুক অর্পণ। মন্থরারূপে শূর্পণখার উপস্থিতি ও তৎকর্তৃক রামের অভ্যুদয়ে বিমাতা কৈকেয়ীর আন্তরিক আনন্দ-জ্ঞাপন এবং রামের হস্তে মন্থরারূপিণী শূর্পণখার কৈকেয়ী-লিখিত এক পত্রের অর্পণ। সেই পত্রে বিমাতা কৈকেয়ীর দুইটি প্রার্থনা,—মহারাজ দশরথ, বহুপূর্ব্বে কৈকেয়ীর দুইটি প্রার্থনা-পূরণে প্রতিশ্রুত ছিলেন, আজ সেই প্রার্থনা,—তাহার একটিতে ভরত অযোধ্যার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবেন, এই কথা, অপরটির তাৎপর্য্য, মাত্র সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত রাম, পত্রপাঠ দণ্ডকারণ্যে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য নির্ব্বাসিত হউন। রামের এ সংবাদে অপার প্রীতি। রাম চিরদিনই কাননকুন্তলা প্রকৃতিসুন্দরীর রূপমুগ্ধ মনস্বী। বিশেষতঃ, দণ্ডকার অত্যাচারী রাক্ষসদিগকে শাস্তি দিবার জন্য, রাম পূর্ব্ব হইতেই একবার দণ্ডকায় যাইতে অভিলাষী ছিলেন, আজ জননী কৈকেয়ীর আদেশে রামের সে বাসনা পূর্ণ হইবে, আর প্রিয়তম ভ্রাতা ভরতেরও রাজ্য-প্রাপ্তি ঘটিবে, তাই রামের এত আনন্দ। শেষে মায়াবিনী মন্থরারূপিণী শূর্পণখার অন্তর্ধান। এই ঘটনাটি চতুর্থ অঙ্কে অন্তর্নিবিষ্ট না হইয়া, একটি স্বতন্ত্র অঙ্কে সন্নিবেশিত হওয়া উচিত ছিল। রামায়ণে রামনির্ব্বাসনে কৈকেয়ীই অপরাধিনী। বীরচরিতে কৈকেয়ী নিরপরাধা। তাঁহার অজ্ঞাতসারে, রামকে বিড়ম্বিত করিবার নিমিত্ত, মাল্যবানের পরামর্শে শূর্পণখা-কর্ত্তৃক এই সর্ব্বনাশ-সাধন। তৎপর, সকলের সম্মতি-

ক্রমে, রাম সীতা ও লক্ষ্মণের বনে গমন। প্রায়োন্মত্ত দশরথকে লইয়া ভরত এবং জনকের প্রস্থান। এই অঙ্কে রামায়ণের সুদীর্ঘ অযোধ্যাকাণ্ডের ঘটনাবলী বর্ণিত। কিন্তু রামায়ণ হইতে কবিকে অনেক দূরে সরিয়া যাইতে হইয়াছে। রামায়ণের বহুকালব্যাপী ব্যাপার, অতি সংক্ষিপ্ত, এমন কি, একদিনে সম্পন্ন করিয়া, মহাকবি ভবভূতি কাব্যের চমৎকারিতা ও মনোহারিতা বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। নাটকের ঘটনাবলী যত অল্প-কাল-সম্পাদনীয় হয়, ততই সুন্দর। যে নাটকে এই নিয়ম প্রতি-পালিত হয় না, তাহাকে সর্ব্বাংশে নিরবদ্য বলা যাইতে পারে না। রামায়ণে অযোধ্যা হইতে রাম নির্ব্বাসিত হয়েন। বীর-চরিতে রামের নির্ব্বাসন-ব্যাপার মিথিলায় সংঘটিত হয়। রামায়ণে, রামের বনযাত্রাকালে ভরত উপস্থিত ছিলেন না। বীরচরিতে ভরত মাতুলের সহিত মিথিলায় আসিয়া উপনত হয়েন এবং রামের স্বর্ণপাদুকা স্বহস্তে মস্তকে ধারণ করেন। ভবভূতি দীর্ঘকালের অনেকগুলি ঘটনা, একদিনে সম্পন্ন করিয়া-ছেন সত্য, তাহাতে নাটকের মর্য্যাদাও সুরক্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেক দিনের সম্পাদনীয় অনেকগুলি ঘটনা একদিনে সম্পন্ন করিতে যাইয়া, কবিকে একটু অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতা করিতে হইয়াছে। যদি একদিনেই এতগুলি ব্যাপার নিষ্পন্ন করিবার অভিপ্রায় ছিল, তবে, কতিপয় ঘটনা পরিহার করিলেই, অথবা এই এক অঙ্কের বৃত্তান্ত দুই অঙ্কে সন্নিবেশিত হইলেই নির্দ্দোষ হইত।

৫ম অঙ্ক। এই অঙ্কে, রাম-সীতা-প্রভৃতির পঞ্চবটী-বনে প্রবেশ ও অবস্থিতি এবং প্রগল্‌ভা শূর্পণখার নাসিকাদির ছেদন, রামের চিত্র-মৃগানুসরণ, লক্ষ্মণের রামের অনুসন্ধানে গমন, রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ ও সীতাপহারী রাবণের সহিত জটায়ুর যুদ্ধ প্রভৃতি ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। ঋষ্যমূক পর্ব্বতে মতঙ্গের আশ্রমে, রামের বিলাপ এবং সীতার অন্বেষণ প্রভৃতি মর্ম্ম-স্পর্শিনী ঘটনাপরম্পরায় এই অঙ্কের শেষ ভাগ বড়ই মনোহর হইয়াছে। ভাবুক ভবভূতি এই অঙ্কেও বোধ হয়, ভাবের আবেশে বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, যে সমুদয় ঘটনায় বহুদিনের প্রয়োজন, তাহা একদিনে সম্পন্ন করায়, চমৎকারিতার ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। বহুঘটনার সঙ্ক্ষেপে প্রদর্শনের প্রয়াসে, এই অঙ্কের কোন দৃশ্যই সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হয় নাই।

এই অঙ্কেই সীতাবিরহকাতর রামের দুঃখে লক্ষ্মণের আর্ত্তনাদ, দণ্ডকার, সর্ব্বত্র সীতার অন্বেষণ, রাবণ কর্ত্তৃক নির্ব্বা-সিত বিভীষণের রামের নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা, বিভীষণের সহিত রামের মিত্রতা, ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সকলের অবস্থিতি, সুগ্রীবের সহিত রামের পরিচয়, বালির প্রাণবিয়োগ ও মতঙ্গের যজ্ঞাগ্নি সাক্ষী করিয়া রামসুগ্রীবের মৈত্রীবন্ধন প্রভৃতি বহু বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঘটনাবাহুল্য এবং বহুদিন-সম্পাদনীয় বিষয়ের অল্পকাল মধ্যে সম্পাদন,—এই দুই কারণে, এই অঙ্কেরও অনেক স্থল একটু আপত্তিজনক হইয়াছে। এই একটি অঙ্কে, কবি ইচ্ছা করিলে, তিনটি অঙ্কও অবাধে করিতে

পারিতেন। বীরচরিতের এই সকল ত্রুটি সংশোধনের জন্যই, মহাকবি শ্রীকণ্ঠের উত্তর-চরিত-প্রণয়ন।

এই অঙ্কের প্রথম দৃশ্য সম্পূর্ণরূপে ভবভূতির কল্পিত। রামায়ণের আরণ্যকাণ্ডের প্রায় ছাপ্পান্নটি অধ্যায়ের বৃত্তান্ত, অতি সঙ্ক্ষেপে এবং সুকৌশলে, এই অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে বর্ণিত হইয়াছে। এই বিস্তৃত ঘটনাবলীর সঙ্ক্ষেপ করিতে যাইয়া, মহাকবি শ্রীকণ্ঠকে, মধ্যে মধ্যে অনেক নূতন ঘটনার বিন্যাস করিতে হইয়াছে। পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষার জন্য, রামায়ণের বহির্ভূত ঘটনা দ্বারা বর্ণনীয় বিষয়ের সংযোজন করিয়া, দৃশ্যের শৃঙ্খলা বিধান করিতে হইতেছে। তারপর, দ্বিতীয় দৃশ্যে, আরণ্যকাণ্ডের অবশিষ্টাংশ এবং সমগ্র কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই দৃশ্যেও, ভবভূতি, সর্ব্বাংশে রামায়ণের অনুসরণ করেন নাই। ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য-বিধান, কবি, স্বকীয় রচনার সৌষ্ঠবসম্পাদনের নিমিত্ত, নিজের ইচ্ছানুরূপ করিয়াছেন! রামায়ণে সুগ্রীব ও বালির মধ্যে ঘোর বিরোধ বর্ণিত, কিন্তু শ্রীকণ্ঠ, সুগ্রীবকে বালির পরম অনুরক্তরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। রামের সহিত বালির যে বিরোধ, তাহা মাল্যবানের উত্তেজনার ফল, সুগ্রীব তাহাতে নিরপরাধ। এই অংশেও, ভবভূতি রামায়ণের পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, অন্যান্য বিষয়েও, এই অঙ্ক রামায়ণের বর্ণনার ঠিক অনুযায়ী হয় নাই, ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্যের অন্যথা বিধান হইয়াছে।

৬ষ্ঠ অঙ্ক। এই অঙ্কে তিনটি দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম দৃশ্যের বৃত্তান্ত মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ মাল্যবানের প্রাসাদে সংঘটিত, দ্বিতীয় দৃশ্য লঙ্কেশ্বর রাবণের সর্ব্বতোভদ্র নামক মনোহর প্রাসাদে প্রদর্শিত, আর তৃতীয় দৃশ্য আকাশে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথম দৃশ্যের বিষয়,—দুশ্চিন্তাব্যাকুল মন্ত্রিবর মাল্যবানের ত্রাস, হনূমান্ কর্ত্তৃক স্বর্ণলঙ্কা প্রায় ভস্মীভূত হইল,—নেপথ্য হইতে এই দুঃসংবাদ ঘোষিত হইল, মাল্যবানের সমস্ত ষড়যন্ত্র বিফল হইল, তাই তাঁহার এত চিন্তা, এত ব্যাকুলতা। ত্রিজটার মুখে হনূমানের এই লঙ্কাদহন-ব্যাপার এবং রাবণের এক পুত্রের বিনাশ-সাধনের সংবাদ-শ্রবণে, ত্বরিতপদে মাল্যবানের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্যে,—সীতার রূপমুগ্ধ রাবণের সৌন্দর্য্যোন্মাদ বর্ণন, মন্দোদরীর রাবণ সমীপে আগমন ও রাম কর্ত্তৃক সমুদ্র-বন্ধন-সংবাদ-কথন, মন্দোদরীর কথায় রাবণের পরিহাস, সমস্ত নগরবাসীর একটা মহাত্রাস, বালির পুত্র অঙ্গদের রাবণ-সভায় আগমন ও সীতা প্রত্যর্পণের উপদেশ, রাবণের ক্রোধ, অঙ্গদ কর্ত্তৃক রাবণের প্রতি তিরস্কার-বর্ষণ, ও বহু রাক্ষসের বিনাশ-পূর্ব্বক বীরবর অঙ্গদের সগর্ব্বে অন্তর্ধান এবং পরিশেষে রাবণের যুদ্ধোদ্যোগ প্রভৃতি অতি নৈপুণ্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় দৃশ্যে লঙ্কার অধঃপতন চিত্রিত। রাম-রাবণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেলে পতন, গন্ধমাদন পর্ব্বতের আনয়ন. লক্ষ্মণের পুনরুজ্জীবন ও মেঘনাদ এবং রাবণের

সমরক্ষেত্রে চিরবিশ্রাম প্রভৃতি, অতিদক্ষতার সহিত মহাকবি অঙ্কিত করিয়াছেন। এই দৃশ্যে, ইন্দ্র এবং চিত্ররথের কথোপ-কথনে, নিপুণ মহাকবির কল্পনাবৈচিত্র্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।

৬ষ্ঠ অঙ্কের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী রামায়ণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার দৃশ্যসমূহের অঙ্কনপ্রণালী একেবারেই নূতন। রামায়ণের ঘটনানিচয়, ভবভূতি তাঁহার মনের মত করিয়া সাজাইয়াছেন। সুদক্ষ মালাকার যেমন বনের ইতস্ততঃ প্রস্ফুটিত কুসুমরাশির সঙ্কলনপূর্ব্বক, যে স্থানে যেটি গাঁথিলে সুন্দর দেখায়, তথায় সেই ফুলটি গাঁথিয়া মালা প্রস্তুত করে, তদ্রূপ সুদক্ষ শ্রীকণ্ঠ, রত্নাকরের অমূল্য রত্নাবলীর একটি একটি লইয়া, মনের সাধ মিটাইয়া মালা গাঁথিয়াছেন। যে রত্ন কবির নবগ্রথিত মালায় তত সুসমঞ্জস হইবে না, সেটিকে, শ্রীকণ্ঠ অসঙ্কোচে পরিহার করিয়াছেন। প্রয়োজন বশতঃ, হয়ত কোন রত্নকে আবার স্বকীয় কল্পনারূপী সুতীক্ষ্ণ শানযন্ত্রে উল্লিখিত করিয়া, মালায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই জন্যই রামায়ণের সহিত কবিকে, অনেক স্থলে, বিশেষতঃ এই অঙ্কে, একমত দেখিতে পাই না। এই জন্যই, রামপক্ষীয় এবং রাবণপক্ষীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধৃগণের যুদ্ধ, ইন্দ্রজিত্-কর্ত্তৃক নাগপাশে রামলক্ষ্মণের বন্ধন, রামের অগ্নিবাণে কুম্ভকর্ণের সৈন্যবৃন্দের ভস্মে পরিণতি, এবং ইন্দ্রজিতের মৃত্যু প্রভৃতি রামায়ণানুসারে কল্পিত হয় নাই।

৭ম অঙ্ক। এই অঙ্কে বীরচরিতের পরিসমাপ্তি। ইহার

প্রথমেই লঙ্কার শোকাকুলা অধিষ্ঠাত্রী দেবতার আবির্ভাব, এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তদীয় ভগিনী অলকার আগমন। তা'র পর, নেপথ্য হইতে, অগ্নিপরীক্ষিতা সীতার পবিত্রতায় দেবগণের আনন্দধ্বনি ও স্বর্গের দেবীবৃন্দের রামসীতার দর্শনে প্রস্থান প্রভৃতি বর্ণিত।

দ্বিতীয় দৃশ্যে, দিব্য পুষ্পকে বিভীষণের প্রবেশ, কারাবদ্ধদিগকে মুক্তি দান, এবং পুষ্পকে সকলের অযোধ্যায় যাত্রা বর্ণিত। আকাশপথে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে, রামকৃত সমুদ্র-বন্ধন, মলয় পর্ব্বতের অভ্রভেদিনী শিখরমালা, রজতরেখা সদৃশী কাবেরী তটিনী, নয়নরঞ্জিনী পম্পা, নীলস্নিগ্ধ দণ্ডকারণ্য, সমুচ্চ শৈলেয়, কৈলাস, অঞ্জন এবং গন্ধমাদন প্রভৃতির দর্শন ও বিমানবিহারী রাম-সীতা-প্রভৃতির অপার আনন্দের বিষয়, অতি পারিপাট্য-সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। ক্রমে হিমালয়ের পাদদেশে পুষ্পকের অবতরণ, অযোধ্যার দিকে গমন ও নগরের অদূরে শোকমগ্ন রাজপরিবারের সকলের আগমন এবং রামসীতার অভ্যর্থনা, রামের রাজ্যাভিষেক—প্রভৃতি চিত্রিত। এই দৃশ্যে, অন্যান্য অংশের সহিত রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের অন্ত্যভাগের আট অধ্যায়ের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তবে ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য রামায়ণের অনুযায়ী হয় নাই। রামায়ণের সহিত একটি বিষয়ে সবিশেষ প্রভেদ ঘটিয়াছে। পুষ্পকারোহণে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন রামায়ণে যেরূপ বর্ণিত, বীরচরিতে সেইরূপ নহে। রামায়ণে, রামের অনুচরগণের পুষ্পকে রামানুগমনের কথা

নাই। ভবভূতি অপেক্ষা রামায়ণের কবির পুষ্পকযাত্রার বর্ণনা অধিকতর প্রাঞ্জল হইয়াছে।

কবিবর ভর্ত্তৃহরি, রামের পুষ্পকযাত্রা, ঠিক রামায়ণের অনুসারে অঙ্কিত করিয়াছেন। এক বর্ণও ব্যতিক্রম করেন নাই। মহাকবি কালিদাস, রঘুর ত্রয়োদশে, রামসীতার বিমান-বিহারের অতি সুন্দর বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং ভবভূতিকৃত বিমানযাত্রার বর্ণনাকে সম্পূর্ণরূপে মৌলিক বলিতে পারা যায় না। অধোবর্ত্তিনী পৃথিবীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণে, ভবভূতির বিমান বিহারিণী কল্পনার যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভৌগোলিক পরিচয়ে অনাস্থানিবন্ধন, রামের লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় আসিবার পথ বর্ণন করিবার কালে, ভবভূতিকে মধ্যে মধ্যে একটু অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। অন্যান্য স্থানের ন্যায়, এই স্থলে, তাঁহার কল্পনার তত অবাধ গতি লক্ষিত হয় না। ভবভূতির এই বিমানবিহার-বর্ণন কালি-দাসের রঘুর ত্রয়োদশের সমকক্ষ না হইলেও, ভবভূতির পরবর্ত্তী কবিগণ ইহার ত্রিসীমাতেও যাইতে পারেন নাই। তাঁহারা ভবভূতিরই অনুসরণ করিয়াছেন। বালরামায়ণ এবং অনর্ঘরাঘব নাটকে ভবভূতির পথই অনুসৃত হইয়াছে।

রাজর্ষি জনক স্বয়ং যজ্ঞে দীক্ষিত ছিলেন বলিয়া, বিশ্বামিত্রের আমন্ত্রণে, তদীয় আশ্রমে যাইতে পারেন নাই, ভ্রাতা কুশধ্বজকে তথায় পাঠাইয়াছেন, সঙ্গে তাঁহার রাজকুমারী সীতা এবং উর্ম্মিলা গিয়াছেন। এই ঘটনাদ্বারা, তদানীন্তন নারীসমাজের চিত্র

কতকটা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। বিশ্বামিত্রের আশ্রমেই রামসীতা প্রভৃতির বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছে, রামের প্রতি সীতার এবং লক্ষ্মণের প্রতি উর্ম্মিলার পূর্ব্বরাগ জন্মিয়াছে। অথবা একটি একটি করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। ভবভূতির লেখা পাঠ করিলে, স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতের রমণীজাতির চিত্রাঙ্কনে ভবভূতির ধারণা কিরূপ ছিল। তাঁহার বর্ণনায়, কোনরূপ অনুচিত আড়ম্বর নাই, অস্বাভাবিক সুতরাং কৃত্রিম ব্যবহারের আরোপ নাই। যেরূপ স্থলে যেরূপ ব্যবহার চিরকাল হইয়া আসিতেছে ও হইবে, ভবভূতি, ঠিক তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। অপ্রকৃত আবরণে বর্ণনার কোন স্থল আবৃত করিয়া, তিনি কল্পনার অঙ্গহানি করেন নাই। ভাষা এবং কবিত্ব, এই দুই বিষয়েও বীরচরিত অসম্পন্ন নহে, বরং সুসম্পন্ন। অবশ্য উত্তরচরিতের পাঠকের তৃষা ইহাতে না মিটিতে পারে, কালিদাসের রঘুবংশ বা শকুন্তলার পাঠক ইহাতে না মজিতে পারেন, কিন্তু ঐ ঐ পুস্তক ব্যতীত, এমন আর কোন পুস্তক নাই, যাহাকে বীরচরিতের সহিত উপমিত করা যায়।

ইহার চিত্রগুলির প্রত্যেক খানিই ভবভূতির উজ্জ্বল প্রতিভার নিকষ স্বরূপ। মহাকবি যে, কত বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, কত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা যে কিরূপ তীক্ষ্ণ ছিল, তাহার দৃষ্টান্ত, বীরচরিতের প্রথম অঙ্ক হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার প্রথম অঙ্কপাঠে দেখি, চতুর্ব্বেদেই তাঁহার বিশিষ্ট অধিকার ছিল। অথর্ব্ব

বেদে তিনি একজন বিশেষবিৎ ছিলেন। দেশীয় আচার ব্যবহারমূলক শাস্ত্রে যে তাঁহার প্রাবীণ্য কত অধিক ছিল, তাহার প্রমাণ দ্বিতীয় অঙ্কে স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয়। উপ-নিষদ্-বিদ্যায়, যোগশাস্ত্রে এবং সেই সঙ্গে কর্ম্মকাণ্ডেও যে তিনি কিরূপ অদ্বিতীয় জ্ঞানী ছিলেন, তাহার প্রমাণ বীরচরিতের তৃতীয় অঙ্ক। রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ে যে তাঁহার অসা-মান্য জ্ঞান ছিল, তাহার দৃষ্টান্ত চতুর্থাঙ্কের প্রথম দৃশ্য। ইহা ব্যতীত, বীরচরিতের অবশিষ্ট অংশে, মহাকবির নানা-বিষয়িণী বিদ্যার ও ললিতগমনা কল্পনার প্রকৃষ্ট পরিচয় ছত্রে ছত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তবে প্রথম কাব্যে কবির কল্পনা যে একেবারে নির্দ্দোষ হইবে, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা অন্যায়। বীরচরিতের কল্পনাও সর্ব্বত্র নির্দ্দোষ নহে। রামের যে বৃত্তান্ত রামায়ণে বর্ণিত, সেই বৃত্তান্তের পুনর্ব্বর্ণনে ভবভূতি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাই চরমকৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। রামচরিতের যে সকল স্থলে একটু সংক্ষেপ হওয়া উচিত ছিল, এবং কবিকুলকেশরী বাল্মীকি যে সকল স্থলের, প্রয়োজনবোধে, সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন, ভবভূতি তথায় একটু বিস্তৃত বর্ণন করিয়া, সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। লোক-চরিত্রের দুর্ব্বল অংশ তিনি আদৌ অঙ্কন করেন নাই। দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস-যুক্ত পদের আঘাতে তিনি রচনার অঙ্গ-বৈকল্য ঘটাইয়াছেন। আবার সেই সঙ্গে ইহাও দেখাইয়াছেন যে, ভাষা, ব্যাকরণ, অভিধান, ছন্দঃ প্রভৃতির উপর তাঁহার কতদূর আধিপত্য ছিল,

সংস্কৃত ভাষাকে কত গম্ভীর আকারে পরিণত করা যাইতে পারে, সংস্কৃত সাহিত্যে, আদিরস বিনাও, কত আমোদজনক ভাবের বিন্যাস করা যায়, শব্দের সামর্থ্য কত অধিক, এবং এক একটি শব্দে কত রাশি রাশি ভাবের প্রকাশ সম্ভবপর। তিনি কল্পনার প্রসার যথেষ্ট দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে সৌন্দর্য্যের পরিপুষ্টি হয় নাই। তাহার বানরে পর্ব্বত ছুঁড়িয়া মারে, সমুদ্রের জল এক গণ্ডূষে প্রায় শেষ করিয়া ফেলে। এই প্রকার [illegible] প্রচুর আছে। এ সকল [illegible] অঙ্গ। সুতরাং ইহা সত্তবা নহে। তবে বীরচরিতে, তিনি, এমন অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা প্রণয়ন করিয়াছেন, যাহার একটির দ্বারাই তিনি সুকবি বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন। বীরচরিতের অনেক কবিতা তিনি স্বকীয় উত্তরচরিত-গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কুমারসম্ভবের অনেক শ্লোক যেমন রঘুবংশে পুনর্বিন্যস্ত হইয়াছে, তদ্রূপ, বীরচরিতের বহু কবিতা এবং বহু রসভাবময়ী রচনার উত্তর-চরিতে পুনর্বিন্যাস দেখিতে পাই। বীরচরিত প্রণয়ন করিয়া, কবির কল্পনার তৃষা মিটিয়াছিল না, বিদ্বন্মণ্ডলীও উক্ত কাব্যে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন না, তাই কবির উত্তরচরিতে উদ্যম। যৌবনের ভ্রম প্রৌঢ়ে সংশোধন করিয়া কবি, সংস্কৃত সাহিত্যের অনুপম অলঙ্কার উত্তরচরিত প্রণয়ন করিলেন।

বীরচরিত, মালতীমাধব এবং উত্তর-চরিত ব্যতীত, ভবভূতির অন্য কোন কাব্য ছিল কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা বড়ই

কঠিন। কিন্তু তাঁহার এমন কতগুলি শ্লোক পাওয়া গিয়াছে, যাহা উক্ত কাব্যত্রয়ে পরিদৃষ্ট হয় না। ঐ শ্লোকাবলী দৃষ্টে, মনে হয়, আমাদের মহাকবি, হয়ত, আরও দুই একখানি কাব্য প্রণীত করিয়া থাকিবেন। ভারতের দুরদৃষ্টতা বশতঃ, অন্যান্য বহুবিধ লুপ্ত রত্নের ন্যায়, সংস্কৃত ভাষার সেই সকল রত্নও বিলুপ্ত হইয়াছে। ভারতবাসী ভবভূতির সেই সমস্ত কাব্যামৃতের রসাস্বাদে বঞ্চিত হইয়াছে।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

মালতীমাধব।

"মালতীমাধব"—মহাকবি ভবভূতি প্রণীত কাব্যত্রয়ের অন্যতম। আলঙ্কারিকগণের নির্দ্দেশানুসারে, ইহা প্রকরণ-শ্রেণীয় দৃশ্যকাব্য। মালতীমাধব দশ অঙ্কে বিভক্ত। শকুন্তলা, উত্তরচরিত বা বীরচরিত প্রভৃতি নাটকের পাত্রাবলী ভারতীয় পাঠকের অপরিচিত নহে। রামায়ণ মহাভারত ভারতীয় আর্য্য-সন্তানগণের একপ্রকার নিত্যপাঠ্য গ্রন্থ। সুতরাং তৎতদ্ গ্রন্থের অবলম্বনে যে সমুদয় কাব্যনাটকাদি বিরচিত, তাহাদের পাত্রাবলীর অধিকাংশের সহিতই ভারতবাসীর পরিচয় থাকিবার কথা। কিন্তু মালতীমাধবের বিষয় অন্যরূপ। ইহার বৃত্তান্ত ভব-ভূতির কল্পনাপ্রসূত। অন্য কোন আর্ষ কাব্যের বিষয় উপজীব্য

করিয়া কবি ইহার প্রণয়ন করেন নাই। সুতরাং এই কাব্যের আলোচনায় পূর্ব্বে, ইহার পাত্রাবলীর পরিচয় আবশ্যক।

পুরুষ।

১। মাধব—বিদর্ভরাজের মন্ত্রী দেবরাতের পুত্র, পদ্মাবতী নগরে বিদ্যাশিক্ষার জন্য বাস করেন। ইনি মালতীর প্রণয়ার্থী। (কাব্যের নায়ক)।

২। মকরন্দ—মাধবের বন্ধু, মদয়ন্তিকার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী।

৩। কলহংস—মাধবের পরিচারক।

৪। অঘোর-ঘণ্ট, চামুণ্ডাদেবীর সেবক, কাপালিক।

৫। একজন দূত।

স্ত্রী।

১। মালতী,—পদ্মাবতীরাজের মন্ত্রী ভূরিবসুর কন্যা, মাধবের প্রতি অনুরাগিণী। (কাব্যের নায়িকা)।

২। মদয়ন্তিকা—নন্দনের ভগ্নী, মালতীর সখী, মকরন্দের অনুরাগিণী।

৩। কামন্দকী—বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনী, মালতীর শিক্ষয়িত্রী বা অভিভাবিকা মাধবের—উপদেশিকা।

৪। কপালকুণ্ডলা,—চামুণ্ডাদেবীর সেবিকা। অঘোরঘণ্টের শিষ্যা।

৫। সৌদামিনী, কামন্দকীর শিষ্যা, নানাবিধ ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারদর্শিনী।

৬। লবঙ্গিকা—মালতীর ধাত্রী-কন্যা, কলহংসের প্রীতিভাজন

৭। বুদ্ধরক্ষিতা,—কামন্দকীর শিষ্যা।

৮। অবলোকিতা—ঐ।

৯। পরিচারিকাগণ।

মালতীমাধবের বৃত্তান্ত এই প্রকার ঃ—

১ম অঙ্ক। ১ম দৃশ্যে নাটকের বৃত্তান্ত, অর্থাৎ মালতীমাধবের ভাবী প্রণয়ের সংক্ষেপে সূচনা। এই দৃশ্যে বর্ণিত হই-

য়াছে যে,—সন্ন্যাসিনী কামন্দকী এবং তাঁহার শিষ্যা সৌদামিনীর সমক্ষে, বিদর্ভপতির মন্ত্রী দেবরাত ও পদ্মাবতী-রাজের মন্ত্রী ভূরিবসু—উভয়ে উভয়ের সন্ততি-দ্বারা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই কারণে, দেবরাত, তাঁহার পুত্র মাধবকে, অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষার জন্য, পদ্মাবতী-নগরে প্রেরণ করিয়াছেন। এদিকে পদ্মাবতীরাজের বাসনা, তদীয় প্রিয় বয়স্য নন্দনের সহিত মালতীর পরিণয় হয়। সেই ভয়ে, কামন্দকীর উপর দেবরাত ভার দিয়াছেন যে, পদ্মাবতীরাজের অজ্ঞাতসারে মালতীমাধবের মিলন করাইতে হইবে। পদ্মাবতী নগরে মালতীমাধরের পরস্পর সন্দর্শন ঘটিয়াছে। উভয়ের প্রতিই উভয়ের অপার অনুরাগ জন্মিয়াছে। নগরের কিয়দ্দূরে, ভয়াবহ চামুণ্ডাদেবীর মন্দির। মন্দিরের পাদদেশে অসংখ্য জনপূর্ণ নগরের ভীষণ শ্মশানভূমি, কাপালিক অঘোরঘণ্টের পরিচারিকা কপালকুণ্ডলা, সেই শ্মশানে করালবদনা মুক্তকেশীর ন্যায়, আপন মনে খেলা করিয়া বেড়ায়। সংসারের কোন ধার সে ধারে না। নগরেব আরও দূরে, শ্রীপর্ব্বতে সৌদামিনীর ক্রীড়াস্থল। নানারূপ ভৌজবিদ্যায়, ইন্দ্রজালে, সে পর্ব্বতশীর্ষচর প্রাণিচয়কে নিয়ত চমকিত করে।

২য় দৃশ্যে, কলহংস মালতী-চিত্রিত মাধবের প্রতিকৃতি লইয়া উপস্থিত, মন্দারিকার নিকটে সে সেই ছবিখানি পাইয়াছে। কলহংস একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এমন সময়ে মাধবের সখা মকরন্দ, এবং কিছুপরে, মাধবও তথায় উপস্থিত। মাধবের ধীর-

ললিত গমন, উদাসীন নয়ন, চিন্তাকুল মুখচ্ছবি প্রভৃতি দর্শন করিয়া, মকরন্দ কত কি ভাবিতেছে। 'অকস্মাৎ প্রিয়বয়স্যের চিত্তে কিসের ভাবনা উদিত হইল?'—ভাবিতে ভাবিতে সুহৃদ্ মকরন্দ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমে মাধব-মকরন্দের কত কথোপকথন হইল। কামদেবায়তনের সমীপে মাধবের মালতীদর্শন প্রভৃতি বৃত্তান্তের বর্ণন, কলহংস কর্তৃক মাধব হস্তে মালতী-চিত্রিত মাধব-প্রতিকৃতির সমর্পণ এবং পশ্চাদ্দিক্ হইতে আগত মন্দারিকা-কর্তৃক উক্ত প্রতিকৃতির প্রতিগ্রহণ, ও মালতীর উদ্দেশে মাধবের প্রণয়-পত্রিকা লেখন প্রভৃতি বৃত্তান্তগুলি অতি নৈপুণ্যের সহিত রচিত হইয়াছে। মহাকবি ভবভূতিকে, এই কাব্যপ্রণয়নে, কোনরূপ আদর্শের অনুসরণ করিতে হয় নাই। লিখিতে বসিয়া কাহারও ইঙ্গিতে পরিচালিত হওয়া বা পরের বশে চলার ন্যায় বিড়ম্বনা আর নাই। কবিকে অন্যান্য কাব্যে, অর্থাৎ বীরচরিত বা উত্তরচরিতে, রামায়ণের বশে চলিতে হইয়াছে। সর্ব্বদাই,—যখন যে অক্ষরটি লিখিয়াছেন, সম্মুখস্থাপিত আদর্শের দিকে চাহিয়া লিখিতে হইয়াছে। কিন্তু মালতীমাধবে, কবিকে সে বিপদে পড়িতে হয় নাই। কবি নিজের ইচ্ছামত পথে গমন করিয়াছেন। স্বয়ং পরিপুষ্ট প্রণয়ের, বর্ণনায় যতটা উন্মুক্তহৃদয় হওয়া উচিত, কবি তাহাই হইয়াছেন।

২য় অঙ্ক। এই অঙ্কে দেখি, পদ্মাবতীর রাজা তদীয় মন্ত্রী ভূরিবসুকে আদেশ করিয়াছেন যে, আমার প্রিয়বয়স্য নন্দনকে

মালতীসম্প্রদান করিতে হইবে। এই কথার উত্তরে, মালতীর পিতা ভূরিবসু বলিয়াছেন,—"আপনার কন্যার প্রতি"মহারাজের যথেষ্ট কর্তৃত্ব।" এই কথার দুইটি অর্থ। প্রথমটি—অত্যন্ত বিনয়গর্ভ। প্রথম অর্থ ঃ—"আমার কন্যা মালতী মহারাজের আত্মকন্যা-সদৃশী, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে আমাকে বলা নিষ্প্রয়োজন। যেরূপ ইচ্ছা, অবাধে করিতে পারেন।" দ্বিতীয় অর্থ ঃ—"মহারাজের নিজের কন্যার উপর কর্তৃত্ব থাকিতে পারে, অপরের কন্যার সম্বন্ধে কোন অধিকারই মহারাজের নাই।" মালতীমাধবের পরস্পরের অনুরাগ-দর্শনে কামন্দকীর পরমা প্রীতি। তাঁহার গূঢ় সঙ্কল্প সিদ্ধির পথে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে ভাবিয়া, তিনি যতটা পারেন, মধ্যে মধ্যে সেই প্রণয়-ব্যাপারের সাহায্য করিতেছেন। মাধবের যে কত উন্নত-বংশে জন্ম, মাধব স্বয়ং যে কত স্পৃহণীয় গুণগ্রামে বিভূষিত, তাহা কামন্দকী মালতীকে অবসরক্রমে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দেন। উদয়নের সহিত বাসবদত্তার ও দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার এবং এইরূপ আরও কত গান্ধর্ব্ব বিবাহের ইতিহাস, অবসর পাইলেই, তিনি, মাধব-গত-হৃদয়া মালতীকে শুনাইয়া থাকেন। তাঁহার কথায়, মুগ্ধা মালতীর হৃদয়ে মাধবপ্রীতি, দিন দিন, বর্ষার কুলপ্লাবিনী নদীর ন্যায় ক্রমে উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে। রাজনন্দিনী মালতী, ক্রমেই আত্মবিস্মৃত হইতেছেন। একেবারে মাধবময়ী হইয়া পড়িতেছেন।

৩য় অঙ্ক। এই অঙ্কে, কামন্দকীর সুব্যবস্থাকৌশলে,

কামদেবায়তনের মনোহর উদ্যানে মালতী-মাধবের সাক্ষাৎকার হইয়াছে।' রাজ-সংসারের আর কেহ তাহা জানিতে পারে নাই। কামন্দকী স্বয়ং দূরে দূরে থাকিয়া, অদৃষ্টদেবতার ন্যায় মালতী-মাধবের শুভানুধ্যানে রত রহিয়াছেন। এমন সময়ে একটা প্রবল জনরব হইল যে, 'রাজার পশুশালা হইতে এক প্রচণ্ড ব্যাঘ্র হঠাৎ নির্গত হইয়া, নন্দনের ভগিনী মদয়ন্তিকার জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। মকরন্দ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া দুরন্ত ব্যাঘ্রের নিধন করিয়াছে বটে, কিন্তু সে নিজেও অত্যন্ত আহত হইয়া পড়িয়াছে, সংজ্ঞা নাই। তাহার গুণানুরাগিণী মদয়ন্তিকা একান্ত ভীত-হৃদয়ে শুশ্রূষা করিতেছে।' এই সংবাদে মাধব অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। এবং দ্রুতপাদ-বিক্ষেপে, মালতীর সহিত, তাহাদিগকে দেখিতে প্রস্থান করিয়াছেন। মৃচ্ছকটিকের ২য় অঙ্কের শেষে, হস্তিযুদ্ধের যে বর্ণনা আছে, মনে হয়, মহাকবি ভবভূতি, সেই আদর্শ হইতে এই ব্যাঘ্র- যুদ্ধের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও, ইহাতে মহাকবির কল্পনানৈপুণ্য অধিকতররূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

৪র্থ অঙ্ক। এই অঙ্কের প্রথমেই দেখি, মাধব এবং মকরন্দ, উভয়েই অচৈতন্য, মালতী মাধবকে এবং মদয়ন্তিকা মকরন্দকে ধরিয়া আনিতেছেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ, কামন্দকী, বুদ্ধরক্ষিতা লবঙ্গিকা ও আরও কতিপয় পরিচারিকা প্রবেশ করিলেন। রমণীগণের সমবেত শুশ্রূষার ফলে, ক্রমে মাধব মকরন্দ একটু একটু করিয়া সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইতেছেন। এমন সময়ে, তথায় রাজার

এক দূত আসিয়া মদয়ন্তিকাকে বলিল যে, তোমার ভ্রাতা নন্দনের নিকটে রাজা স্বয়ং আসিয়া বলিয়াছেন,—"মালতীকে তোমার করে সমর্পণ করাইব।" এই সংবাদে মদয়ন্তিকা ছুটিয়া গেল, মালতী এবং মাধব, মনের অসহ্য বেদনায় একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন; চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। এই বিপদে কে তাঁহাদের সহায় হইবে? রাজার ইচ্ছার প্রতিকূলে দাঁড়াইতে কে সাহস করিবে?—ভাবিয়া মালতীমাধব অবসন্ন-হৃদয়ে, একখণ্ড শিলাফলকে উপবেশন করিলেন। উভয়েরই সম্মুখে নৈরাশ্যের তরঙ্গভীষণ সমুদ্র। পার হইবার সম্ভাবনা স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না। কিন্তু দৃঢ়সঙ্কল্প কামন্দকী বলিলেন,—"ভয় নাই, তোমাদের মিলন করাইতে যদি প্রাণ যায়, তাহাতেও আমি প্রস্তুত।" ইতিমধ্যে মহারাণীর আদেশ লইয়া এক পরিচারিকা আসিল, এবং কামন্দকীকে কহিল যে, দেবীর আদেশ, আপনি সত্বর মালতীকে লইয়া আসুন। কামন্দকী মালতীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। হতাশ মাধব, তখন মনে মনে,—"যেভাবে পারি, যদি শ্মশানুবাসী শ্মশচদিগের নিকট, অথবা অভিলষিত-ফল-দায়ী শ্মাশানিক অপদেবতার নিকট আত্মমাংস বিক্রয় করিয়াও বাসনা পূর্ণ করিতে পারি, তবে তাহাও করিব"—এইরূপ স্থির করিয়া, মদয়ন্তিকা-নিরাশ মকরন্দের সহিত সিন্ধু-তীরে গমন করিলেন।

৫ম অঙ্ক। প্রথমাঙ্কে যে চামুণ্ডা-মন্দিরের কথা উক্ত হইয়াছে, এই অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের স্থান সেই মন্দিরের উপকণ্ঠ।

চামুণ্ডার সেবিকা, কাপালিক অঘোরঘণ্টের শিষ্যা, কপাল-কুণ্ডলা আসিয়া বলিল যে, তাহার গুরুর আদেশ, যে ভাবে হউক, একটি বালিকা আনিতে হইবে, সেই বালিকার রুধিরে চামুণ্ডার অর্চ্চনা হইবে। কপালকুণ্ডলা সেই বালিকার অন্বেষণে বাহির হইয়াছে। এ সময়ে তমস্বিনী রজনী জগৎ আচ্ছন্ন করিয়াছে; নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও নিজের নয়ন-গোচর হয় না। সন্ সন্ করিয়া প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু বহিতেছে। মানুষ ত দূরের কথা, বুঝি প্রাণভয়ে, হিংস্র শ্বাপদকুলও বনের নিবিড় অঞ্চলে লুকাইয়াছে। অদূরে শ্মশানের অগ্নিজিহ্বা এক এক বার লক্ লক্ করিয়া যেন বিশ্ব গ্রাস করিতে বাহির হইতেছে, চারিদিক আলোকিত হই তেছে, আবার পরমুহূর্ত্তেই সমস্ত অন্ধকারে ডুবিতেছে, তখন অন্ধকার ক্রমে, গাঢ়তর, গাঢ়তম আকার ধারণ করিতেছে। শ্মশানের সমীপে, মালতী-লাভ-বঞ্চিত, ভগ্নহৃদয়, মাধব উপনত, নিজের দেহের মাংস নিজহস্তে কাটিয়া অপদেবতাকে নৈবেদ্য-রূপে উৎসর্গ করিতে উদ্যত। এতকাল দেবতার অর্চ্চনাতেও মালতীরত্নের লাভ হইল না, এখন যদি অপদেবতার অনুগ্রহে, সে রত্ন লাভ করিতে পারেন, যাহাকে নয়নের অশ্রুতে পান নাই, তাহাকে হৃদয়ের শোণিতে যদি পান,—এই দুরাশায় মত্ত হইয়া, তথায় মাধব দাঁড়াইয়া। তিনি এক এক বার ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, আর শ্মশানভূমির ভৈরব দৃশ্যদর্শনে আপন মনে এক একটি কবিতা বলিতেছেন; শ্মশানের বিভীষণ আকার বর্ণনা করিতেছেন। ভয়ানকের এমন বর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যের

আর কোথাও নাই। এই বর্ণনা পড়িবার কালে, ভয়ানক রস যে কি পদার্থ, তাহা পাঠক, স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। ভবভূতি যদি, তাঁহার অন্য কোন 'মধুর-কান্ত-পদাবলী'-পরিশোভিত রচনা নাও করিতেন, আর মাত্র মালতীমাধবের এই ভয়ানক অংশটুকু লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও, তাঁহাকে আমরা মহাকবি বলিয়া পূজা করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। পাঠক! যদি উৎকট, ভয়ানক, বীভৎস প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত অর্থ অথবা প্রকৃত চিত্র দেখিতে চাও, তবে অনুরোধ করি, একবার মালতী-মাধবের পঞ্চমাঙ্কের এই অদ্ভুত অংশে দৃষ্টিপাত কর। [১]

মাধব যখন এইরূপ ভীষণ শ্মশানবক্ষে দাঁড়াইয়া আত্ম-বিসর্জ্জনে উদ্যত, সেই সময়ে, চামুণ্ডাদেবীর মন্দিরাভ্যন্তরে একটি বালিকার আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। মাধব, দ্রুত-পদে মন্দিরের দ্বারে উপনত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরাত্মা উড়িয়া গেল। দেখিলেন, কাপালিক অঘোরঘণ্ট ও

১—"Among his most impressive descriptions, where his hero repairs at night to a field of tombs, scarcely lighted up by the flames of funeral fires, and evokes the demons of the place, whose appearance, filling the air with their shrill cries and earthly forms, is painted in dark and powerful colours while the solitude, the moaning of the winds, the hoarse sound of the brook, the wailing owl, and the long-drawn howl of the jackal, which succeed on the sudden disappearance of the spirits, almost surpass in effect the presence of their supernatural terrors." –History of India, by Elphinstone. P 167.

সংস্কৃত অংশ একটু দুরূহ, তাই উদ্ধৃত হইল না।

কপাল-কুণ্ডলা নারী-শোণিতে দেবীর অর্চ্চনার নিমিত্ত, মালতীকে বধ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। মাধব তৎক্ষণাৎ, যেন সহস্র সিংহের বলে বলীয়ান্ হইয়া, মূর্চ্ছিতপ্রায়া মালতীকে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। কাপালিক উচ্ছৃঙ্খল অনুচর-বর্গের সহিত মালতীর অন্বেষণে ছুটিলেন। দেখিতে দেখিতে, সেই ভীষণ স্থান, আরও বিভীষণ আকার ধারণ করিল। মাধব উপায়ান্তর না দেখিয়া, মালতীকে বনমধ্যে পাঠাইয়া দিয়া, কাপালিকসৈন্যের সহিত যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন। কাপালিক অঘোরঘণ্টও মত্তহস্তীর বিক্রমে, মালতীনাথ মাধবকে আক্রমণ করিলেন।

৬ষ্ঠ অঙ্ক। মাধবের হস্তে নারীবধোদ্যত অঘোরঘণ্ট নিহত হইয়াছে। কপালকুণ্ডলা গুরুহত্যার প্রতিশোধ দিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।—এদিকে, রাজবাটীতে, নন্দনের সহিত মালতীর বিবাহের উদ্যোগ হইতেছে। কিন্তু মালতী-হিতৈ-ষিণী কামন্দকী সঙ্কল্প করিয়াছেন যে, নগরোপকণ্ঠে প্রতিষ্ঠাপিত শিবমন্দিরে মালতীমাধবের মিলন করাইয়া দিবেন, এবং বিবাহার্থী নন্দনের কথঞ্চিৎ আশা-পূরণের জন্য মকরন্দকে মালতীর বেশে নন্দনের নিকটে পাঠাইবেন। এই গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের মানসে কামন্দকী, নন্দনের সহিত মালতীর বিবাহ হইবার পূর্ব্বে, একবার নগরদেবতাকে মালতীর দ্বারা অর্চ্চিত করিবার জন্য, ঐ দেবমন্দিরে মঙ্গলালঙ্কৃতা, বিবাহ-শ্রী-সমুজ্জ্বলা মালতীকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার লবঙ্গিকা। মাধব এবং

মকরন্দ পূর্ব্বেই কামন্দকীর ইঙ্গিতক্রমে মন্দিরে আসিয়াছেন। রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। মন্ত্রিতনয়ার বিবাহের বিরাট্ শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য, নানাদিক্ হইতে, কত লোক আসিয়াছে। স্ত্রীপুরুষে রাজ-পথ ভরিয়া গিয়াছে। কেহ হস্তি-পৃষ্ঠে, কেহ উষ্ট্রচালিত শকটে, কেহ বা মুক্তাখচিত প্রাবারকে আবৃত শিবিকায় বসিয়া এই মহোৎসব দেখিতেছে। কামন্দকীর নির্দ্দেশমতে, মাধব এবং লবঙ্গিকা মন্দিরপার্শ্ববর্ত্তী উদ্যানের মধ্যে লুকাইয়া আছেন। আর কামন্দকী স্বয়ং, রাজা মালতীকে যে বহুমূল্য বিবাহ-পরিচ্ছদ পাঠাইয়াছেন, তাহা সহাস্য-বদনে দেখিতেছেন, ও যেন আনন্দে ডুবিয়া যাইতেছেন। বিষণ্ণবদনা মালতী, একবার ইতস্ততঃ সমবেত জনবাহিনীর দিকে চাহিতেছেন, একবার কামন্দকীর মুখের দিকে চাহিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িতেছেন, একবার আত্মহত্যা করিয়া সকল যাতনা হইতে নিষ্কৃতিলাভের বাসনা করিতেছেন। অদূরে, উদ্যানের এক বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া মাধব, মালতীর বিষাদ-মলিন মুখচ্ছবি দেখিতেছেন, তাঁহার বক্ষঃস্থল নয়ন-জলে ভাসিয়া যাইতেছে। কামন্দকীর গূঢ় উদ্দেশ্য কেহই বিদিত নহেন। মালতী জানেন, আজ নন্দনের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে, তাঁহার ইহজীবনের সকল সুখের, সকল আশার সমাধি হইবে। মাধব যন্ত্রচালিত পুতুলের মত, কামন্দকীর নির্দ্দেশে, উঠিতেছেন, বসিতেছেন। কেন যে আজ এই উঠা-বসা, বিড়ম্বনার উপর আবার কেন যে এই সকল বিড়ম্বনা, তাহা তিনি জানেন না। তিনি জানেন, কাম-

ন্দকী তাঁহার চিরকল্যাণ-কামিনী, তাই অবিচারিত-হৃদয়ে, তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতেছেন। ওদিকে, নন্দনের বিবাহের শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য, রাজপথের দুইদিকে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়া, শোভাযাত্রা-দর্শনের প্রতীক্ষায় রাজবাটীর তোরণের দিকে চাহিয়া আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে যে কি ব্যাপার হইতেছে, তাহারা তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেছে না।

মালতী, নন্দনের হস্তে পড়া অপেক্ষা মাধবকে ভাবিতে ভাবিতে প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রিয়সখী লবঙ্গিকা তাঁহার এ সঙ্কল্পে বাধা দিবে,—ভাবিয়া, সাশ্রুনয়না মালতী, পুরোবর্ত্তিনী লবঙ্গিকার চরণপ্রান্তে লুঠাইয়া পড়িতেছেন। এবং মাটিতে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কান্দিতেছেন। লবঙ্গিকা আর কালবিলম্ব না করিয়া, অদূরস্থিত মাধবকে সঙ্কেত করিলেন। মাধবও নিকটে আসিলেন। মকরন্দ তখন লবঙ্গিকার স্থানে, মাধবকে দাঁড় করাইয়া দিলেন। চকিতে, নীরবে এই কাজগুলি হইয়া গেল। মৃত্তিকালুণ্ঠিতা স্বর্ণ-প্রতিমা মালতী, আপন মনে, মাধবের উদ্দেশে কত কি বলিতে লাগিলেন, কত কান্দিলেন। তাঁহার বিলাপে মন্দিরমধ্যাসীন পাষাণ-মূর্ত্তির হৃদয়ও যেন বিগলিত হইল। নির্ব্বাক্ মাধব, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, তাঁহার জীবনতোষিণীর সেই বিলাপগাথা শুনিতে লাগিলেন। আর আত্মগোপন করিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। তিনি, অপ্রবুদ্ধভাবে, মালতীর দুই একটী কথার উত্তরে আশ্বাস প্রদান করিলেন। মুগ্ধা, আত্মত্যাগে কৃতনিশ্চয়া মালতী, সে কথা

লবঙ্গিকার ভাবিলেন। তার পর মরণে নিশ্চয় করিয়া, মুদ্রিত-নয়না মালতী আপনার মুক্তানির্ম্মিত কণ্ঠহার, স্মৃতিচিহ্নরূপে, লবঙ্গিকার গলায় পরাইবার মানসে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; দাঁড়াইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি অবাক্,—একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।—তখন তাঁহার অবস্থা, কালিদাসের তপঃসিদ্ধা পার্ব্বতীর অনুরূপ। তখন যথার্থই মালতী —

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টিঃ
নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী
মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ
————ন যথৌ ন তস্থৌ ॥

এমন সময়ে তথায় সস্মিতমুখী কামন্দকী প্রবেশ করিলেন এবং পার্ব্বতী-পতি মহাকালের সমক্ষে মালতীমাধবের মিলন করাইয়া দিলেন। তখন বধূ মালতী কামন্দকীর চরণে প্রণাম করিলেন। কামন্দকী কহিলেন—"যাও মাধব! মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে, উদ্যানের মধ্যে, ঐ দীর্ঘিকাতীরে তোমাদের বিশ্রামের জন্য লতা-কুঞ্জ নির্ম্মিত করিয়া রাখিয়াছি, তথায় অবলোকিতা বিবাহের সমস্ত মঙ্গলানুষ্ঠান করিতেছে, তথায় যাইয়া বিশ্রাম কর, যতক্ষণ মদয়ন্তিকা ও মকরন্দ না আসিবে, ততক্ষণ তথায় অপেক্ষা করিও। মা মালতি! সম্পদে বিপদে, জীবনে মরণে, যিনি তোমার একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র সহচর, তোমার সেই হৃদয়েশ্বরের অনুগমন করিও। মা, এতদিনে আমি তোমাদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলাম।" মালতীকে লইয়া মাধব অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে

কামন্দকীও, মালতীর পরিত্যক্ত বৈবাহিক পরিচ্ছদে মকরন্দকে ঠিক মালতীর মত সাজাইয়া, লবঙ্গিকা ও মালতীরূপী মকরন্দের সহিত চলিয়া গেলেন।

৭ম অঙ্ক। এই অঙ্কের ঘটনা বড়ই কৌতুকাবহ। ইহার প্রথমেই দেখি,—কামন্দকীর অন্যতম শিষ্যা, মালতীর সখীস্বরূপা বুদ্ধরক্ষিতা আসিয়া বলিতেছে যে, নন্দনের বিড়ম্বনার চরম হইয়াছে! মালতী-বেশ-ধারী মকরন্দের হস্তে, বিবাহের রাত্রিতেই, মালতী-প্রণয় বিমূঢ় নন্দনের লাঞ্ছনার একশেষ ঘটিয়াছে। মালতী অমাত্য ভূরিবসুর কন্যা, সুতরাং অমাত্যের ভবনেই বিবাহ হইবার কথা, হইয়াছিলও তাহাই। মহারাজ স্বয়ং নন্দনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, সুতরাং বরপক্ষের বিপুল আয়োজন। জামাতা নন্দন বিবাহের পর বাসর ঘরে যাইয়া, কিছু পরেই রাগিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন। 'এরূপ স্ত্রীর আর মুখদর্শন করিবেন না,' বলিয়া গিয়াছেন। ব্যাপার যে কি, জামাতা যে কেন এত ক্রোধান্ধ হইয়া চলিয়া গেলেন,—যে মালতীর জন্য এই সাগর-বন্ধন, এক রাত্রিতেই তাহার প্রতি এত বিরক্তি?—এইরূপ নানা বিতর্কে, মন্ত্রিভবনের অনেকেই উন্মনা; নহেন কেবল কামন্দকী, লবঙ্গিকা ও আর দুই একজন। অপর সকলেই অবাক্। বিবাহ-রাত্রিতে ভ্রাতা নন্দন কোথায় চলিয়া গিয়াছে, শুনিয়া, ভগ্নী মদয়ন্তিকা আসিয়াছে, আসিয়া লবঙ্গিকার সহিত কত কথা কহিতেছে, 'মালতী নিশ্চয়ই কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, নতুবা নন্দন এমন করিবেন

কেন,'—বলিয়া নন্দনসোদরা মদয়ন্তিকা মালতীর প্রকৃত ননদের কার্য্য করিতেছে। কিন্তু সে চিরদিনই মালতীকে ভালবাসে। মালতী তাহার অভিন্নহৃদয়া সখীর সদৃশী। বুদ্ধরক্ষিতা ও লবঙ্গিকায় কত কথা হইল। শেষে সকলে মিলিয়া রাত্রি-জাগর-কাতরা মালতী যেখানে নিদ্রিতা, সেই কক্ষে উপনীত হইলেন। মদয়ন্তিকা জানে, পালঙ্কে যথার্থই মালতী নিদ্রিতা। কিন্তু সে যে মালতী নহে, মালতীর পরিচ্ছদধারী মকরন্দ নিদ্রিতের ভাণ করিয়া আছে, তাহা মদয়ন্তিকা জানিতে পারে নাই। বুদ্ধরক্ষিতা বা লবঙ্গিকাও কোন কথা তাহার নিকটে ভাঙ্গে নাই। বেশ গুরুগম্ভীর হইয়া তাহারা রহস্য রক্ষা করিতেছে। ক্রমে তাহাদের অনেক কথা উঠিল। সেই মালতীবেশী মকরন্দের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মদয়ন্তিকা, বুদ্ধরক্ষিতার কৌশলে, মনের কপাট খুলিয়া দিল। সেই যে ব্যাঘ্রের হস্ত হইতে প্রাণপণ করিয়া মকরন্দ মদয়ন্তিকাকে রক্ষা করিয়াছিল, সেই যে মকরন্দ নিজে মরিতে মরিতে মদয়ন্তিকাকে বাঁচাইয়াছিল, মদয়ন্তিকা একে একে সেই সকল উপকারের উল্লেখ করিতে করিতে একেবারে অধীর হইয়া পড়িল। সে চিরদিন মকরন্দের মধুরমূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে দেহপাত করিবে, সেও তাহার শ্রেয়ঃ, তবুও অন্যত্র বিবাহিত হইবে না, ইহাই তাহার দৃঢ় সঙ্কল্প,—এইরূপ কথা হইতে হইতে, ক্রমে মেঘ আরও ঘন হইয়া আসিল। মালতীরূপী মকরন্দ কৃত্রিম নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া, পূর্ব্ব নির্দ্দেশমতে মদয়ন্তিকার করগ্রহণ

করিল ও বাটীর পশ্চাদ্দিকের গুপ্ত দ্বার দিয়া, মালতীমাধব যে কুঞ্জে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইল। বুদ্ধ-রক্ষিতা ও লবঙ্গিকা এই গুপ্ত-বিবাহের যেন বরযাত্রী হইয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

৮ম অঙ্ক। কপালকুণ্ডলা কর্ত্তৃক মালতীহরণ এই অঙ্কের প্রধান ঘটনা। মদয়ন্তিকা, মকরন্দ, বুদ্ধরক্ষিতা প্রভৃতি, গুপ্ত পথে, মালতীমাধবের বিলাসকুঞ্জে আসিতেছিল, পথিমধ্যে নন্দন-প্রেরিত নগরপালগণের সহিত মকরন্দের বিষম কলহ বাধিয়াছে। সকলে একযোগে নন্দনকে আক্রমণ করিয়াছে। উদ্যানের অদূরে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে; নগরে মহা হুলস্থূল পড়িয়াছে। উদ্যানমধ্যবর্ত্তী মাধব এই সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরাক্রমে নগরপালগণ পলায়ন করিয়াছে। আহতকায় মকরন্দকে লইয়া মাধব পুনরায় কুঞ্জে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু কুঞ্জ শূন্য। তাঁহারা আসিবার পূর্ব্বেই দুষ্টা, প্রতিহিংসা-পরায়ণা কপালকুণ্ডলা আসিয়া, বলপূর্ব্বক মালতীকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে।

৯ম অঙ্ক। কপাল-কুণ্ডলার হস্তে পড়িয়া, মালতী ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিতা হইতেছেন। সেই অবস্থায়, তাঁহাকে নরকপাল-মালিনী কপালকুণ্ডলা চামুণ্ডার মন্দিরে লইয়া যাইতেছে। গুরু অঘোরঘণ্ট, মালতীরূপ অম্লান কুসুমের উপহারে চামুণ্ডা দেবীর অর্চ্চনা করিবে,—ভাবিয়াছিল। মাধবের জন্য গুরুর সে সঙ্কল্প ভগ্ন হইয়াছে। মাধবের হস্তে অঘোরঘণ্ট প্রাণ হারাইয়াছে,

তাই আজ শিষ্যা কপালকুণ্ডলা প্রতিশোধ লইতে বসিয়াছে; প্রাণপণে গুরু-ঘাতকের সর্ব্বনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

মাধব মালতীকে হারাইয়া কখন উন্মত্ত, কখন মূর্চ্ছিত হইতেছেন। কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশীর পুরূরবার ন্যায়, বনের তরুলতা, পশুপক্ষী—সকলের নিকটে, বিরহোন্মত্ত মাধব, তাঁহার অপহৃত রত্নের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। মাধবের এই বিরহোন্মাদের বর্ণনা অনেকটা বিক্রমোর্ব্বশীর বর্ণনার অনুরূপ। তবে এই বিরহের বর্ণনে ভবভূতি কালিদাসের ন্যায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। আবার সত্যের অনুরোধে ইহাও বলিতে বাধ্য যে, এক কালিদাস ব্যতীত অনার্য কবিকুলের মধ্যে, আর কেহই ভবভূতির এই বর্ণনার ত্রিসীমাতেও আসিতে পারেন নাই।

বিক্রমোর্ব্বশীতে উর্ব্বশীকে হারাইয়া, পুরূরবা একাকী, বনে বনে, কখন কান্দিয়া, কখন হাসিয়া, পাগলের মত বেড়াইয়াছিলেন; সঙ্গে আর কেহই ছিল না। আবার যখন উর্ব্বশীকে পাইলেন, তখনও পুরূরবা একাকী, অন্য কেহ উর্ব্বশী-প্রাপ্তির কারণ হয় নাই। আর মালতীমাধবের এই অঙ্কে, উন্মত্ত মাধবের সহচর মকরন্দ মাধবকে আশ্বাসিত করিতেছেন; মূর্চ্ছার সময়ে কোলের উপর রাখিয়া সেবা করিতেছেন; জ্ঞানের সময়ে, প্রবোধ দিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও কান্দিতেছেন।

অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল। মালতী-বিষয়ে মাধব-মকরন্দ একপ্রকার নিরাশ হইয়াছেন। কিন্তু দৈবের অনুগ্রহে,

সৌদামিনী, কৌশল করিয়া, কপালকুণ্ডলার কবল হইতে মালতীকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া মাধবের হস্তে সমর্পণ করিল। মালতী-মাধবের পুনর্জীবন লাভ হইল!

১০ম বা শেষ অঙ্ক। এই অঙ্কে দেখি,--কামন্দকী,--যাঁহার প্রাণপাতিনী চেষ্টার ফলে ও অদ্ভুত কৌশলে মালতী-মাধবের মিলন হইয়াছিল, যিনি সংসার-বিরাগিণী হইয়াও, মালতী-মাধবের প্রতি অকৃত্রিম ও অপার স্নেহ নিবন্ধন, সম্পূর্ণ সংসারিণী সাজিয়াছিলেন, সেই কামন্দকী, মালতীর শোকে একান্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। লবঙ্গিকা উচ্চৈঃস্বরে 'মালতী মালতী' বলিয়া কান্দিতেছে। কামন্দকী ধ্যানস্তিমিতার ন্যায়, বজ্রাহতার ন্যায়, একখণ্ড শিলাতলে বসিয়া তাঁহার স্নেহপ্রতিমা মালতীর কথা ভাবিতেছেন। নয়নের জলে, তাঁহার রূক্ষ গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। যাহার মোহে এতদিন বিদ্যুতের মত ছুটাছুটি করিয়াছেন, সন্ন্যাসিনী হইয়াও সন্ন্যাস-ধর্ম্মের বহির্ভূত সংসারজালে আবদ্ধ হইয়া আছেন, আজ সে মায়াবন্ধন কাটিয়া গিয়াছে। মালতী-কুসুম, চিরদিনের মত, কপাল-কুণ্ডলা ছিঁড়িয়া লইয়াছে, আর সে ফুল ফুটিবে না। কামন্দকী চারি দিক্ অন্ধকার দেখিতেছেন। এমন সময়ে, তথায় মাধব ও মকরন্দ উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে তাঁহাদের মালতী। সকলের সকল অবসাদ কাটিয়া গেল। নগরদেবতার উদ্যান আনন্দের সাগরে নিমগ্ন হইল। মকরন্দের কথায় সকলে জানিলেন যে, সৌদামিনীর কৌশলে, কপালকুণ্ডলার কবল হইতে মালতী রক্ষা পাইয়াছেন।

রাজা মালতীমাধবের এই পরিণয় ব্যাপারের আমূল বিদিত হইয়া, নিরতিশয় প্রীতি প্রকাশ করিলেন। মাধবের বীরত্বের ও মকরন্দের মাধবের প্রতি প্রগাঢ় সৌহৃদ্যের কথা শ্রবণে, তাঁহার চিত্ত আনন্দে ভরিয়া গেল। নন্দন যে বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও তাঁহার অবিদিত রহিল না। তিনি মালতী-মাধবের মিলনে সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন। এবং উপরন্তু, মাধবের নিকটে এক দূত পাঠাইয়া জানাইলেন যে, মদয়ন্তিকাকে মাধবের সখা মকরন্দের করে তিনি অর্পণ করিলেন।

এদিকে দুহিতা মালতীর শোণিতে চামুণ্ডার অর্চ্চনা করিবার জন্য কপাল-কুণ্ডলা তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, এই কথা স্নেহময় পিতা ভূরিবসু শ্রবণ করিয়া, বহ্নিপতনের দ্বারা প্রাণনাশে উদ্যত হইয়াছেন। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়াছে। ইতিমধ্যে সৌদামিনী আসিয়া মালতীর সংবাদে মন্ত্রিবরের প্রাণরক্ষা করিল। সকলে সানন্দ-হৃদয়ে মালতীমাধবের ও মদয়ন্তিকা-মকরন্দের শুভপরিণয় মহোৎসবে সম্পন্ন করিলেন। পদ্মাবতীশ্বরের অনুমতিক্রমে রাজ্যের সর্ব্বত্র আনন্দের যেন হাট বসিল। যে যেখানে ছিল, মালতীমাধবের মিলন দেখিতে আসিল। দুর্ভাগ্য নন্দনের যে কি পরিণাম হইল, তাহা আর কেহই জানিল না বা জানিতে চাহিলও না।

ত্রিংশ অধ্যায়।

শেষ কথা।

এতক্ষণে মালতীমাধবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় শেষ হইল। এই প্রকরণে, মহাকবি ভবভূতি, স্বকীয় কবিত্ব-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন সত্য, কিন্তু দীর্ঘ দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের বিন্যাস করিয়া, কবিবর, দৃশ্যাববোধের পক্ষে কিছু ব্যাঘাত করিয়াছেন। তবে, যে সমুদয় চরিত্রের দ্বারা মালতী-মাধবের অঙ্গ অলঙ্কৃত, সেগুলিতে, কবি, সৃষ্টি-নৈপুণ্যের পর্য্যাপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

মালতী, মাধব, কামন্দকী, মকরন্দ, মদয়ন্তিকা, কপালকুণ্ডলা, কলহংস, লবঙ্গিকা, বুদ্ধরক্ষিতা প্রভৃতির প্রত্যেকেই নিজের এক একটা বিশেষ ধর্ম্মে পরিস্ফুট। কাহারও সহিত কাহারও চরিত্র-শবলতার আশঙ্কা নাই। প্রত্যেকেই অন্য আর এক জন হইতে ভিন্ন, সম্পূর্ণ পৃথক্। ভবভূতির অন্য দুইখানি নাটকের যে বিষয়, তাহার সহিত, ইহার কোন অংশেই তুলনা হইতে পারে না। ইহার বিষয় কবির সম্পূর্ণ স্বকপোল-কল্পিত। প্রণয় এই নাটকের বর্ণনীয়। প্রণয়ের জন্য মাধব আপন দেহের মাংস তুলিয়া দিতে গিয়াছিলেন, ইহা এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। মাধব যেমন প্রণয়ের, তেমনই দয়ারও অগাধ সমুদ্র। শৌর্য্যবীর্য্যের তিনি অপ্রতিম আধার। ভবভূতির এই মাধব-সৃষ্টি দেখিলে, কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের অগ্নিমিত্রের

কথা মনে পড়ে। তবে অগ্নিমিত্র অপেক্ষা মাধবের চরিত্র সমধিক উন্নত। অগ্নিমিত্র কামুক। মাধব প্রেমিক। মালবিকাগ্নিমিত্রের পরিব্রাজিকার আদর্শে মালতী-মাধবের কামন্দকী বিরচিত। আর শকুন্তলার অনসূয়া প্রিয়ংবদার ছায়ায় মদয়ন্তিকা ও সৌদামিনী কল্পিত। তবে অনসূয়া প্রিয়ংবদা আশ্রম-কন্যকা। আর মদয়ন্তিকা রাজবয়স্যের সোদরা, প্রভেদ এই টুকু। তাই মদয়ন্তিকার বিবাহ হইল। অনসূয়া প্রিয়ংবদার হয় নাই।

এই নাটকে প্রণয়ের চিত্র নানাভাবে অঙ্কিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কোথাও কোনরূপ অশ্লীলতা দোষ জন্মে নাই; প্রেমের বর্ণনায়, বিশুদ্ধ প্রণয়ের বর্ণনায় যে অশ্লীলতার কোনই প্রয়োজন হয় না, তাহা ভবভূতি এই নাটকে অতি দক্ষতার সহিত প্রমাণ করিয়াছেন। সেই জন্য, এই নাটক ভবভূতির অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ-সদৃশ।

এই নাটকে যে কয়টি পুরুষ কল্পিত হইয়াছে, তন্মধ্যে, রাজা ও নন্দন ব্যতীত, আর সকলেই মাধবের হিতৈষী, কিসে মাধব সুখে থাকেন, তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হয়, ইহা সকলেরই অহর্নিশ ধ্যান। এই প্রকার, নারীচরিত্রগুলিও সব মালতীর মঙ্গলকাম। মালতী ছাড়া তাহাদের যেন অন্য অস্তিত্বই নাই।

মালতী এবং মাধব, উভয়েই উভয়ের জন্য উন্মত্ত। কিন্তু সে উন্মাদে, মেঘদূতের বিলাসী যক্ষের বা যক্ষপত্নীর ভোগাকাঙ্ক্ষা নাই, সে উন্মাদে শকুন্তলার "অভিনব-মধুলোভ-ভাবিত" গানের রচয়িত্রী বসুমতীর বা দোহদরতা-মালবিকার

চরণপ্রান্তে লুণ্ঠিত অগ্নিমিত্রের কাতরতা নাই, সে উন্মাদ দেবদম্পতির অন্যোন্য-হৃদয়ের সুপবিত্র ভাবে সম্ভাবিত। আর্য্য-ভূমি ভারতবর্ষে প্রণয়-সম্বন্ধে যাঁহারা নানা প্রকার নিষ্করুণ সমালোচনা করেন, ভবভূতির এই মালতীমাধবে তাঁহাদের সে সমালোচনার পথ রুদ্ধ হইয়াছে। ভবভূতি, চিরাচরিত-প্রথায় তত লক্ষ্য না করিয়া, প্রকৃত প্রেম, স্বয়ং প্রবুদ্ধ প্রণয়, ঠিক যেরূপ ভাবে হওয়া উচিত, তাহা করিয়াছেন। সমাজের গণ্ডি বা লোকব্যবহারের সীমায় কবির কল্পনাকে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। পুরাকালে বিবাহের পরিচ্ছদ যে কিপ্রকার ছিল, তাহা মহাকবি, মালতীর পরিচ্ছদে বেশ দেখাইয়া দিয়াছেন। শ্রীমতী বালিকার দ্বারা দেবদেবীর অর্চনার সংবাদ, ভবভূতীর পূর্ব্বেও পাওয়া যায়। দশকুমার চরিতের সপ্তম-চরিতে ইহার একটি উজ্জ্বল বর্ণনা আছে। প্রাচীন কালে, কাপালিকের প্রভাব, দেশে যে কিপরিমাণে প্রবল ছিল, তাহা ভবভূতি, দশকুমারের কবির ন্যায়, অতি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ভবভূতির প্রাদুর্ভাবের বহুপূর্ব্বে ভারতবর্ষে, বৌদ্ধরাজত্বের ধ্বংস হইয়াছিল। কিন্তু, বৌদ্ধপ্রভাবের তিরোধান তখনও একেবারে হয় নাই। তখনও রাজসংসারে পর্য্যন্ত, বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী-গণের যে কত প্রতাপ ছিল, তাহা কামন্দকী প্রভৃতির চিত্রে প্রমাণিত হইয়াছে।

ভবভূতি যদি দীর্ঘ দীর্ঘ সমাসের দ্বারা এই পুস্তকের অঙ্গ

ভারাক্রান্ত না করিতেন, তবে, এই এক নাটকেই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিত। কিন্তু তাহা তিনি পারেন নাই। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বেদের অনুশীলন সেই বংশীয়গণের নিত্যকর্ম্ম ছিল, ভবভূতি নিজেও একজন বেদজ্ঞ আচার্য্য ছিলেন; সুতরাং তাঁহার লেখনীর মুখে, বেদের প্রভাব, বেদের ভাষা, বেদের সংস্কার বাহির হইবারই কথা। এইজন্যই তিনি জটিল ভাষার হাত এড়াইতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও, এমন লোক বোধ হয় অতি অল্পই আছেন যিনি ভবভূতির করুণরসের বর্ণনে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারেন। স্বভাবের যথাযথ বর্ণনে, কালিদাসের পর তাঁহার সমকক্ষ আর কেহই হইতে পারেন নাই, আর হইবেনও না।

ভবভূতি বীরচরিত ও মালতীমাধবে যে সকল সুন্দর সুন্দর কবিতার রচনা করিয়াছেন, সেগুলির অধিকাংশই তাঁহার সাধের উত্তরচরিতে পুনবর্ণিত হইয়াছে। অনেক স্থলে, ঠিক শ্লোকটি পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিতেও কবি কুণ্ঠিত হয়েন নাই। যদি কোন দিন সংস্কৃত ভাষার বিলোপসাধন হয়, তবে সেই সময়ে, ভবভূতির কাব্যাবলী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে পারে, অন্যথা, আচন্দ্র-সূর্য্য, তাঁহার এই সকল কাব্য ভারতভূমির গৌরব বৃদ্ধি করিবে এবং তাঁহাকেও অমর করিয়া রাখিবে। নিপুণ সমালোচক কোলব্রুক সাহেব, এই মালতী-মাধবকে "Unrivalled drama" অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাটক বলিয়া গিয়াছেন। মহামতি

উইলসন, মালতীমাধবের মুক্তকণ্ঠে স্তুতি করিয়াছেন। যখন বিদেশীয় মনস্বিবর্গের এই ধারণা, তখন এদেশীয়দিগের মনের ভাব যে, ভবভূতির কাব্যাবলী সম্বন্ধে কি প্রকার হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এ কথা সত্য যে, কালিদাসের পর, ভারতবর্ষে, ভবভূতির সমকক্ষ প্রেমিক কবি আর কেহই জন্ম-গ্রহণ করেন নাই।